অনুবাদ : ড. মুরারিমোহন সেন

প্রথম মুদ্রণ : ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাসগুপ্ত

আমার ভাই শহীদ হরিকিষণকে

ভূমিকা

এই গ্রন্থের রচয়িতা ভগতরাম তলোয়ার, এবং যে দেশপ্রেমিক পাখ্‌তুন পরিবার থেকে তিনি এসেছেন—তারা সকলেই ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। পাঞ্জাবের গবর্নরকে হত্যা-চেষ্টার জন্য এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে জনৈক পুলিশ-কর্মচারীকে হত্যার অপরাধে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় অগ্রজ হরিকিষণ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। গ্রন্থকারের পিতা গুরুদাসমলও ছিলেন একজন একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী এবং তাঁর দেশভক্ত পুত্রদের কাছে প্রেরণার এক জীবন্ত উৎস। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের নিপীড়নে তাঁকেও অকালে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। গ্রন্থকারের সাত ভাইও হয়েছিলেম শাসকের নিষ্ঠুর নিপীড়নের শিকার এবং তাঁদের সকলকেই ভোগ করতে হয়েছিল কঠোর কারাদণ্ড।

আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়ে আবদুল গফ্‌ফর খানের খুদা-ই-খিদ্‌মৎগার বাহিনীর একজন নিষ্ঠাবান কর্মীরূপে ভগতরাম নিজেও কারা-বরণ করেছিলেন এবং কারামুক্তির পর ঐ অঞ্চলের নিপীড়িত কিষাণদের মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই সূত্রেই তিনি পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং কিছুকালের মধ্যেই যোগদান করেছিলেন তেজ সিং স্বতন্ত্র-পরিচালিত কীর্তি কম্যুনিস্ট দলে। এই দল ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিরই অংশ।

এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে আছে হরিকিষণের বিচার, গুরুদাসমল ও তলোয়ার-পরিবারের উপর প্রতিহিংসামূলক নিপীড়নের তথ্যভিত্তিক কাহিনী। দ্বিতীয় পর্বটি হচ্ছে এই গ্রন্থের প্রধান পর্ব। এখানেই আছে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে সুভাষচন্দ্র বসুর রোমাঞ্চকর অন্তর্ধানের প্রথম প্রকাশিত পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস। কিভাবে তিনি ভারত ছেড়ে উপজাতীয় অঞ্চল পার হয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছেছিলেন, কাবুলে তার প্রায় দুইমাস কাল সংকটময় অবস্থান, তারপর কিভাবে তিনি মস্কো হয়ে বার্লিন যাত্রা করলেন, তারই নাটকীয় তথ্য-বিবরণ বর্ণিত হয়েছে এই পর্বে।...

আর, যে দু'টি 'পরবর্তী পর্যায়' এতে যুক্ত হয়েছে তাতে আছে সুভাষচন্দ্র বসু কাবুল ছেড়ে যাবার পর কিভাবে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন তার কথা। এই সমস্ত কথাই সবিস্তারে বলেছেন ভগতরাম তলোয়ার, যিনি ছিলেন এই অভিযানে সুভাষচন্দ্রের একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী।...

চিন্মোহন সেহানবীশ

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাগুলোর পরে সাড়ে তিন, বস্তুত সাড়ে চার দশক পার হয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে আমি ছিলাম প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং গ্রন্থপ্রকাশে এই বিলম্বের জন্য পাঠক-পাঠিকার কাছে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন।

ব্যাপারটা যা ঘটেছিল তা হলো এই যে, আমি গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ নিয়েই প্রথমে শুরু করেছিলাম—এতে বর্ণিত হয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর আফগানিস্থানে চলে যাওয়া এবং তারপর কাবুল ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত ইতিহাস। তাহলেও আমি আমার রচনায় কোথাও তাড়াহুড়া করতে চাই নি। পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন, আমি দৈনন্দিন ঘটনার, এমন কি ঐ রোমাঞ্চকর দিনগুলিতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় যা ঘটেছে তারও বিস্তারিত বিবরণ টুকে রেখেছিলাম। আমি বরং ভেবেছিলাম কাজ করার আগে একটু অপেক্ষা করা যাক, ঘটনাগুলোর তাৎপর্য আমার মনে ধীরে ধীরে থিতিয়ে যাক। যাই হোক ১৯৬১-এর মধ্যেই আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী সাজানো সম্পূর্ণ হয়ে গেল—আমি কলকাতায় নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর হাতে তা তুলেও দিলাম। কিন্তু যেহেতু গ্রন্থের প্রকাশে বিলম্ব ঘটছিল, সেইহেতু আমি রচনাগুলি 'দেশ' কাগজে কিস্তিতে প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে আমার ভাইয়েরা এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাব করলেন—গ্রন্থের আরম্ভে থাকবে তলোয়ার বংশের ইতিহাস আর আমার পিতা গুরুদাসমল ও আমার দ্বিতীয় বড় ভাই হরিকিষণ—এই দুই শহীদের কাহিনী। সুভাষচন্দ্র বসুর বিদেশযাত্রার পর এখানে যা ঘটেছে এবং তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে যারা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন তার বিবরণও 'পরবর্তী পর্যায়' নামক অংশে দেওয়ার জন্য ঐ মহল থেকেই অনুরোধ এসেছিল।

সুতরাং সমগ্র গ্রন্থটি আবার নতুন পরিকল্পনায় লিখতে হলো। সংশ্লিষ্ট উপকরণগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে বছরের পর বছর গড়িয়ে গেল, ফলে অনেক পরে পরিকল্পিত গ্রন্থটি পেল বর্তমান রূপ।

এই গ্রন্থের প্রকাশনে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যমুনাদাসের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী, তিনি আজ লোকান্তরিত ; তেজ সিং স্বতন্ত্রও আজ জীবিত

নেই—অথচ তাঁরই প্রত্যক্ষ নির্দেশে আমি সেই দুঃখের দিনগুলিতে কর্মে ব্রতী হয়েছিলাম। তাঁদের অভাবে যে মানসিক যন্ত্রণা, তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

আমার পরিবার-পরিজন, অগণিত বন্ধুবান্ধব ও কমরেডকে, যারা আমার দুঃখব্রতের দিনে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদেরই সঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশকে, যিনি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন, আর সবার উপরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে, আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভগতরাম তলোয়ার

প্রকাশকের নিবেদন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক অন্তর্ধান এবং পরবর্তী জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে ইতিহাসবিদ এবং রাজনীতিকদের মধ্যে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে যে বিতর্ক চলছে এখনও তার অবসান হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজী-সম্পর্কিত সকল তথ্যই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে রচনার পক্ষে অপরিহার্য। এই গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সেই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে। এই গ্রন্থ কোনো মামুলী গ্রন্থ নয়, এর লেখক নেতাজীর ভারত-ত্যাগের একমাত্র সঙ্গী—দেশভক্ত পাখতুন পরিবারের সন্তান—ভগতরাম তলোয়ার। গ্রন্থের প্রথম পর্বে সেই পরিবারের দেশপ্রেমমূলক কর্মধারার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে আছে মূল বিষয়বস্তু, অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কথা। এই গ্রন্থে এমন সব ঘটনার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যা জনসাধারণের কাছে এতকাল ছিল একেবারেই অজ্ঞাত!

প্রকাশক হিসাবে প্রথমেই আমরা লেখক ভগতরামের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, বাঙালী পাঠকদের কাছে এই ঐতিহাসিক গ্রন্থ পরিবেশনের সুযোগ তিনিই আমাদের দিলেন। আমরা কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট বাঙালী বুদ্ধিজীবী শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশের কাছেও, তাঁর সাহায্য ছাড়া এই সুযোগ আমরা কিছুতেই পেতাম না।

এই গ্রন্থের অনুবাদক শিক্ষাবিদ ডঃ মুরারিমোহন সেন-এর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। যে দ্রুততার সঙ্গে তিনি অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেছেন তা মনে রাখবার মতো। সর্বশেষে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই কবি ধনঞ্জয় দাশ-এর কাছে। যে কঠিন শ্রম স্বীকার করে তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করেছেন তা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

সূচী

প্রথম পর্ব ঃ পাঠানভূমির তলোয়ার

		পৃষ্ঠা
১.	পাখ্‌তুনিস্তান : পাখ্‌তুনিস্তানের মানুষ	৯
২.	ঘাল্লা দেহরের তলোয়ার	১২
৩.	গুরুদাসমল ও তাঁর পরিবার	১৫
৪.	শহীদব্রতে পিতার কাছে পুত্রের দীক্ষা	১৯
৫.	সেই ভয়ংকর দিনটি	২৪
৬.	অগ্নিপরীক্ষা	২৮
৭.	নির্যাতনের মুখে	৩৩
৮.	বিচার	৩৮
৯.	শহীদ হরিকিষণ	৪৪
১০.	পরের কথা	৫১

দ্বিতীয় পর্ব ঃ রহস্যময় অন্তর্ধান

১.	আমার শিক্ষানবিসির দিনগুলি	৫৬
২.	প্রজা-আন্দোলন : প্রতিক্রিয়া	৬৭
৩.	অন্তর্ধানের আয়োজন	৭৫
৪.	অন্তর্ধান	৯০
৫.	জালালাবাদের পথে	১০১
৬.	কাবুলের পথে	১১২
৭.	কাবুলের কোলে	১২১
৮.	উত্তমচাঁদের অতিথি	১৩৬
৯.	যাবার পথের পথিক	১৬৮
১০.	আমার কথা	১৭৫
১১.	পরবর্তী পর্যায় (১৯৪১-৪২)	২০৪
১২.	পরবর্তী পর্যায় (১৯৪৩-৪৫)	২৪৮



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

এক

পাখ্‌তুনিস্তান ঃ পাখ্‌তুনের মানুষ

সিন্ধুনদের বামতীরে পেশোয়ারে যাবার রেলপথে একটা ছোট স্টেশনের নাম আটক। এখান থেকে দেখা যাবে নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে এক রুক্ষ পর্বতমালার সারি। আটক শহরটাই একটা মালভূমির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এক বিশাল দুর্গ; সেই দুর্গটি যেন মোগলসম্রাট মহান্ আকবরের বিলুপ্ত মহিমা এখনও ঘোষণা করে যাচ্ছে। সিন্ধুনদ এখানে এক সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত; নদী বয়ে চলেছে আঁকা-বাঁকা পথে—তার তরঙ্গ বিশাল প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে এসে স্পর্শ করেছে দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীর। নদীর ওপারে, দুর্গের মুখোমুখি একটি গ্রাম —নাম খইরাবাদ।

সিন্ধুনদের বুকের উপর দিয়ে একটা সেতু—আটক স্টেশনের কাছে; সেতু পার হয়েই রেলগাড়ীকে ঢুকতে হয় একটা দীর্ঘ পাহাড়ী সুড়ঙ্গের মধ্যে; সুড়ঙ্গ পার হয়ে এলেই দেখা যাবে জাহাঙ্গিরা— পাখ্‌তুনিস্তানের প্রথম গ্রাম, অবশ্যি দক্ষিণ থেকে কেউ এলে।

মধ্য-এশিয়ার পাখ্‌তুন জাতি খুবই প্রাচীন, শক্তিশালী ও গর্বিত। তিন হাজার পাঁচশ' বছর আগে রচিত ঋগ্‌বেদে এদের উল্লেখ রয়েছে। উত্তরে আমু (অক্সাস) ও দক্ষিণে সিন্ধু—মধ্যবর্তী এক বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে এরা বাস করে; ঐ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পাখ্‌তুনভূমি। আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করে ব্রিটিশশাসন-প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত একাধিকবার এদের পবিত্র জন্মভূমি রক্ষার জন্য হানাদারদের বিরুদ্ধে এরা রুখে দাঁড়িয়েছে।

পাখ্‌তুনভূমির ভৌগোলিক অবস্থান এমনি যে বার বার আক্রমণ-কারীদের এদেরই ঠেকাতে হয়েছে; দেশ দলিত হলেও এরা দীর্ঘকাল

বিদেশী শত্রুর বশ্যতা স্বীকার ক'রে নেয় নি; আক্রমণকারীদের না হঠানো পর্যন্ত বার বার তাদের আঘাত করেছে। এদের বীরত্ব ও সাহসিকতার কাহিনী—কিংবদন্তীর মতো; এদের অদ্ভুত সরলতা, অসীম সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্পের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। একজন তুর্কী লেখক বলেছেন—'এরা দেহে ও মনে নির্মল, স্বভাবে ও কাজে সরল।' সঈদ জামালউদ্দীন আফগানি বলেছেন—'এরা সাহসী জাতি, যুদ্ধে অজেয়, এরা কখনও পরদেশী শাসনকে বরদাস্ত করে না। নেতার প্রতি এদের আনুগত্য তুলনাবিহীন। যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যে-কোনো পাখ্‌তুনের কাছেই মৃত্যুতুল্য।' কর্নেল হোল্ডরিশ বলেছেন—'পাখ্‌তুনরা দেশপ্রেমিক—এরা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত।' কর্নেল নেলসনও লিখেছেন—'পাখ্‌তুনদের মন যেমন উদার, তেমনি উদার তাদের বন্ধু ও অতিথিদের প্রতি ব্যবহার।'

মহাকবি ইকবাল মনে করতেন—পাখ্‌তুনভূমি ও তার সন্তানেরাই হচ্ছে এশিয়ার হৃদয়। কুশল খান খাটক পাখ্‌তুনদেরই বিখ্যাত কবি। ইনি শক্তিশালী আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে জাতির স্বাধীনতার জন্য অসীম সাহসে যুদ্ধ করেছিলেন—তাঁর লেখা একটি বিখ্যাত কবিতার শেষে আছে এই অগ্নিগর্ভ বাণী- -

হে আল্লা!
মান দাও, শান্তি দাও!
দাও ফিরিয়ে সেই সঙ্গীতের মধুর রেশটুকু!
বৃদ্ধ কুশল তাহলে আবার
নব-তারুণ্যে ফুটে উঠবে।
যে-জীবনে ইজ্জৎ নেই
নেই কোনো সংগ্রামের রোমাঞ্চ—
সে-জীবনের চেয়ে মৃত্যুও তার কাছে মধুর:
জীবনে ও মরণে
সেই ইজ্জৎ হোক তার ধ্রুবতারা!
তাহলে কবরেও তার স্মৃতি হবে অক্ষয়!

পাখ্‌তুনী জীবনের একটি প্রধান নীতি হলো—'আজাদ উসা,

আজাদ মার শা'—অর্থাৎ 'স্বাধীন মানুষ হয়ে বাঁচো, মরতেও হবে স্বাধীন থেকেই।'

খইরাবাদের কথা আগেই বলেছি। খইরাবাদের কয়েক মাইল উত্তরে আমরা কাবুলনদীর তীরে আর একটি গ্রাম দেখতে পাবো। গ্রামের নাম—আকোরা; এই গ্রামই বিখ্যাত কবি কুশলের জন্মস্থান।

আকোরা ছাড়িয়ে কাবুলনদীর তীরেই আছে নৌশেরা। ব্রিটিশ-রাজের আমলে নৌশেরা ছিল এক বিরাট সামরিক ক্যান্টনমেন্ট। নৌশেরা থেকে কয়েক মাইল উত্তর পশ্চিমে এক পার্বত্য ভূমি গিয়ে মিশেছে বিখ্যাত খাইবার গিরিবর্ত্মে। এই ঐতিহাসিক গিরিপথ দিয়েই একদিন এসেছিলেন বীর আলেকজাণ্ডার—ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর—আর আহমদ শাহ আবদালির বাহিনী! আবার এদিক থেকে এই গিরিপথেই মহান অশোক যুদ্ধরত জাতিদের কাছে তাঁর পঞ্চশীল-নীতি-প্রচারের জন্য ভিক্ষুদের বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। এই গিরিপথের কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে আফ্রিদি, ওরাকজাইস, শিনওয়ারি প্রভৃতি উপজাতি; ইংরেজরা ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েও এদের বাসভূমি তাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে নি।

নৌশেরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে রেলপথের একটা ছোট শাখা গেছে উত্তরে মালাকুন্দ এজেন্সীর সীমা পর্যন্ত। এই রেলপথেই নৌশেরা থেকে চার মাইল দূরে রিসালপুর স্টেশন। রিসালপুর ছিল এই অঞ্চলে ইংরেজদের এক মস্ত-বড় বিমানঘাঁটি। রিসালপুর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে রাশকাই নামে এক ছোট গ্রাম—এ গ্রাম রেলের সেই শাখাপথেই পড়বে। এই গ্রাম থেকে পায়ে হাঁটা পথে, কিংবা ঘোড়া বা মোষের গাড়ীতে আমরা এসে পৌঁছতে পারবো আরও একটি ছোট গ্রামে—

এই গ্রামের নাম ঘাল্লা দেহর।

এইখানেই এখন থেকে আমরা কাহিনীসূত্র অনুসরণ করবো।

দুই

ঘাল্লা দেহরের তলোয়ার

পাখ্‌তুনিস্তানের সেই ছোট গ্রাম ঘাল্লা দেহর আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত। জেলার বড় শহর মর্দানা থেকে ঘাল্লা দেহর প্রায় ছয় মাইল দূরে। গ্রামে ঘর সাতশো আছে কিনা সন্দেহ—সবই মাটির কাঁচা বাড়ী।---একটি কি দুটি পাকা বাড়ীও আছে। চাষীরা সবাই স্থানীয় নবাবের প্রজা-- সবাই অত্যন্ত দরিদ্র।

জমিগুলো সব খণ্ড খণ্ড—সবই নবাবের অধিকারে —এই সব ছোট জমিতে সারা বছর চাষীরা কঠোর পরিশ্রম ক'রে ফসল ফলায়, তারপর নবাব, তার নায়েব, গোমস্তা, মহাজন প্রভৃতির দাবী মিটিয়ে যেটুকু থাকে তা চাষীর। তা দিয়ে তারা কোনো রকমে বেঁচে থাকে এইমাত্র।

উর্বর জমিরও অভাব নেই এ গ্রামে। পাখ্‌তুনিস্তানের রুক্ষ সীমান্তে ভাল্লার ও কালপানি নদীর মোহনায় যেসব উর্বর জমি তা-ও এই গ্রামেরই এলাকায়। যে সময়ের কথা বলছি তখন এই গ্রামের যা-কিছু খুচ্‌বো বেচা কেনা তা ছিল কয়েকটিমাত্র হিন্দু পরিবারের হাতে।

একটি পাকা বাড়ীতে ছিল এক হিন্দু পরিবারের বাস। পরিবারটি ক্ষত্রিয়-বংশীয়—এদের কিছু জমি ছিল; চাষকে এরা বৃত্তি হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। বিধির বিধান এই ছিল যে, এই তলোয়ার-পরিবার লোভী নবাবের বিরুদ্ধে স্থানীয় চাষীদের সংগ্রামে অবিস্মরণীয় ভূমিকা নেবে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভারতের জাতীয় সংগ্রামেও অংশ গ্রহণ করবে।

কোনো এক সময়ে এ গ্রামের সব জমিই ছিল কৃষকের—কৃষক ব্যক্তিগতভাবেই জমির অধিকারী ছিল। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে

নবাবের বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানা পেল নবাব—কৃষক তার জমি হারালো। ঘাল্লা থেকে তিন মাইল দূরে ছোট এক শহর —নাম তোরু। তোরুর নবাব কাদের খান। শিখদের বিরুদ্ধে ইংরেজের যুদ্ধে এই নবাব অর্থ, অস্ত্র ও মানুষ দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। যুদ্ধ জয়ের পর যখন ইংরেজরা এই অঞ্চলে তাদের রাজ্যপাট গুছিয়ে নিল তখন তারা তাদের অনুগত মিত্রকে ভুললো না —জমির অধিকার পেল নবাব। সঙ্গে সঙ্গে জমির খাজনা এত বেড়ে গেল যে দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তা গুরুভার হয়ে উঠলো। নবাব এবং তার ইংরেজ বন্ধুরা এই সুযোগে একে একে জমি গ্রাস করতে লাগলো —শেষ পর্যন্ত কাদের খান হয়ে দাঁড়ালো ভাল্লা দেহরের ভূস্বামী—আর কৃষকেরা হলো তার ক্রীতদাস।

সর্দার জাস্সা সিং পাঞ্জাবের এক ক্ষুদ্র গ্রাম ভেরা মিয়ানীর আদিবাস ছেড়ে চলে এলেন ঘাল্লায়। পাঞ্জাবে তখন মহারাজা রণজিৎ সিং ও ইংরেজদের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই চলছে। বাস্তু ছেড়ে ঘাল্লায় এলেন সর্দার জাস্সা সিং—ইনিই ঘাল্লা দেহরে তলোয়ারদের আদি পুরুষ। সে সময়ে পাখতুনভূমি ছিল অসংখ্য ডাকাতের আড্ডা। কিন্তু জাস্সা সিং বন্দুক-চালনায় সুদক্ষ ছিলেন—তিনি সারা অঞ্চলটিকে ডাকাতের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিলেন। এই কাজে তিনি অনেকখানি সফলও হলেন। তাঁর চেষ্টায় সেই অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হলো; অবশ্য এই ব্যাপারে অন্যান্য শান্তিপ্রিয় ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক লোক তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জাস্সা সিং জীবিকা হিসেবে চাষ-আবাদকেই গ্রহণ করেছিলেন; তার পুত্র দেওয়ান চাঁদও তাঁরই পথ অনুসরণ করলেন। তিনি খুব কর্মঠ ছিলেন—চাষীরা নিজেদের সমস্যা নিয়ে উপদেশের জন্যই তাঁর কাছে আসতো। তিনি রীতিমত সম্পন্ন ভূস্বামী হলেও সততা ও মিশুক প্রকৃতির জন্য এই অঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। নবাবের নিঃস্ব প্রজারাও তাঁর কাছে কখনো কখনো আসতো এবং তাঁর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যেতো—মনে হয়, চিকিৎসার ব্যাপারেও তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

দেওয়ান চাঁদের জনপ্রিয়তা আর তাঁর সম্পদের বহর দেখে তোরুর নবাব কাদের খান ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো। কিন্তু সক্রিয় হবার আগেই তার মৃত্যু হলো। তার মৃত্যুর পর তার ভাই মহাব্বত খান পেল নবাবের গদি। নতুন নবাবের ছোট ভাই করিম খান ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ-প্রকৃতির গুণ্ডা। ইংরেজদের আশ্রয়েই সে অবাধে উৎপীড়ন চালাতো—লুট, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা—কোনটিই বাদ যেত না। নবাবের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করে, সে স্থির করলো দেওয়ান চাঁদকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে তার সম্পত্তি গ্রাস করতে হবে। একদল স্থানীয় গুণ্ডা নিয়ে গভীর রাত্রিতে করিম খান ঘাল্লায় চলে এলো।

দেওয়ান চাঁদের গৃহে এসে তাদের মধ্যে একজন দরজায় ধাক্কা দিল—করিম খান বললো—'বাবার মারাত্মক অসুখ, এক্ষুণি ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।' যে মুহূর্তে দেওয়ান চাঁদ দরজা খুলে দিলেন—গুণ্ডার দল ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর উপর—আর তাঁকে ছোরা দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। তিনি সাহসী হলেও নিরস্ত্র ছিলেন—তাছাড়া তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, নবাবের ভাই একদল গুণ্ডা নিয়ে আসবে তাঁকে হত্যা করতে।

এদিকে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী গোলমাল শুনে বিপদ বুঝতে পারলেন। তিনি তাঁর আড়াই বছরের ছেলে গুরুদাসমলকে একটা ঘরের কোণে তুলো চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন।

দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলো ডাকাতের দল—তারা দেওয়ান চাঁদের ছেলের খোঁজ করলো; তাকেও তারা শেষ করে দিতে চায়! কিন্তু লক্ষ্মীদেবী চঞ্চল হলেন না; ধীর কণ্ঠে তিনি বললেন—'ছেলে আমার বোনের বাড়ীতে পাশের গাঁয়ে চলে গেছে।' তখন সমস্ত লুট করে, গহনা ও অলঙ্কার নিয়ে ডাকাতের দল চলে গেল।

কিন্তু শিশু পুত্র বেঁচে গেল।

দেওয়ান চাঁদ তাঁর আঘাতের ফলে তিনদিন পর মর্দানের হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করলেন।

তিন

গুরুদাসমল ও তাঁর পরিবার

দেওয়ান চাঁদের সেই শিশুটি বড় হয়ে উঠলো। লালা দেওয়ান চাঁদের করুণ মৃত্যুর পর সেই শিশুর ভগিনীপতি সম্পত্তির তদারকির ভার নিয়েছিলেন। বড় হয়ে সেই শিশু অর্থাৎ গুরুদাস মল পৈতৃক সম্পত্তি বুঝে নিলেন।

ঘাল্লার নিকটবর্তী অঞ্চলের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। হত্যা ও লুণ্ঠন সমগ্র অঞ্চলের উপরেই এক বিষাদের ছায়া ফেলেছিল। পুলিশের সাহায্য পর্যাপ্ত রূপে পাওয়া যেতো বলেই ডাকাতের দল অবিরাম হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে যেত। এই ডাকাতের দলে ছিল তিন ভাই—সুলেমান, ইসমাইল ও জারিন। এরা নিশ্চিন্তে হত্যা ও লুণ্ঠনের ভয় দেখিয়ে উৎপন্ন শস্যের অংশ আদায় করত, কেউ রেহাই পেত না।

তরুণ গুরুদাসমল এই সমস্ত অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। নানারকম বেআইনি কাজের জন্য পুলিশ ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল —শক্তির পরীক্ষায় গুরুদাসমলও ওদের আহ্বান জানালেন। একদিন কুখ্যাত জারিন ডাকাতির পর লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে ফিরে আসছিল—দেখা হয়ে গেল গুরুদাসমলের সঙ্গে। তিনি ওকে সহজেই কাবু করে ফেললেন—তারপর পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। বিচার হলো, চৌদ্দ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল জারিন।

এর অল্পদিন পরেই গুরুদাসমল আর তাঁর বন্ধু মহম্মদ আজম খাঁন মুখোমুখী পেলেন ইসমাইলকে। ইসমাইল মর্দান থেকে ঘাল্লায় ফিরে আসছিল। ওকেও বন্দী করা হলো। কিন্তু পরে তাকে এই বলে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হলো যে ভবিষ্যতে তাকে এই সব দুর্নীতিমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। কিন্তু কিছুকাল পরেই সে

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো। গুরুদাসমলের সাহায্যে পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করলো—এবার তার শাস্তি হলো সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তৃতীয় ভ্রাতা সুলেমানকেও এক ডাকাতির মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হলো। পরে জেলেই তার মৃত্যু হয়েছিল। একটি উপদ্রুত অঞ্চলকে এইভাবে লুণ্ঠনের আতঙ্ক থেকে মুক্ত করার কাজে গুরুদাসমল যে সাহস ও তৎপরতা দেখিয়েছিলেন সরকার তার উচ্চ প্রশংসা করলো। আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রাখবার অনুমতি পেলেন গুরুদাসমল।

পাখ্‌তুনভূমির ইতিহাসের ধারার এইবার একটু অন্যদিকে মোড় ফিরলো। ডাকাতদের ধ'রে ধ'রে জেলে পাঠানো হচ্ছিল বটে কিন্তু ধূর্ত ইংরেজ ধীরে ধীরে সমগ্র পাখ্‌তুনভূমির উপরে আপন কর্তৃত্বের মুঠি দৃঢ় করে আনছিলো। সরল ও উদার পাঠানদের তুলনায় ইংরাজ ছিল সুচতুর; সেই বুদ্ধির খেলায় পাঠানরা হেরে গেল। দুঃখময় সঙ্কুচিত জীবনের দিকেই ওদের ঠেলে দেওয়া হোলো।

পাখ্‌তুনিদের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের বিরোধের সূচনা এই ভাবেই। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রবলে বলীয়ান্ ইংরেজদের সঙ্গে ওরা পারবে কেন? এই সংগ্রাম অসমান কিন্তু বীরত্বের মহিমায় মণ্ডিত। শত শত পাখ্‌তুন তাদের পবিত্র ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিল। দলের পর দল এগিয়ে এলো পবিত্র জন্মভূমির মর্যাদা-রক্ষায়! মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা জীবন দিয়েছিলেন—সেই সব শহীদের পুণ্য স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে, তাঁদের আত্মত্যাগ পাখ্‌তুনীদের সমস্ত মহৎ প্রেরণার উৎস। এঁদের মধ্যে আছেন গাজী মহম্মদ আকবর খান, গাজী উমরাও খান, গাজী আজব খান আফ্রিদি, গাজী মহ্‌সল খান, সোয়াত্ সহল, হাদ্দি মহল, বধি মুল্লাহ্ সাহেব, ওরঙ্গ জাই-এর হাজী সাহেব, মোল্লা পেওয়ানদা সাহেব, ইপ্পির ফকির—পাখ্‌তুনীদের হৃদয়ে এঁরা সবাই এক বিশিষ্ট গৌরবের আসন অধিকার করে থাকবেন—সঙ্গে থাকবেন আবদুল গফ্‌ফর খান এবং তাঁর ভ্রাতা।

গুরুদাসমল বড় হয়ে উঠেছিলেন সেই অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে—অল্পকালের মধ্যেই একজন সত্যিকারের পাখ্‌তুন হিসেবেই তাঁকে সবাই জানলো; তিনি পাখ্‌তুন-জীবনের মর্যাদা

বিধি এবং সেই সঙ্গে পাখ্‌তুন-সমাজের রীতিনীতি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলতেন। জনজীবনের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, বিশেষ করে সেই অঞ্চলে পদদলিত চাষী-সমাজের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে—এই সম্পর্কে তাঁর পিতা যে আদর্শ রেখে গিয়েছিলেন তাই তিনি মেনে চলতেন।

কিন্তু বাধ সাধলো ব্রিটিশরাজ; পাখ্‌তুনীরা এযাবৎ যেসব অধিকার বা যে যে বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল—ইংরেজ সরকার তা থেকে তাদের বঞ্চিত করলো। ইংরেজের উৎপীড়ন দিনে দিনে বেড়ে গেল; গুরুদাসমল হয়ে উঠলেন ঘোর ইংরেজ-বিরোধী—তাঁর মনে সঙ্কল্প জাগলো—মাতৃভূমি স্বাধীন করাই হবে তাঁর ব্রত। বালগঙ্গাধর তিলকের 'কেশরী' পত্রিকার তিনি গ্রাহক হলেন। ভারতীয় সমস্যার উপরে জাতীয়তাবাদীদের মতামত প্রচার করত যেসব গ্রন্থ বা পুস্তিকা—সবই তিনি আগ্রহ নিয়ে পড়তেন। ১৯২১-এ তিনি ও তাঁর স্ত্রী মথুরাদেবী আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করলেন। এই অধিবেশনে জাতীয় নেতাদের ভাষণ শুনে তিনি এত অভিভূত হলেন যে ফিরে এসে তিনি আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কংগ্রেসের প্রচারপত্রগুলো বিলি করতে লাগলেন।

এ যেন কংগ্রেসের স্বপক্ষে মাত্র একটি মানুষের অভিযান। এরপর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই যোগ দিতে লাগলেন।

এদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দিনে দিনে এমনভাবে বেগ সঞ্চারিত হতে লাগলো যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে আর রোধ করা যাচ্ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ভাবলো—আন্দোলনের এই উত্তাল তরঙ্গবেগকে স্তিমিত ক'রে রাখবে তু' একটি অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির বাণী শুনিয়ে কিংবা দূরবর্তী আশার কুহক সৃষ্টি করে; তারা ভারতে সার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক সরকার-পক্ষীয় কমিশন পাঠালো—কমিশনের উদ্দেশ্য, ভারতের জন্য এক সংবিধান রচনা করা। কিন্তু ভারতের আন্দোলন তখন একমুখী—পূর্ণ স্বাধীনতাই তার লক্ষ্য।

কমিশন ব্যর্থ হলো ; যেখানেই সাইমন কমিশন গেলেন সেখানেই তাদের বিশাল ও ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হলো। তাঁরা সর্বত্র শুনলেন—'সাইমন, ফিরে যাও!' এই তীব্র বিরোধিতার মুখে দাঁড়িয়ে জনতা নির্বিচারে প্রহৃত এবং গুলিবিদ্ধ হলো। এমন কি প্রখ্যাত জাতীয় নেতা লালা লাজপত রায় এমন মারাত্মকভাবে আহত হলেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই সব কারণে জাতি যেন আবার নতুন শক্তিতে জেগে উঠলো—১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর কংগ্রেস ঘোষণা করলেন—ভারতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা।

এই সময়েই পাখ্তুন-জাতির অবিতর্কিত নেতারূপে আবির্ভূত হলেন খান আবদুল গফ্ফর খান—তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'উট্মানজাই' গ্রামের অধিবাসী। পাখ্তুনভূমির দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস-ঘোষিত স্বাধীনতার বার্তা পৌঁছে দিলেন, সংগঠিত করলেন 'খুদাই খিদ্মদ্গার' দল। এই দল ছিল স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর এক বিস্ময়কর রূপ।

গুরুদাস মলের নয় পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র যমুনা দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর লাহোরের ডি. এ. ভি. কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু ১৯২৮-এর মার্চে সে সাংসারিক কাজে লিপ্ত হলো। দ্বিতীয় পুত্র, হরিকিষণ স্কুলে থাকতেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—কখনো লালকুর্তা, কখনো 'খুদাই খিদ্মদ্গার' স্বেচ্ছাবাহিনী দলে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিল। তৃতীয় পুত্র—ভগৎরাম, অর্থাৎ আমি ছিলাম নওজোয়ান ভারত-সভার সক্রিয় কর্মী। আমি তখন ফিরোজপুরে হর ভগবান মেমোরিয়াল হাই স্কুলের ছাত্র। পরে আমিও খুদাই খিদ্মদ্গারে যোগ দিয়েছিলাম। অন্যেরা ছোট ছিল।

বছর যেতে লাগলো। কেবল ভাইরা নয়, তলোয়ার-পরিবারের সকলেই মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধে দেশভক্ত বীর সৈনিক-রূপেই যোগ দিয়েছিল। এই দীর্ঘ সংগ্রামে অনেক দুঃখকষ্টই তাদের বরণ করতে হয়েছিল।

চার

শহীদব্রতে পিতার কাছে পুত্রের দীক্ষা

১৯৩০-এর গোড়ার দিকে হরিকিষণ ও আমি—দু'জনেই যোগ দিলাম লালকুর্তা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে। তখন শুরু হয়েছে—ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব (১৯৩০-৩৩)। লাল পোশাকে সজ্জিত হয়ে খান আবদুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্পবার্তা এই প্রদেশের দূরতম গ্রামগুলিতেও পৌঁছে দিতাম—অজস্র মিছিল, প্রদর্শনী ও সভা-সমিতি থেকে শাসক-সম্প্রদায়ের উপর জাতির নির্দেশ যেত—'চলে যাও'। এর জবাবে শাসকসম্প্রদায় সহিংস শক্তির আশ্রয় নিতেন; পেশোয়ারে এবং অন্যান্যস্থানে নিরস্ত্র পাখ্‌তুনদের উপরে গুলিবর্ষণ করা হলো—শত শত বীর মৃত্যুবরণ করলো—সহস্র সহস্র চ'লে গেল কারার অন্তরালে।

১৯৩০-এর মাঝামাঝি আমাদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। আমার শাস্তি হলো দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড—আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো পেশোয়ার সেন্ট্রাল জেলে। কিন্তু জেলগুলি তখন যেন উপচে পড়ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের জোয়ারে। সরকার একটা চুক্তিনামা সই করিয়ে কিছু কিছু বন্দী ছেড়ে দিচ্ছিলেন—চুক্তিপত্রে লেখা থাকতো—'আমি আর এমন কাজ করবো না'। হরিকিষণ ইংরেজী ভাল জানতো না, কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বণ্ডে সই ক'রে সে মুক্তি পেল।

গুরুদাসমল এই সংবাদ জানতে পেরে হরিকিষণকে তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন—এতো ক্ষমা চাওয়ারই সামিল; একাজের জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না। হরিকিষণ পিতাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো—তাকে দিয়ে কৌশলে সই করানো হয়েছে।

কিন্তু পিতা তাকে অপরাধী মনে করলেন, তিনি বললেন—'এবিষয়ে তোমাকে তোমার ছোট ভাই ভগৎরামকেই অনুসরণ করা উচিত ছিল ; কই, সে তো চুক্তিপত্রে সই করে নি, এখনও জেলেই প'ড়ে আছে!' তিনি হরিকিষণের কাছে বাঙলার বিপ্লবীদের কথা বললেন—খুবই অল্পবয়স্কা মেয়েদের প্রসঙ্গও তুললেন। তারা তো বছরের পর বছর কারার অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে—কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে নি।

পিতার তিরস্কারে হরিকিষণ গভীর আঘাত পেল মনে—তার জীবনে একটা পরিবর্তন সূচিত হলো এইখানেই। যদিও তাকে দিয়ে সই করানো হয়েছিল তবু সে নিজেকেই অপরাধী মনে করলো—সে স্থির করলো, অনিচ্ছায় হলেও সে যা করেছে তার জন্য সে প্রায়শ্চিত্ত করবে। সে ভাবলো—দেশের মুক্তির জন্য সে চরম ত্যাগ করবে এবং এই পথেই সে তার হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনবে। 'লালকুর্তা'-দলের মুখপত্র 'পাখ্‌তুন'-এ প্রকাশিত একটি কবিতার কয়েকটি লাইন সে বার-বার আবৃত্তি করতে লাগলো—

যখন কবরের নতুন বিছানায় আমাকে শুইয়ে দেবে
আমার বন্ধুরা
যদি ক্রীতদাসের মতো প্রবেশ করে থাকি কবরে
সবাই আমাকে দেবে অভিশাপ !

যদি শপথের পথ বেয়ে রক্তস্নাত না হয়ে থাকি
যদি আমার অশুচি স্পর্শে
কলঙ্কিত ক'রে থাকি সেই মসজিদ
যদি আমার শপথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে
আমার দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না ক'রে থাকে ব্রিটিশের বুলেট
তবে, বলো মাগো
কোন্ মুখে আমার জন্য শোক করবে তুমি ?

এই রকম যখন মানসিক অবস্থা তখন সে একদিন তার সঙ্কল্পের

কথা জানালো তার আত্মীয় চমনলাল কাপুরকে। মর্দানের এক সম্পন্ন ঘরের ছেলে তরুণ চমনলাল। যখন সে হুশিয়ারপুরে ডি. এ. ভি. কলেজের ছাত্র তখনই ডেইলি মিলাপের রণবীর সিং, দুর্গাদাস খান্না এবং ওয়াসন্ধ রাম প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছিল; অল্পদিনের মধ্যে সে-ও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে 'নওজোয়ান ভারত-সভার' একজন সক্রিয় কর্মী-রূপে পরিচিত হলো।

১৯৩০-এর দ্বিতীয় ভাগে নওজোয়ান ভারত সভার সঙ্গে যুক্ত এই বিপ্লবী দল গোপনে সিদ্ধান্ত নিল—পাঞ্জাবের গভর্নর সার জিওফ্রি ডি মণ্ট্‌মোরেন্সিকে গুলি ক'রে মারতে হবে। এরই মধ্যে চমনলাল সঙ্গীদের সঙ্গে কথাবার্তায় বলেছিলো—হরিকিষণের বিপ্লবী মনোভাবের কথা। সে যে দেশের মুক্তি-সাধনায় চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত একথাও তাদের জানিয়েছিল। গুলি-চালনায় হরিকিষণ যে অব্যর্থ —এ সংবাদটুকুও সবাই জানতো। তারা সবাই মিলে স্থির করলো গভর্নরকে গুলি করার ভার হরিকিষণকেই দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে চমনলাল একদিন ঘাল্লায় এলো। পরিকল্পনার কথা শোনামাত্র হরিকিষণ অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠলো—কেননা, এই সুযোগটিই সে খুঁজছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

চমনলাল ও হরিকিষণের মধ্যে কথা হলো —বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে হরিকিষণ গবর্নরকে গুলি করবে—১৯৩০-এর ২৩শে ডিসেম্বর, যখন বার্ষিক সমাবর্তন-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে—তখনই উপযুক্ত সময়।

পরিকল্পনাটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার কাজে চমনলালকে প্রায়ই আসতে হতো ঘাল্লায়। একবার এসে সে খুঁজে পেলো না হরি-কিষণকে—সে তখন বাড়ীতে ছিল না। গ্রামের বাইরে তলোয়ারদের বাগানে দেখা হলো হরিকিষণের সঙ্গে। সেখানে হরিকিষণের সঙ্গে তার পিতাও ছিলেন। চমনলালের রাজনৈতিক মতিগতির কথা গুরুদাস মল জানতেন। ওর বার-বার এ বাড়ীতে আসা নিয়ে তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছিল। চমনলালকে দেখে তিনি সোজাসুজি তার আসবার কারণ জানতে চাইলেন। প্রথমে চমনলাল একটু দ্বিধা করছিল কিন্তু গুরুদাস মলের আশ্বাস পেয়ে সে পরিকল্পনার কথা খুলে বললো। সে

গুরুদাস মলকে একথাও জানালো পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের অস্ত্রের খুবই প্রয়োজন—অন্তত রিভলবার না হলে তাদের চলবে না।

তরুণ বিপ্লবীদের এই দেশপ্রেমমূলক পরিকল্পনা-সম্পর্কে পূর্ণ সমর্থন জানালেন গুরুদাস মল; কার্যটি সমাধা করার দায়িত্ব যে তার পুত্রের হাতে ন্যস্ত হয়েছে এইজন্যও তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তার একটি ভাবনাই শুধু তাকে পীড়িত করছিল—কাজের গুরুত্বের দিক থেকে হরিকিষণের বয়স অত্যন্ত অল্প!

হরিকিষণকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে তিনি তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটিই খোলাখুলি আলোচনা করলেন। সে যে কাজের ভার নিতে যাচ্ছে তার তাৎপর্য বুঝিয়ে বললেন, ফলাফল কি হতে পারে তাও ব্যাখ্যা করলেন। সে যে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়াতে যাচ্ছে তা ধীরভাবে তাকে ভেবে দেখতে বললেন। যদি তার সন্দেহ থাকে তবে মিথ্যে গৌরববোধের মোহে সে যেন এই দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা না করে; পরে যদি প্রত্যাখ্যান করতে হয় তবে তা হবে লজ্জাজনক—শুধু নিজের পক্ষেই নয়, তলোয়ার-পরিবারের পক্ষেও তা হবে কলঙ্ককর।

হরিকিষণ তার পিতাকে আশ্বস্ত করলো। একজন সাহসী পাখ্তুনীর বীর পুত্র সে—সে কখনও বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে না, সে পিতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো।

গুরুদাস মল যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলেন—তাঁর পুত্রকে কেউ টলাতে পারবে না, ভাগ্যে যা-ই থাকুক—কর্তব্য-পালনে সে বিমুখ হবে না, তখন তিনি প্রসন্নচিত্তে হরিকিষণকে তার কাজে যথাযোগ্যভাবে শিক্ষা দিবার ভার নিলেন। তিনি নিজে চলে গেলেন তোরুতে—তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে এক রিভলবার সংগ্রহ ক'রে আনলেন—এই অস্ত্রই সেই 'ভয়ঙ্কর' দিনে তাঁর পুত্র ব্যবহার করবে। তিনি নিজে ছিলেন গুলি ছোঁড়ায় সুদক্ষ—লক্ষ্য থেকে তিনি ভ্রষ্ট হতেন না। এক ব্যাগ কার্তুজ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই তিনি পুত্রকে দিয়ে অনুশীলন করালেন। যখন তিনি নিজে তৃপ্ত হলেন, অর্থাৎ যখন শিক্ষা সম্পূর্ণ হল তখন দীক্ষাও শেষ হলো।

একই সময়ে আরও একটি কাজ করেছিলেন গুরুদাসমল। তিনি পুত্রের কাছে সেই সব বিপ্লবীর দীপ্তোজ্জ্বল অমর কাহিনীগুলি বলতেন—যারা মুক্তির সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছেন। তিনি শোনাতেন শিবাজী, ঝাঁসির রাণী, ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং এইরকম আরও অন্যান্যের কথা।

১৯৩০-এর ১৯শে ডিসেম্বর হরিকিষণ আর চমনলালকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন লালা গুরুদাসমল, নওশেরা রেলস্টেশনে। ঠিক ছিল, এই দুই তরুণ লাহোরে যাবার জন্য বোম্বে এক্সপ্রেস ধরবেন। বিদায়ের আগে তিনি দুই দেশপ্রেমিককেই আলিঙ্গন করলেন. তারপব চমনলালের দিকে তাকিয়ে বললেন—'হরিকিষণের বয়স অল্প, সে সহজ ও সরল, সংসারের রীতিনীতি জানে না। ওর দিকে লক্ষ্য রেখো, বিপদের মুখে ওকে ছেড়ে যেয়ো না!'

চমনলাল লালাজিকে আশ্বাস দিয়ে বললো—'এই সাঁতারের খেলায়—আমরা একসঙ্গেই ভেসে থাকবো, নইলে একসঙ্গে ডুবে যাবো।'

হরিকিষণের উদ্দেশ্যে গুরুদাস মলের শেষ কথা—'সব মানুষকেই একদিন না একদিন মরতে হবেই ; কিন্তু যাঁরা দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করেন তাঁরা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকেন। আমি জানি, তুমি নিজে যে পথ বেছে নিয়েছ, সে পথে চলতে গিয়ে তুমি দ্বিধাগ্রস্ত হবে না কিংবা সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না। তলোয়ার-জাতির সুনাম তোমার হাতে কলঙ্কিত হবে না—আমি নিশ্চিত জানি।'

হাত তুলে যখন গুরুদাস মল তাঁর তরুণ পুত্রকে বিদায়-সম্ভাষণ জানালেন তখন তাঁর দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো, কেননা তিনি জানতেন সে তার মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়েছে।

'ডেইলি প্রতাপ' কাগজের চমনলাল আজাদ নিজেও একজন বিপ্লবী ছিলেন। পরবর্তীকালে পিতা-পুত্রের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—'সম্ভবত ইতিহাসে এইটিই প্রথম দৃষ্টান্ত যেখানে পিতা তার পুত্রকে বিপ্লবের পথে দীক্ষা দিয়েছেন, আর সেই তরুণ পুত্রকে দেশের স্বাধীনতার জন্যই ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিয়েছেন।'

পাঁচ

সেই ভয়ঙ্কর দিনটি

লালা গুরুদাস মলের দ্বিতীয় পুত্র হরিকিষণ জন্মগ্রহণ করেছিল ১৯০৮-এর জানুয়ারীর কোনো একটি দিনে। এর আগেই আমরা জেনেছি অল্প বয়সেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল। গোড়ার দিকে সে পিতাকে চাষের কাজে সাহায্য করতো। সেই অঞ্চলের পাখ্‌তুনি তরুণ-সম্প্রদায়ের, বিশেষ ক'রে নবাবের নিঃস্ব প্রজাদের কাছে সে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। আদর ক'রে তাকে ওরা নায়েক বা মাস্টার বল্‌তো। সে ওদের সঙ্গে মাছ ধরতে, শিকার করতে বা মাঠের কাজেও যেতো। পরে সে ওদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লালকুর্তা-দলে কাজ করেছে।

পাঞ্জাবের গবর্নরকে সে গুলি ক'রে হত্যা করবে তার এই সঙ্কল্পের কথাও আমরা জানি—সে গুলি করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে, বার্ষিক সমাবর্ত্তন-উৎসবের অনুষ্ঠানে। এই সঙ্কল্প নিয়েই সে লাহোরে যাত্রা করেছে—এ সংবাদও আমাদের জানা।

লাহোরে পৌঁছে সে জানতে পারলো, যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নি বলে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছে। সঙ্গীদের কাছে এই কথা শুনে হরিকিষণ বিচলিত হলো, কিন্তু সে দৃঢ়কণ্ঠে জানালো—সে ফিরে যাবে না। পিতাকে সে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়ে এসেছে যে, কর্তব্য সম্পূর্ণ না ক'রে সে ফিরে যাবে না। সে বললো, তার কোনো সাহায্যের দরকার নেই, সে একাই সব করতে পারবে—শুধু এইটুকু জানা দরকার, ব্যাপারটা এখনও গুপ্ত আছে কিনা। কমরেডরা ওকে আশ্বস্ত করলো—সে ভয় নেই।

লাহোরে হরিকিষণ, রণবীর সিং, দুর্গাদাস খান্না, ইহ্‌সান এলাহি এবং পাঞ্জাবের নওজোয়ান ভারত-সভার আরো কয়েকজন সক্রিয়

সঙ্গোর সঙ্গে দেখা করলো। তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলটি ঘুরিয়ে দেখানো হলো—কোথায় সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবে, হলে কিভাবে তাকে ঢুকতে হবে সবই তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। হলের একটি প্রবেশপত্র —তাছাড়া স্নাতকের একটি গাউনও তার জন্য সংগ্রহ করা হলো। একটি বইয়ের মধ্যে রিভলবার রাখার জায়গা ঠিক করে দেওয়া হলো— এই বইটিই তাকে হলে প্রবেশ করার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

১৯৩০-এর ২৩শে ডিসেম্বর।

ভোর থেকে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের মোতায়েন করা হলো সিনেট হল পর্যন্ত যাবার পথটি জুড়ে। লাহোরের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে স্যাণ্ডার্স হত্যার পর পুলিশ কোনো ত্রুটি রাখতে চায় নি—তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি খুবই কড়ারকমের হয়েছিল; কেননা, যেখানে প্রদেশের উচ্চতম শাসন-কর্তৃপক্ষ জড়িত, সেখানে হলে যারা প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেককেই গেটপাস্ দেখাতে হয়েছিল।

২৩শে ডিসেম্বর সকাল এগারোটায় হরিকিষণ যখন কয়েকটি স্থানে তার প্রবেশপত্রটি দেখাতে দেখাতে যাচ্ছিল তখন তাকে মনে হচ্ছিল সম্পূর্ণ শান্ত। ক্রমে সে হলের মধ্যে তার সীটের কাছে এলো। যারা ডিগ্রি নিতে এসেছে তারা যেমন হল ভর্তি করে রেখেছে তেমনি সেখানে ছিল উচ্চ শাসন-কর্তৃপক্ষীয় লোকেরাও।

যথাসময়ে হলে এসে দাঁড়ালেন গবর্নর, স্যার জিওফ্রি দ্য মণ্ট্ মোরেন্সী!

ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই তিনি এসেছিলেন—তাঁকে ঘিরে আছে নিরাপত্তা বিভাগের লোকজন। কয়েক মিনিট পর স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দিলেন তাঁর সমাবর্তন ভাষণ।

গবর্নর ডিগ্রী বিতরণ করলেন—উপলক্ষ্য অনুযায়ী যথারীতি ভাষণও দিলেন। তিনি হল ছেড়ে চলে যাবেন এমন সময় হরিকিষণ উঠে দাঁড়ালো তার আসন থেকে। গোড়ায় সে ভেবেছিল, সভার কাজ আরম্ভ হবার আগেই সে তার কাজ শেষ করবে—কিন্তু হলে ঢোকবার

পর সে তার মত পরিবর্তন করলো—ভাবলো, সভা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা স্থগিত থাক। ইংরেজী জানতো না বলে সে ভেবেছিল, সভা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বলেই মঞ্চে যারা ছিলেন তাঁরা চলে যাচ্ছেন।

যাইহোক, হরিকিষণ দ্রুত একটি চেয়ারে উঠে দাঁড়ালো—তারপর গবর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলো। গুলিবর্ষণ শুরু হতেই হলের মধ্যে এক ভয়ানক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এমন কি কয়েকজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী প্রাণভয়ে দৌড়াতে লাগলেন—অতিথিরা একে অন্যের দেহের উপরে আছড়ে পড়তে লাগলেন।

আমার এক ভাইয়ের কাছে তারই এক অধ্যাপক পরে এই দৃশ্যটি বর্ণনা করেছিলেন—তিনি তাঁর ডিগ্রী নেবার জন্য তখন ঐ হলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—হরিকিষণ বিন্দুমাত্র চঞ্চল হয় নি, তীব্র আবেগের দীপ্তি তার সমস্ত মুখটিকে উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। মঞ্চে গবর্নরকে ঘিরে কিছু লোক দাঁড়িয়েছিলেন বলে অন্যকে আঘাত না করে গবর্নরকে গুলিবিদ্ধ করা নিশ্চয়ই ওর কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যাইহোক্, হরিকিষণের প্রথম গুলি গবর্নরের বুকের পাশ কাটিয়ে বাঁ হাতের উপরের অংশে গিয়ে লাগলো, দ্বিতীয় গুলি পিঠের দিকে সামান্য আঘাত করলো। এরই মধ্যে পুলিশ কর্মচারীরা আর মঞ্চে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সবাই মিলে গবর্নরকে ঘিরে ফেললেন। হরিকিষণ তাদের কাউকে আঘাত করতে চায় নি। অন্তত ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ যাতে কোনো রকমে আহত না হন সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল।

তখন পুলিশ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর চনন সিং রিভলবার হাতে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। হরিকিষণের তৃতীয় গুলি তার চোয়াল ভেদ করে চলে গেল। তিনি হল থেকে ছুটে বাইরে এসে মাঠের উপর গড়িয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হলো।

হরিকিষণের চতুর্থ গুলিতে আহত হলেন সি. আই. ডি. ইন্‌স্‌পেক্টর বুধ সিং, পঞ্চম গুলি আহত করলো লাহোরের লেডি হার্ডিঞ্জ উইমেন্‌স্ কলেজের লেডি ডাক্তার মিস্ ডারমিটকে।

এর মধ্যেই হরিকিষণ ছুটে বেরিয়ে এলো বারান্দায়—তার শেষ গুলিটি বিপরীত দিকের দেওয়ালে বিদ্ধ হলো। যতক্ষণ তার রিভলবারে গুলি ছিল কেউ তার কাছে এগোতে সাহস পায় নি। কিন্তু এইবার পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর দেওয়ান চাঁদ, পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর জওহরলাল এবং আরও অনেকে ঘিরে ফেলে তাকে আয়ত্তে আনলো। তার কাছে অবশ্য আরও হু'টি গুলি ছিল কিন্তু এখন তার কেনো প্রয়োজন ছিল না—তার শিকারকে তখন ওরা হল থেকে বার করে পাশের ঘরে নিয়ে গেছে। সেখানে কর্নেল হারপাল নেলসন তার প্রাথমিক চিকিৎসা করলেন। তারপর গবর্নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মেয়ো হাসপাতালে। হাসপাতালে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের পর তাঁকে পাঠানো হলো তাঁর গৃহে।

বহু বছর পর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ অল ইণ্ডিয়া শিখ ফেডারেশনের প্রতিনিধিবর্গের নিকট এই দিনের ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই বর্ণনা ১৯৬৩-র Indian Express-এর ২০ শে সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল :

"আজ রাষ্ট্রপতি তেত্রিশ বছর আগেকার একটি ঘটনা স্মরণ করছিলেন। তিনি বলছিলেন, কেমন করে উনিশ বছরের এক তরুণ পাঞ্জাবের তখনকার গবর্নর স্যার জিওফ্রি ছ মণ্ট্‌মোরেন্সীকে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করতে গিয়ে তাঁর জীবন রক্ষার জন্য তৎপর হয়েছিল!"

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন—"তারিখটা ১৯৩০-এর ২৩ শে ডিসেম্বর ; তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। ভাষণের পর যখন তিনি হল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন তখন ঐ তরুণ প্রবেশপথের মুখে দাঁড়িয়ে গবর্নরের দিকে গুলি ছুড়েছিল—গুলির লক্ষ্য ছিল গবর্নরের দুটি পা।"

"ছেলেটি পরে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে বলেছিল, 'ডক্টর সাহেব যাতে আহত না হন—সেই দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়েই কোনো ঝুঁকি সে নিতে পারে নি'।"

ছয়

অগ্নিপরীক্ষা

গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই হরিকিষণকে নিয়ে যাওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভবনেরই একটি কক্ষে; সেখানে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ওকে পাঠানো হলো নিকটবর্তী আনারকলির থানায়। থানায় ওকে প্রহার করা হলো—উৎপীড়নের মধ্যে জেরা চললো—তাকে বলতে বলা হলো—তোমাকে কারা সাহায্য করেছে?—তাদের ঠিকানা? কিন্তু ওর কাছ থেকে ওরা কোনো খবরই পেলো না; শুধু জানতে পারলো ওর নাম আর ঠিকানা—তখন ওকে পাঠানো হলো লাহোর দুর্গে, আরো পরিপাটিভাবে সংবাদ আদায়ের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য।

রাজনৈতিক বন্দীদের উপর জঘন্য অত্যাচারের জন্য সে সময়ে লাহোর দুর্গ ছিল কুখ্যাত; যেসব কর্মচারীরা এই অত্যাচার করতেন তারাও কম খ্যাতির অধিকারী ছিলেন না। তারা প্রবল উৎসাহে হরিকিষণের উপর তাদের কৌশল প্রয়োগের কাজ শুরু করলেন।

ওকে হাত-পা বেঁধে ওরা একটা ঘড়ির সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখলো: এই অবস্থায় দিনের পর দিন কাটলো, কোনো খাদ্য ওকে দেওয়া হলো না—উদ্দেশ্য, যাতে ও ক্ষুধায় ছটফট করে আর বিন্দুমাত্র ঘুমুতে না পারে।

লাহোরের সেই দুরন্ত শীতে ওরা ওকে উলঙ্গ করে শুইয়ে রেখে দিলে বরফের চাঁই-এর উপর—আর দেহটাকেও ঢেকে দিল বরফের চাঁই দিয়ে।

ওকে ওরা জোর করে বসিয়ে রাখলো একটি চেয়ারে—সেখানে বসার আসন লোহার সূক্ষ্ম পেরেক দিয়ে গাঁথা।

কে. বি. শেখ এবং আবদুল হামিদের মতো কুখ্যাত কর্মচারীরা

এলেন ; এর আগে এরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন। তারা এসে ওর দুই হাতের পেছনে সূঁচ ফোটাতে লাগলেন—ফলে অঝোর ধারে রক্ত গড়িয়ে পড়লো—তারপর আঙ্গুল থেকে নখ উপড়ে দেওয়া হলো। অসহ্য তার জ্বালা! কাছেই সব সময়ে এক ডাক্তার দাঁড়িয়ে থাকতেন—যদি এই সমস্ত অত্যাচারের ফলে সে জ্ঞান হারায় তবে তিনি ইন্‌জেকসন দিয়ে ওকে সচেতন রাখতে পারবেন।

হরিকিষণ কিন্তু বীরের মতো এই সব উৎপীড়ন সহ্য করলো। সমস্ত অত্যাচারের মুখে তার একটিমাত্র উত্তর ছিল—'আমি এই কাজের জন্য একাই দায়ী,—আমার বাড়ী থেকে আমি একাই এসেছিলাম গবর্নরকে হত্যা করতে ; এই উদ্দেশ্য সফল করতে কেউ আমাকে সাহায্য করে নি!'

সমস্ত অত্যাচার ব্যর্থ হলো—হার মানতে হলো পুলিশকে! ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৬৭ নং ধারা মতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে আনা হলো লাহোর দুর্গে। এই দুর্গেরই এক ছোট কক্ষে হরিকিষণকে বন্দী রাখা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট এসে ওর জবানবন্দী লিখে নিলেন। এতে স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়েছিল যে সে তার বাড়ী থেকে একা এসেছিল লাহোরে—গবর্নরকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করাই ছিল তার এই যাত্রার উদ্দেশ্য। এই গবর্নর ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিনিধি, ভারতের জনগণের উপরে অসংখ্য বর্বর উৎপীড়নের জন্য দায়ী। সে আরও বলেছিল যে, অন্য কাউকে আঘাত করা তার উদ্দেশ্য ছিল না।

আত্মরক্ষার জন্যই সে চনন সিংকে গুলি করেছিল ; অন্য যদি কেউ আহত হয়ে থাকেন, তা কেবল তার পথে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন বলেই।

ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৩১-এর ২রা জানুয়ারী হরিকিষণকে লাহোরের বোরস্টাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। পরদিন তাকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই. এস. লিউইস-এর এজলাসে উপস্থিত করা হলো। এই প্রথম শুনানিতে রায় বাহাদুর ঈশ্বরচন্দ্র

মেহ্‌তা সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পি. এন. দত্ত, সি. আই. ডি. ইন্‌স্‌পেক্টর জওহরলাল, সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর দেওয়ান চাঁদ, রায় বাহাদুর দিউয়ান চাঁদ, ডি. এস. পি আনারকলি কোতোয়ালি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসিস্টান্ট কনট্রোলার এস. পি. সিং, লেফ্‌টানান্ট কর্নেল হারপাল নেলসন, কর্নেল ভারুচা, সুরত্‌ সিং, সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর লাভুরাম, হেড্‌ কনস্টেবল মহম্মদ গজনফর এবং কনস্টেবল ইওয়ান দিন—সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে এদের বিবৃতি নেওয়া হয়েছিল কিন্তু আসামীর পক্ষে কোনো সাক্ষী উপস্থিত করা হয় নি। এমন কি তার আত্মীয়-স্বজন কাউকেই উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে আসামীর পক্ষে কথা বলবার জন্য কেউ ছিল না।

শুনানির সময়ে সম্পূর্ণ শান্ত ছিল হরিকিষণ। সে বরাবর যা বলে এসেছে তারই পুনরাবৃত্তি করে বললো—'আমি একাই একাজের জন্য দায়ী।' লাহোরে এসে সে কোথায় ছিল, কে তার জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিল—এসব কথা সে কিছুতেই প্রকাশ করে নি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লাহোর কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হরিকিষণের এই ধরনের বিবৃতিই নথিভুক্ত করা হয়েছিল যাতে সে পরে কোনো পরিবর্তন করতে না পারে। কিন্তু দেখা গেল পুলিশই তার নীতি বর্জন করেছে। তারা কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে চেষ্টা করলো।

হরিকিষণকে অনুরোধ করা হলো তার বিবৃতি প্রত্যাহার করে নিতে, বলা হলো সে যেন কিছুতেই স্বীকার না করে যে ১৯৩০-এর ২৩ শে ডিসেম্বর সে গবর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল।

এ খেলার অর্থ এই যে, এতে হরিকিষণ জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে; তখন ওকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও সাধারণের পক্ষ থেকে ওর জন্য আন্দোলন বা সভা, মিছিল এসব করা হবে না।

কিন্তু একেবারে অনড় এবং অচল হয়েই রইল হরিকিষণ। সে

যা করেছে তার জন্য সে গৌরব বোধ করতো ; সে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিল—সে সেই দিনটির জন্যই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে যেদিন সে ফাঁসির মালা নিজের হাতে গলায় জড়িয়ে নিতে পারবে। সে আরও বলেছিল যে, সুযোগ পেলে সে তার কাজের পুনরাবৃত্তি করতে প্রস্তুত।

মামলার পরবর্তী শুনানি নির্দিষ্ট হলো ১৯৩১-এর পাঁচুই জানুয়ারী তারিখে। এই দিনে ম্যাজিস্ট্রেট হরিকিষণের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করলেন—এ. এস. আই চনন সিংহের হত্যার জন্য ৩০২ ধারা অনুযায়ী আর গবর্নরকে হত্যার চেষ্টার জন্য ৩০৭ ধারা অনুযায়ী। তারপর খুবই সংক্ষিপ্ত এক শুনানির পর মামলাটি দায়রায় সোপর্দ করা হলো।

এই আদালতেও আসামীর পক্ষে বলবার কেউ ছিল না। সরকার পক্ষে যাদের সাক্ষী হিসেবে হাজির করা হয়েছিল তারা হলেন—কাপ্টেন আর. ও. সি ড্রামণ্ড, গবর্নরের এ. ডি. সি, ওয়াটার লক্‌স অ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ লিউইস, লাহোরের সরকারী কনট্র্যাকটর মিঃ আবদুল রেহ্‌মান, ইন্‌স্‌পেক্টর বুধ সিং ওয়াধাওয়ান্‌, গবর্নরের বেয়ারা মহম্মদ খান্‌, গবর্নরের ধোপা রামলাল আর তাঁর দরজি বসন্ত্‌ রাম।

হরিকিষণ নিজে গোড়াতেই ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানিয়েছিল, তাকে যেন কোর্ট ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়, কেননা এই শুনানিতে তার কোনো অংশ নেই।

পেশোয়ারী পটকা, একটি গাঢ় ধূসরবর্ণের কোট আর শালোয়ার পরা হরিকিষণকে খুবই নিস্তেজ ও দুর্বল দেখাচ্ছিল—এর কারণ সেই নির্মম অগ্নিপরীক্ষা, যার মধ্য দিয়ে তাকে পার হয়ে আসতে হয়েছিল। এর আর একটি কারণও ছিল—হরিকিষণ অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিল।

পরে হরিকিষণ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কবুল করেছিল—সে গবর্নরকে হত্যা করার জন্যই তার গ্রাম থেকে লাহোরে চলে এসেছিল। যাকে হত্যা করা তার সঙ্কল্প ছিল তাকে লক্ষ্য করে সে দুটো গুলি ছুড়েছিল।

আর কাউকে আঘাত করতে সে চায় নি—সাব-ইন্‌সপেক্টর চনন সিং এবং ইনস্‌পেক্টর বুধ সিংকে লক্ষ্য করে যে তাকে গুলি ছুড়তে হয়েছিল—তা কেবল আত্মরক্ষার জন্যই। সে স্বীকার করেছিল—রিভলবার, ছয়টি কার্তুজ, পোশাক এবং একটি আঙটি প্রভৃতি যা আদালতে উপস্থিত করা হয়েছিল, সবই তার।

সাত

নির্যাতনের মুখে

এরই মধ্যে হরিকিষণের গবর্নর হত্যা-প্রচেষ্টার কথা দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেইদিন লাহোর থেকে যেসব ট্রেন আসছিল—সবগুলিকেই থামিয়ে রেখে যাত্রীদের উপর কঠোর খানা-তল্লাসী চললো। পুলিশ আর সি. আই. ডি কর্মীদের বিরাট এক জাল পাতা হলো লাহোর থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত—উদ্দেশ্য বেপরোয়া তল্লাসী আর সন্দেহমাত্র তরুণদের গ্রেপ্তার।

সেই দিনটিতে, অর্থাৎ ১৯৩০-এর ২৩শে ডিসেম্বর গুরুদাসমল তাঁর ছেলে ভগৎরামকে দেখতে গিয়েছিলেন—ভগৎরাম তখন পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছিল। ফিরে এসে তিনি শুনলেন, লাহোরে গবর্নরের উপরে গুলি ছোড়ার সংবাদ; তিনি বুঝতে পারলেন, সমস্ত পরিবারের পক্ষে একটা পরীক্ষার দিন আসছে।

বেশী সময় তাকে অপেক্ষা করতে হলো না। কারণ সেই দিনই মধ্যরাত্রির গভীর অন্ধকারে হাতে রাইফেল, রিভলবার ও টর্চ নিয়ে এক বিরাট পুলিশবাহিনী তাঁর গৃহে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ঘাল্লাদেহর—সেই ছোট্ট গ্রামটি তখন ঘুমিয়ে ছিল। যেমন ভাবে তারা সেই বাড়ীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো—মনে হল যেন তারা শত্রু-অধিকৃত এক দুর্গ আক্রমণ করেছে। তারা বাড়ীর সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলো; মা, মাসী ও অন্যান্য ভাইদের সেই ডিসেম্বর মাসের রাত্রিতে বাড়ী থেকে বার করে দিল। সমস্ত বাড়ীটাই তখন তাদের দখলে—মনে হলো, তারা যেন এক শত্রু দুর্গ দখল করে বসে আছে।

অবশ্য, অপরাধসূচক কিছুই ওরা খুঁজে পায় নি। তারা পেয়েছিল সার্টিফিকেটগুলি—গুরুদাসমল যেসব পেয়েছিলেন সরকারের কাছ

থেকে—সেই অঞ্চল থেকে ডাকাতদল উচ্ছেদ করার ব্যাপারে তিনি যে সাহস ও সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়েছিলেন তারই স্বীকৃতি হিসেবে।

তবু তারা গুরুদাসমলকে গ্রেপ্তার করে মর্দানে নিয়ে গেল—সেইখানে তু'দিন তাঁকে আটক করে রাখলো। প্রথমে ওরা ভেবেছিল, পিতা ও পুত্রকে জড়িয়ে নিয়ে একটা ষড়যন্ত্রের মামলা গঠন করবে। কিন্তু পরে তারা ভেবে দেখলো, হরিকিষণের ফাঁসিটাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া দরকার। তাছাড়া ষড়যন্ত্র- মামলার নিষ্পত্তি হতে সময় লাগে—এ জাতীয় মামলা প্রমাণ করাও খুব কঠিন!

সুতরাং ওরা সীমান্ত-অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ বিধির চল্লিশ নম্বর ধারা অনুযায়ী গুরুদাসমলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করলো।

এই মামলা সম্পর্কে মর্দানের অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার বলেছিলেন—এই গুরুদাসমল সেই ব্যক্তি যিনি হত্যা ও লুণ্ঠনে রত কতকগুলি বে-আইনি দলকে উৎখাত করতে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন—এখন এরই পুত্র পাঞ্জাবের গভর্নরকে গুলি করেছে!

আদালতে বিবৃতি দিতে গিয়ে গুরুদাসমল এর জবাব দিয়েছিলেন—"ডাকাত-দলনের জন্য ব্রিটিশ সরকার আমাকে প্রশস্তি-পত্র দিয়েছিলেন, তা দশ বছর আগেকার ঘটনা। ঐ সময়ে আমরা ঠিক সচেতন ছিলাম না—তখনও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি বিদেশী শাসনের নিষ্পেষণে পরাধীনতার কত তুর্বিষহ যাতনা সহ্য করতে হয়। এখন আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে তোমরা আমাদের দেশকে পরাধীন করেছ। তোমাদের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।"

গুরুদাসমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র লালা যমুনাদাস তলোয়ার ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে সরকারী চাকুরি করছিলেন। তিনি কাজ করছিলেন পাঞ্জাবের শিখপুরায় ডেপুটি কমিশনারের অফিসে। একই দিনে, অর্থাৎ ১৯৩০-এর ২৩ শে ডিসেম্বর গভীর রাত্রিতে তার বাসগৃহও পুলিশ ঘিরে ফেললো। যমুনাদাসের ছোট ভাই ঈশ্বরদাস তখন স্কুলে পড়ার জন্য ওখানেই থাকতো—তু'জনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করলো।

যমুনাদাসের স্ত্রী আর একমাত্র ছেলেকে ওরা বাধ্য করলো বাড়ী

ছেড়ে বেরিয়ে যেতে—তারপর বাড়ীতে ঝোলানো হলো তালা।

সকালে শুরু হলো ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজ কিন্তু এমন কিছুই ওরা পেলো না যা পরোক্ষভাবেও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। তবু যমুনাদাসকে পুলিশ সুপারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ইনি সামন্তবংশজাত—পেশোয়ার জেলার আর্‌বাব্‌-এর পূর্বপুরুষ। ইনি ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধত, রূঢ় এবং নিষ্ঠুর পুলিশ কর্মচারী। সুতরাং তিনি যমুনাদাসের বিরুদ্ধে কটূক্তি করলেন এবং তাকে অপমান করলেন—অপমান করলেন এই বলে যে, তাদের পরিবারটাই বিশ্বাসঘাতকের পরিবার! করুণাময় এবং ভদ্র ইংরেজের সঙ্গে এই ব্যবহার বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি!

তারপরে পুলিশ তাকে পাঠালো লাহোর দুর্গে। এখানে তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হলো—উদ্দেশ্য, তার কাছ থেকে হরিকিষণ ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা। যমুনাদাস বার বার বলতে লাগলো যে সে কিছুই জানে না। সেই সময়ে সে কিছুই জানতো না, একথা ঠিক; —যা জানবে বলে আশা করেছিল পুলিশ, তাও সে জানতো না। তবু পুলিশ নির্যাতন বন্ধ করলো না। শেষ পর্যন্ত যখন তারা বুঝতে পারলো—গুলি ছোড়ার ঘটনাও সে জানতো না, তখন ২৬শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

সঙ্গে সঙ্গে যমুনাদাস চলে গেল শিখপুরা; সেখানে সে কাগজ পড়ে সমস্ত কাহিনী জানতে পারলো। দারুণ দুশ্চিন্তায় সে যেসব চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠালো তার পিতার কাছে—পুলিশ মাঝপথে সেসব হস্তগত করলো। গুরুদাসমলকেও ওরা কিছু সময়ের জন্য আটক করলো।

আবার শুরু হলো পুলিশের জেরা—কারা হরিকিষণের বন্ধু? যে রিভলবার সে ব্যবহার করেছিল তা সে পেলো কোথায়?

গুরুদাসমল কোনো কথাই প্রকাশ করলেন না। তিনি পুলিশকে অনুরোধ জানালেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক, কেননা তাঁকে ছেলের পক্ষে মামলার তদ্বির করবার জন্য লাহোরে যেতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ঘটনার দশ দিন পর ১৯৩১-এর ২রা জানুয়ারী তাঁকে

স্থান ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি শিখপুরায় গিয়ে ওরা জানুয়ারী যমুনাদাসের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ওকে নিয়ে পরদিনই লাহোর যাত্রা করলেন। দেখা হবার পরই যমুনাদাস বলেছিল—'পিতাজি, সামান্য ব্যাপারেও আপনি সব সময় আমার সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন। কিন্তু হরিকিষণের জন্য এই যে এত বিপজ্জনক পথ আপনি নির্বাচন করলেন আপনি সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলেন নি কেন?' উত্তরে গুরুদাসমল বলেছিলেন—'আমাদের দেশ চায় ত্যাগ, তরুণ দেশপ্রেমিকের রক্ত। আমার নয়টি পুত্র; আমি চেয়েছিলাম তাদের মধ্যে একজন দেশের জন্য তার চরম ত্যাগ করুক।'

যমুনাদাসের মনে পড়ে গেল—লাহোরে তার মরণ-যাত্রার প্রায় একমাস আগে হরিকিষণ শিখপুরায় এসেছিল—বোধহয় তার বড় ভাইকে শেষ এবং নীরব বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে! কিন্তু তখন সে তার লক্ষ্য সম্পর্কে কিছুই বলে নি।

গুরুদাসমল আর যমুনাদাস এলেন লাহোরে। এর মধ্যে হরিকিষণকে লাহোর দুর্গ থেকে বোরস্টাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তারা ওর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন—প্রার্থনা মঞ্জুর হলো।

হরিকিষণ এলো। ওরা দেখলেন—ক্রমাগত উৎপীড়নের ফলে ওর দেহ ফুলে গেছে, বর্ণ হয়েছে নীলাভ। সে চোখ খুলে ভালো করে তাকাতে পারছিল না। গুরুদাসমল বললেন—'তোমার মুখের ঐ জমাট বাঁধা রক্ত আর ঐ দেহের স্ফীতি—এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—কি নরকীয় অত্যাচারের লীলা তোমার উপর চলেছে। কিন্তু একটি কথা আমাকে বলো—'এইবার তিনি 'পোশতু' ভাষায় বলতে শুরু করলেন—'তুমি বলো, ঐ মানব-দৈত্য জিওফ্রি ডি মণ্টমোরেন্সি পার পেলো কি করে? আমি তোমাকে কত যত্নে শিক্ষিত করে তুলেছিলাম!'

সি. আই. ডি এবং জেল কর্মচারীরা এই সময়ে এসে পড়ায় কথাবার্তায় বাধা পড়লো। তারা কথাবার্তা বন্ধ করতে বললেন, কারণ এটা এমন এক ভাষা যা তারা বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু হরিকিষণ

মৃদু হেসে বললো—'উদ্দেশ্যের সফলতা ভগবানের হাতে। আমি গীতার শিক্ষায় বিশ্বাস করি—আত্মার অমরত্বেও আমি বিশ্বাসী। আমি দীনতম উপায়ে দেশের সেবা করতে চেষ্টা করেছি। আমি জানি আমার ফাঁসি হবে—আমি এর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি আবার জন্ম নেব, আবার দেশের জন্য জীবন দেব। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চাকা ঘুরে ঘুরে আসবে—যে পর্যন্ত না দেশের মুক্তি ঘটে।'

আট

বিচার

লালা গুরুদাসমল আর যমুনাদাস লাহোরের আনারকলিতে এলেন—সেখানে সফি সরাইতে একটি ঘর ভাড়া করলেন। ঘর ভাড়ার উদ্দেশ্য ওখানে থেকে হরিকিষণের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করা। যমুনাদাস এই সব প্রস্তুতির ব্যাপারে প্রধান দায়িত্ব নিয়েছিল—ও ভেবেছিল চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই কাজে লাগবে। কিন্তু কয়েকজন জাতীয় নেতার পরামর্শে সে তা করলো না। অবশ্য অল্পকালের মধ্যে ১৯৩১-এর ৩১শে মে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত হতে হয়েছিল।

এরই মধ্যে পাঞ্জাবে একটি ডিফেন্স কমিটি গঠন করা হলো—এই কমিটির সভ্য ছিলেন প্রধানত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিসম্পন্ন আইনজীবী—এদের কাজ মামলায় অভিযুক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ সমর্থন করা। এই কমিটির সভ্য হিসাবে ছিলেন—প্রখ্যাত জনসেবী আমিনচাঁদ মেহতা, পুরণচাঁদ মেহতা, ডক্টর সত্য পাল, কুমারী লজ্জাবতী, জিওনলাল কাপুর এবং আরও কয়েকজন। হরিকিষণের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই কমিটি পুরণচাঁদ মেহ্‌তাকে পাঠালেন। কিছু কালের মধ্যেই এর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন সুপরিচিত কংগ্রেস নেতা ও বিখ্যাত ব্যারিস্টার আসফ আলি—তিনি তখন গুজরাট জেল থেকে মুক্তিলাভ করেছেন। আরও কয়েকজন আইনজীবী এই কাজে পরে যুক্ত হলেন।

আসফ আলি আর পুরণচাঁদ মেহ্‌তা হরিকিষণের পক্ষ সমর্থন করে অনুকূল মামলা পরিচালনায় প্রচুর শ্রম স্বীকার করলেন। আসফ আলি লাহোরে ফ্ল্যাটি হোটেলে নিজের কক্ষে এই ব্যাপারেই গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে থাকতেন—সঙ্গে থাকতেন যমুনাদাস। এই

ঘরেই একদিন তিনি যমুনাদাসকে বলেছিলেন—যখন তিনি প্রথম কাগজে এই ঘটনার কথা পড়লেন তখনই তার ইচ্ছে হয়েছিল—যদি বাইরে থাকতেন তবে আসামীর পক্ষে তিনি মামলা পরিচালনা করতেন। উকিল হিসেবে হরিকিষণের সঙ্গে প্রায়ই তাকে দেখা করতে যেতে হতো। কিন্তু প্রথম দেখাটি তিনি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছিলেন—সি. আই. ডি কর্মচারীরা সঙ্গে ছিলেন তারই প্রতিবাদে। এই প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আলোচনা চালিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। ফলে এই নিয়ম পরে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তা হলেও সি. আই. ডি বিভাগ গুরুদাসমল, যমুনাদাস, হরিকিষণের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন—এমনকি আসফ আলির গতিবিধির উপরেও তীক্ষ্ণ নজর রাখতো।

লাহোরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৩১-এর ৫ই জানুয়ারী হরিকিষণের মামলা দায়রায় সোপর্দ করেছিলেন একথা আমরা জানি। তিনদিন পর লাহোরের দায়রা জজ সিদ্ধান্ত জানালেন—১৪ই জানুয়ারী মামলার প্রথম শুনানি হবে। লাহোরের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এ. এইচ. বি অ্যাণ্ডারসনের আদালতে মামলার শুনানি শুরু হলো; শুনানির সময়ে জিওনলাল কাপুর ও ভি. আর. শেঠী এই মর্মে এক আবেদন জানালেন যে শুনানি মুলতুবী রাখা হোক, কেননা আসামী এই শুনানির নোটিস পেয়েছে মাত্র ৯ই জানুয়ারী—এত অল্প সময়ের মধ্যে মামললার নথিপত্র তৈরী করা সম্ভব নয়। আদালত এই আবেদন বাতিল করে দিলেন। জুরির সাহায্যে বিচারের প্রার্থনাও জানালেন।

২২ শে জানুয়ারী শুনানী শুরু হলো। জুরি গঠনের জন্য কুড়ি জনকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল—তাঁদের মধ্য থেকে জজ আট জনকে বেছে নিয়ে জুরি গঠন করলেন। যাঁরা জুরিতে রইলেন তারা হলেন—ফিনান্স কমিশনারের অফিস থেকে করমচাঁদ কাক্কার, লাহোর গবর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক মোহন সিং, ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ডস্-এর-অফিস থেকে মহ্বুল শাহ্, উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের নাসিরুদ্দীন, মিশন কলেজের প্রফেসর জর্জ, উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের হাসান আলি সার্বি, মিঃ স্মিথ এবং মিঃ ওয়ালিংটন।

প্রফেসর জর্জ হলেন জুরির ফোরম্যান। শুনানির সময়ে আসফ আলি আবেদন জানালেন পাঞ্জাবের বাইরে এই বিচার পরিচালিত হওয়া সঙ্গত, কেননা প্রাদেশিক সরকারের প্রধান, গবর্নর জিওফ্রি ড মণ্টমোরেন্সি, নিজে এই মামলায় জড়িত ; তিনি আশঙ্কা করছেন প্রদেশের মধ্যে বিচার হলে তা সুবিচার হবে না।

এই আবেদন খারিজ করা হলো।

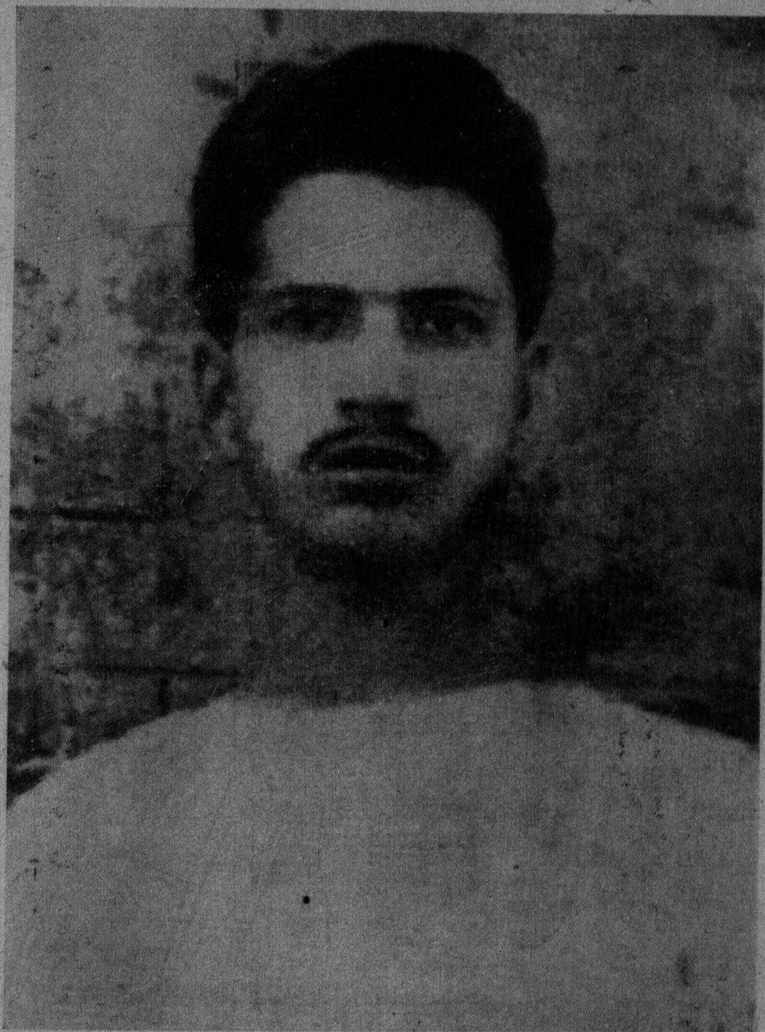
বিচার চলাকালীন বিভিন্ন বিষয়ে আসফ আলি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একবার তিনি প্রতিবাদ জানাতে আদালত কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন ; তার কারণ খোলাখুলিভাবেই অত্যন্ত অন্যায়ভাবে কতকগুলো আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছিল—যাতে মনে করা স্বাভাবিক যে, বিচারবিধি সংক্ষিপ্ত করে কোনোরকমে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি হরিকিষণকে ফাঁসির মঞ্চে উঠিয়ে দেওয়াই হলো একমাত্র লক্ষ্য।

এই অশালীন দ্রুততা আরও একটি ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দায়রা আদালতে প্রথম শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছিল ১৪ই জানুয়ারী—পরবর্তী শুনানির দিনগুলি দ্রুত পরপর এসে গেল—১৫ই ১৬ই, ২১ শে, ও ২২ শে জানুয়ারী। রায় দেওয়া হয়ে গেল ২৬ শে জানুয়ারী।

যে মামলায় মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্ন জড়িত—সে মামলার নিষ্পত্তি এত দ্রুত হয়েছে—এমন দ্বিতীয় নজীর দুর্লভ।

সরকার পক্ষের উকিল তার বিবৃতি শেষ করলেন ; আসামীকে বলা হলো, তার যদি কিছু বক্তব্য থাকে সে বলতে পারে। হরিকিষণ যখন ডকে এসে দাঁড়ালো তখন তাকে প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল সে সুখী। তার তরুণ, নির্দোষ এবং সুন্দর মুখে একটা দীপ্তি ফুটে উঠেছিল। ঠোঁটের ওপরে ক্ষীণ গোঁফের রেখা আর থুতনিতে রোমের অস্পষ্ট আভাস বলে দিচ্ছিল তার বয়স কত অল্প !

দায়রা আদালতের জেরার উত্তরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে আগে যা বলেছিল শান্ত কণ্ঠে সে তারই পুনরাবৃত্তি করলো। একটি লিখিত বিবৃতিও সে পড়ে শোনালো—তাতে সে বর্ণনা করেছিল—১৯৩০-এর ২৩ শে এপ্রিল পেশোয়ারের কিস্সা খোয়ানি বাজারে নিরস্ত্র পাঠান



গ্রন্থকারের দ্বিতীয় অগ্রজ শহীদ হরিকিষণ



মা এবং বোনের সঙ্গে তলোয়ার পরিবারের সাত ভাই

জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে ব্রিটিশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনী কি বর্বর অত্যাচার চালিয়েছিল—সেই নিষ্ঠুর গুলিবর্ষণের ফলে কত নিরপরাধ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারিয়েছিল! মর্দানের কাছে মিরওয়াস দেহরিতে খুদাই খিদ্‌মৎগারের শান্তিপ্রিয় এবং নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপরেও ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করেছিল—লাঠি চার্জ করেছিল —তার ফলেও কত লোকের মৃত্যু হয়েছে। হাবিব নূর নামে এক তরুণ দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে পেশোয়ার জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল—তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে তেহ্‌শীল চরসদ্দার ব্রিটিশ অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনারকে গুলি করতে চেষ্টা করেছিল।

হরিকিষণ তার বিবৃতিতে আরও বলেছিল—ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষভাব নেই; কিন্তু যে শাসকতন্ত্রের দৌলতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী এসে তাদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে তাকেই আমি চূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। হরিকিষণ তার বিবৃতিতে বলেছিল, 'আমার ভাগ্যে কি আছে আমি জানি—সেই সম্পর্কে আমার কোনোরকম সংশয় নেই। আমার জীবন বিসর্জনের ফলে যদি ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য অধিকতর নিকটবর্তী হয় তাহলে একবার মাত্র আমি জীবনদান করবো না—বার বার জন্ম নিয়ে হাজার বার তা করবো। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমার মৃত্যুর পর হাজার হাজার হরিকিষণের জন্ম হবে—তারাই স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যতদিন না মুক্তির দিন আসে। আমি চাই ব্রিটিশেরা একথা বুঝুক—তারা আমার স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করার আজ সময় এসেছে। তারপর যত শীঘ্র সম্ভব এদেশ ছেড়ে তারা চলে যায় ততই মঙ্গল।'

হরিকিষণের বিবৃতির শেষে ছিল একটি শ্লোগান—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'! এই ধ্বনি তাঁর আদর্শ বীর ভগৎ সিং অমর করে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সমর্থনে কোনো সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেছিলেন, আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন পরের দিনের জন্য।

১৯৩১-এর ২৬ শে জানুয়ারী মামলার রায় প্রদানের কথা। সেদিন বোরস্টাল জেল থেকে আদালত-গৃহ পর্যন্ত পথটি সশস্ত্র পুলিশ আর সামরিক বাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখা হলো। সাধারণ মানুষ পথের মোড়ে দলে দলে হাজির হতে লাগলো। গাড়ীর ভিতরে তারই মুখ থেকে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'—এই ধ্বনি শোনামাত্র সেই মন্ত্র ধ্বনিত হলো সকলের কণ্ঠে।

জেলা ও দায়রা জজ মিঃ এ. এইচ. বি. অ্যাণ্ডারসন আদালতে এসেই জুরিদের বললেন—তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে। জুরিগণ সর্ব-সম্মতিক্রমে হরিকিষণকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন, কিন্তু তার তরুণ বয়সের কথা ভেবে আদালতকে অনুরোধ জানালেন—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেই ওকে দণ্ডিত করা হোক।

কিন্তু জজ জুরির অনুমোদন উপেক্ষা করে হরিকিষণকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন—তাঁর অপরাধ সে স্বেচ্ছায় সাব-ইনস্পেক্টর চনন সিংকে হত্যা করেছে। তিনি তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন পাঞ্জাবের গবর্নরকে হত্যার চেষ্টায় আহত করার জন্য। ইন্সপেক্টর বুধ সিং ওয়াধাওয়ান এবং লেডি ডাক্তার মিস ডারমিটকে মারাত্মকভাবে আহত করার জন্যও তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

খুব শান্ত চিত্তেই হরিকিষণ বিচারের এই রায় গ্রহণ করলো। তার মনের সাধ পূর্ণ করবার জন্য সে আদালতকে ধন্যবাদ জানালো। শোনা যায়, এই রায়ের জবাবে হরিকিষণ জজকে বলেছিল—আমাকে দয়া করে বলুন, আঠাশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করার পর কি আমাকে ফাঁসি দেওয়া হবে? না, ফাঁসি দেওয়ার পর আমাকে আঠাশ বছর জেলে ঝুলিয়ে রাখা হবে?

রায় দেবার পরই যমুনাদাস ও আসফআলি স্থির করলেন দায়রা আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করবেন; কিন্তু প্রথমে তার পক্ষ থেকে আপীল করার ভার দিয়ে যে কাগজপত্রে সই করতে হবে—হরিকিষণ তা করতে অস্বীকার করলো। পরে তাদের পীড়াপীড়ির ফলে আর গুরুদাসমলের সম্মতি পেয়েই সে কাগজপত্রে স্বাক্ষর করলো; কিন্তু জেল হাজতে ফিরে যাবার পর সে দায়রা জজকে

লিখে জানালো, তার অনুমতিপত্র যেন গ্রহণ না করা হয়, কারণ সে কোনো কিছুর জন্যেই কারো কাছে আপীল করতে চায় না।

ইতিমধ্যে রায়ের পর তাকে বোরস্টাল জেল থেকে লাহোরের সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

১৯২১-এর মার্চে লাহোর হাইকোর্টে আপীলের প্রথম শুনানী শুরু হলো। এই শুনানীতে সরকার পক্ষের উকিল এই বলে আপত্তি জানালেন যে, শুনানী চলতে পারে না, কেননা আসামী তার পক্ষ থেকে আপীলে অনিচ্ছা জানিয়েছে। লাহোরের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ভগৎরাম পুরী আসামীর পক্ষে মামলার তদারক করছিলেন—তিনি জবাবে বললেন, হাইকোর্টের অনুমোদন ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলে না। সুতরাং রাজ্য সরকারের কর্তব্য, আসামীর যদি নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা না থাকে—তার পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করা।

এর ফলে সরকার পক্ষীয় বক্তব্য টিকলো না। আসামী পক্ষের উকিল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বোঝাতে চাইলেন—এই মামলা অত্যন্ত অন্যায় রকমের দ্রুত গতিতে নিষ্পত্তির পথে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—এবং তাতে মামলার প্রস্তুতি ও তদ্বিরের ব্যাপারে আসামী পক্ষকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নি। সরকার পক্ষীয় মামালা পরিচালনায় যেখানে যেখানে দুর্বলতা বা অসঙ্গতি ছিল তাও তিনি বিশ্লেষণ করে দেখালেন।

কিন্তু ১৯৩১-এর মার্চের দশ তারিখে হাইকোর্ট এই আপীল প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন জাতীয় নেতাদের পরামর্শে সঙ্গে সঙ্গেই আপীল করা হোলো প্রিভি কাউন্সিলে। এই আপীলের উদ্দেশ্য—সময় প্রার্থনা। এই সময়ে জাতীয় নেতাদের সঙ্গে সরকার পক্ষের আলোচনা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিল—এই আলোচনায় এক ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছিল, সরকার হয়তো শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানে সম্মত হতে পারেন—অন্তত মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অনুমোদন করতে পারেন।

কিন্তু এই চেষ্টাও সফল হলো না। প্রিভি কাউন্সিলও আপীল প্রত্যাখ্যান করলেন। হরিকিষণের মৃত্যুদণ্ড বহাল রইলো।

নয়

শহীদ হরিকিষণ

এরই মধ্যে একটা অশান্তির আলোড়ন জেগে উঠেছিল সমগ্র দেশজুড়ে—বিশেষ করে পাঞ্জাবে। হরিকিষণের ঈপ্সিত শিকার স্যার জিওফ্রি ছ মণ্টমোরেন্সি ভাইসরয় লর্ড আরউইন-এর কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে এর একটা আভাস মিলবে। তিনি লিখেছিলেন—'এখানে দারুণ এক দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। নিষেধাজ্ঞা তুলে দেবার পর যুবসংঘ ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের এবং হরিকিষণকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছে ··আমরা বোধ হয় ১৯১৯-এর মতোই এক বিশাল তাণ্ডবের সম্মুখীন হয়েছি। (হোম/রাজনৈতিক্ষ ফাইল—নং ৩৩/II, ১৯৩১)

সারা দেশে অবিরাম ক্রুদ্ধ জনতার বিক্ষোভ, মিছিল, সভাসমিতির আয়োজন দেখে শাসকদলের মনে পড়লো অমৃতসর এবং জালিয়ান-ওয়ালা বাগের কথা।

প্রিভিকাউন্সিল হরিকিষণের আপীল প্রত্যাখ্যান করার পর—হরিকিষণকে গোপনে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল মিউমানি জেলখানায়। এর আগে লাহোরের সেণ্ট্রাল জেলে থাকতেই একজন সদাশয় কর্মচারীর সাহায্যে হরিকিষণ তার 'হিরো' ভগৎ সিং-এর সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখা করতে পেরেছিল। এই সাক্ষাৎকার তার দিকে থেকে জীবনের এক পরম সার্থকতা! ভগৎ সিং সম্পর্কে তার শ্রদ্ধা এত গভীর ছিল যে গুরুদাসমল মনে করতেন—হরিকিষণ গভর্নরকে গুলিবিদ্ধ করার জন্য এমন যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল তা শুধু 'জেলে ভগৎ সিং-এর দর্শন লাভের জন্য'। (হোম/রাজনৈতিক ফাইল—নং ৩৩/II, ১৯৩১)।

১৯৩১-এর ২৩শে মার্চ প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করেই ভগৎ সিং,

রাজগুরু আর শুকদেবকে ফাঁসি দেওয়া হলো গভীর রাত্রিতে এবং তারপর ব্রিটিশ সৈন্য চটের থলিতে তাদের দেহ মুড়ে জীপগাড়ীতে গোপনে নিয়ে গেল ফিরোজপুরের কাছে লুসেইনিওয়ালাতে। সেখানে তাদের দেহগুলি পেট্রোলে ভিজিয়ে নিয়ে সাটলেজ নদীর তীরে ঝোপের মধ্যে দ্রুত দগ্ধ করা হলো।

কিন্তু কঠোরতম গোপনতা সত্ত্বেও সংবাদ প্রকাশিত হয়ে দাবানলের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। হাজার হাজার মানুষ সেই স্থানে এসে জড়ো হলো; শহীদদের দেহের অংশগুলো তখনও দগ্ধ হয় নি, তারা সেগুলো তুলে শোভাযাত্রা সহকারে বহন করে নিয়ে গেল— তারপর এই মহান ভারতসন্তানদের শেষকৃত্য যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন করলো। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে জাতির রোষ শতগুণে বেড়ে গেল।

তুলনামূলকদৃষ্টিতে দেখতে গেলে মিয়ানওয়ালি ছিল সেই আমলের পাঞ্জাবের একটি অনগ্রসর এলাকা। এখানে সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীরা চাষীদের ক্রীতদাসের মতো দেখতো—ব্রিটিশ শাসকেরা ছিল তাদের সহায়। সরকার মনে করতেন সাধারণের মধ্যে কোনো অশান্তিকর আন্দোলন যাতে দানা পাকাতে না পারে তার জন্য এইটিই হলো নিরাপদ পথ।

হরিকিষণের মিয়ানওয়ালিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সংবাদটাও খুব সযত্নেই গোপন রাখা হয়েছিল। তার বড় ভাই যমুনাদাস যখন লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ওর সঙ্গে দেখা করতে গেল, ওরা শুধু বললো—হরিকিষণ সেখানে নেই—তার পর যখন হোম সেক্রেটারী পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ালো তখন যমুনাদাসকে জানানো হলো— ইতিমধ্যেই তাকে মিয়ানওয়ালি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিয়ানওয়ালি জেলে যমুনাদাস হরিকিষণের সঙ্গে দেখা করতেই হরিকিষণ প্রথমে জানতে চাইল—ভগৎ সিং আর অন্য দুই কমরেডের সংবাদ কি? যমুনাদাস ফাঁসির সংবাদটা দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত করছিল। হরিকিষণ বললো—সে জানে তাঁদের ইতিমধ্যেই ফাঁসি দেওয়া হয়ে গেছে। সে শুধু উৎসুক

হয়ে আছে সেই দিনটিকে অভ্যর্থনা জানাতে যেদিন সে-ও ফাঁসির মালা গলায় জড়াবে; এর ফলে সে তো সেই সব বড় বড় বিপ্লবীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে যাঁরা দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছেন! ১৯৩১-এর ৯ই জুন হরিকিষণের ফাঁসির দিন! এই দিনটিই স্থির করা হয়েছিল।

জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে এই কথা শুনেই যমুনাদাস তার পিতাকে টেলিগ্রামে জানালো, পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে হরিকিষণকে শেষ দেখা দেখবার জন্য তিনি যেন ৮ই জুন মিয়ানওয়ালিতে আসেন। পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে কারাদণ্ড ভোগ করছিল ভগৎরাম—সেও জানতে পেরেছিল ফাঁসির জন্য নির্দিষ্ট এই দিনটির কথা। সে-ও সঙ্গে সঙ্গে হরিকিষণের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে পাঠালো। তার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো।

দৈবের লীলা! যে ট্রেনে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অধীনে ভগৎরামকে মিয়ানওয়ালিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল—নওশেরা থেকে সেই ট্রেনেই উঠলেন গুরুদাসমল এবং তার অন্যান্য পরিজন!

মিয়ানওয়ালিতে পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পরেই ৮ই জুন ভোরে ভগৎরামকে নিয়ে যাওয়া হলো জেলে হরিকিষণের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের জন্য। সেই দিনই দুপুরে তার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়জনদের অনুমতি দেওয়া হলো তাকে দেখে আসার জন্য। অবশ্য সাক্ষাৎকারের সময় জেল-সুপার সর্বক্ষণই উপস্থিত ছিলেন।

গুরুদাসমল ছেলের কাছে জানতে চাইলেন, তার শেষ ইচ্ছা কি? হরিকিষণ তার জবাবে বললো—'আমি এইটুকুই চাই, আমার মৃত্যুর জন্য কেউ যেন চোখের জল না ফেলে'। এর আগে লাহোর জেলে তার একমাত্র বোন গিয়েছিল তাকে দেখতে। কিন্তু প্রথমবার তার ভাইকে গরাদের ওপাশে একটা অন্ধকার কুঠরিতে দেখে সে ভেঙ্গে পড়েছিল। সে-ও অভিভূত হয়েছিল—তখন সে তার পিতাকে অনুরোধ জানিয়েছিল এমন কাউকে যেন তিনি সঙ্গে না আনেন, যার কোনো ভাবাবেগের শাসন নেই। তার চেয়ে তার মাতামহীকে অনেক ভালো লেগেছে। তিনি লোহার গরাদের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে

তার পিঠ চাপড়ে কত অন্তহীন উৎসাহের বাণী উচ্চারণ করতেন, তার শুনতে ভালো লাগতো।

এই শেষ সাক্ষাৎকারে হরিকিষণ তার পিতাকে বললো—শোকের কোনো উপলক্ষ্য এটা নয়, কারণ সে যা করেছে তার জন্য তার বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই! বরং এটুকু সে বেশ উপলব্ধি করতে পারছে যে তার মৃত্যুকেই ওরা স্মরণীয় করে রাখিবে। সে বললো—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ হলো পুরনো পথ ছেড়ে নতুন পথে চলা। আমি আবার জন্ম নেব, যা করে গেলাম তাই আবার করবো—এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চাকা ঘুরতে থাকবে—যে-পর্যন্ত না দেশ স্বাধীন হয়।'

হরিকিষণের বড় ভাই যমুনাদাস প্রশ্ন করলো—মৃত্যুর পর তার দেহ কি তার প্রিয় ঘাল্লাদেহরে নিয়ে যাওয়া হবে? গৃহের উদ্যানে কি তার স্মৃতিসৌধ গড়া হবে?

হরিকিষণ তার জবাবে বললো—'আমি জানি, আমার দেহ, আমার পরিবারের কারো হাতেই দেওয়া হবে না। ভগৎ সিং ও তার তুই সঙ্গীর দেহের যে ব্যবস্থা ওরা করেছে তাই করবে। যদি সরকার আত্মীয়দের হাতে দেহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন তবে আমার ইচ্ছে ভগৎ সিং ও তার তুই সঙ্গীর দেহ যেখানে আগে সমাহিত করা হয়েছিল তাঁদের পাশেই আমার দেহেরও সমাধি হোক্'।

সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হলো—জেল-সুপার জানালেন নির্দিষ্ট একঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তলোয়ার পরিবারের সবাই চলে এলেন—সবারই হৃদয় ভারাক্রান্ত—কিন্তু আদর্শের মহিমায় উদ্দীপ্ত, কারণ তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, হরিকিষণের সেই তরুণ ও সুন্দর মুখে যেন একটি প্রচ্ছন্ন জ্যোতি ফুটে উঠেছে।

যমুনাদাস ও অন্যেরা জেল-সুপারের কাছে জানতে চাইলেন, কখন তাদের হাতে ওর দেহ দেওয়া হবে। তিনি তাদের এড়িয়ে গেলেন—বললেন, এই বিষয়ে তিনি কোনো নির্দেশ পান নি, এমনকি হরিকিষণের ফাঁসি কখন হবে তা-ও তিনি জানেন না। তিনি নির্দেশ দিলেন—এবিষয়ে ডেপুটি কমিশনার রাধাকিষণের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

রাধাকিষণ ছিলেন একজন পরম রাজভক্ত। প্রথমে তিনি যমুনাদাসের সঙ্গে দেখা করতেও অসম্মত হলেন। কিন্তু যমুনাদাস যখন পীড়াপীড়ি করতে লাগলো—তখন তিনি জানালেন, তারা মৃতদেহ পাবেন কি না এ সম্পর্কে নির্দেশ পাবার জন্য সিমলায় পাঞ্জাব সরকারের হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। যমুনাদাস সঙ্গে সঙ্গে সিমলায় টেলিগ্রাম পাঠালেন, কিন্তু কোনো জবাব এলো না!

ইতিমধ্যে পুলিশ ও সি. আই. ডি বিভাগ থেকে মিয়ানওয়ালিতে এবং তার চারপাশে এই বলে একটা গুজব ছড়ানো হলো যে, হরিকিষণের ফাঁসি স্থগিত রাখা হয়েছে, তাকে ১৯৩১-এর ৯ই জুন ফাঁসি দেওয়া হবে না। এই গুজব শুনেই ভঞ্জুরাম গান্ধী ও আরও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা সরাইতে এসে লালা গুরুদাসমলকে বললেন—গুজবের উপর নির্ভর করবেন না, এর উদ্দেশ্য আপনি ও আপনার লোকেরা যাতে এই স্থান ছেড়ে চলে যান। তাতে ওরা ওকে স্বচ্ছন্দে ফাঁসি দিতে পারবে, কোনো আন্দোলনের ভয় থাকবে না।

গুরুদাসমল এবং তলোয়ার পরিবারের লোকজন এক রাত্রি সরাইতে কাটালেন। সে এক যন্ত্রণাময় রাত্রি!

ভোর চারটা বাজতেই তারা জেলের দিকে যাত্রা করলেন। অশ্বারোহী, সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে জেলের গেট পর্যন্ত মোতায়েন করা হয়েছে—তারা বাধা দিচ্ছে কেউ যেন জমায়েত হতে না পারে। দূর থেকে তারা দেখলেন জ্বালানি কাঠে ভর্তি জেলের একটা গাড়ী—গাড়ীটা গেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জেলের অন্যদিকে পরিত্যক্ত সমাধিভূমির দিকে। ভোর প্রায় ছয়টায় হঠাৎ তারা শুনতে পেলেন 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি—সেই ধ্বনি উঠলো তিনবার!

বোঝা গেল ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হরিকিষণকে; এই ধ্বনি তুলেছে জেলের অন্যান্য আসামী তাদের কারাকক্ষ থেকে।

কিছুক্ষণ পর জেলের প্রধান গেটটা আবার খুলে গেল। একটা স্ট্রেচারে করে হরিকিষণের দেহ নিয়ে এসে রাখলো গাড়ীতে—সঙ্গে

সঙ্গে গাড়ী যাত্রা করলো সমাধিভূমির উদ্দেশে। পুলিশের বিরাট বাহিনী গেল সঙ্গে সঙ্গে—তাই তলোয়ার পরিবারের লোক বা অন্য কেউ কাছে যেতে পারলেন না—শেষ দর্শনের জন্য বারংবার প্রার্থনা জানালেন তাঁরা। সব ব্যর্থ হলো।

প্রকৃতপক্ষে হরিকিষণের দেহ সমাহিত হয়েছিল মিয়ানওয়ালির বাইরে এক পরিত্যক্ত দূরবর্তী স্থানে। এই অঞ্চলে কাউকে কাছে যেতে দেওয়া হয় নি। বিখ্যাত উর্দু কবি তিলকচাঁদ মেহ্রুম সেই সময় মিয়ানওয়ালিতে ছিলেন। একটি কবিতায় তিনি তার বেদনা ব্যক্ত করেছেন—

মরুভূমির বুকে জ্বলে উঠেছে
আর একটি চিতার শিখা !
ছিল না কোনো সদয় হৃদয়ের বিচরণ
কেননা, পথ ছিল কর্দমাক্ত।
ছিল না কোনো আর্ত হাহাকার
বেদনার প্রকাশ বা দীর্ঘশ্বাস—
সমব্যথী কোন প্রিয়জন ছিল না পাশে !

হায় ! বালুকার বুকে এক রিক্ত চিতা
জ্বলে উঠেছিল সেই রক্তিম-প্রভাতে !
কেউ জানায় নি বিদায়-সম্ভাষণ
উৎসুক নয়নে কেউ তাকায় নি মৃতের মুখের দিকে !
শুনি নি শোকগীতি কারো
দেখিনি অশ্রুভরা দু' নয়ন,
কিন্তু বেদনার্ত বাতাসের স্পর্শ ছিল শীতল !

দেখ, কেমন জমাট বেঁধে আছে আগুনের শিখা ;
তৃপ্ত অগ্নি—কত দ্রুত এক
আশাভরা হৃদয়ের ঘটালো অবসান !
দেশপ্রেম নাকি এই পুরস্কার পেয়ে থাকে।

এই পুরস্কার হাতে তুলে নেবার জন্যই
আরো অনেকেই আসবে পেছনে পেছনে—
বাতাস ! তুমি তাদের ছড়িয়ে দিও না !
মাতৃভূমির মানের মহিমায়
চলে গেছে হরিকিষণ—
এই তার ভস্ম-অবশেষ !

যমুনাদাস ও অন্যেরা জেল-সুপারের কাছে এসে চাইলেন শহীদের দেহাবশেষ—যাতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু আগের মতোই তিনি ডেপুটি কমিশনারের দোহাই দিলেন। ডেপুটি কমিশনার প্রত্যাখ্যান করলেন এই প্রার্থনা।

পরদিন যমুনাদাস ও অন্যান্য পরিজন ও বন্ধুবান্ধব পথ দিয়ে সমাধিভূমির দিকে যাচ্ছিলেন, তারা দূর থেকে দেখলেন কয়েকজন পুলিশ হরিকিষণের ছাই-এর উপর জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারপরে সেই ছাই তারা কয়েকটি ব্যাগে পুরে একটা গাড়ীতে তুলে কঠোর পুলিশ পাহারায় নিয়ে গেল নদীর দিকে। সেখানেই নদীর মধ্যস্থলে একটির পর একটি ব্যাগ জলে বিসর্জিত হলো, যাতে শহীদের একটি হাড়ের টুকরোও কেউ কোনোক্রমে কুড়িয়ে নিতে না পারে।

দশ

পরের কথা

হরিকিষণের যেদিন ফাঁসি হলো সেই দিন সন্ধ্যায় গুরুদাসমল অন্যান্য পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘাল্লাদেহরে যাত্রা করলেন।

এদিকে হরিকিষণের ফাঁসির সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো—সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনীদের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত আলোড়ন জেগে উঠলো। সহস্র সহস্র লোক গ্রামের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো; ১২ই জুন দেখা গেল দলে দলে লালপোশাক পরা খুদাই খিদমৎগার নানাদিক থেকে এসে জমায়েত হলো, তারপর যাত্রা করলো ঘাল্লায় তাদের শহীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য।

সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে জারি হয়ে গেল ১৪৪ ধারা; সামরিক বাহিনী মেসিনগান ও রাইফেল নিয়ে চারদিক থেকে গ্রামটাকে ঘিরে ফেললো। এমনকি শহীদকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে আবদুল গফ্ফর খানও পথে বাধা পেলেন। তাঁকে জানানো হলো, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যে সমাবেশ প্রস্তাবিত হয়েছিল তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। যে জনতা শহীদের ফাঁসির কথা জেনে প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়ে আছে—নতুন কোনো ঘটনা ঘটিয়ে তিনি তাদের ক্রোধ বা উত্তেজনার কারণ হতে চাইলেন না। তাই তিনি নির্দেশ দিলেন—যে সভার অধিবেশন হবার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হোক্। কিন্তু জনতা তখন এত উত্তেজিত যে তারা গুরুদাসমলের কাছে গেল সভানুষ্ঠানের অনুমতির জন্য।

সংযত সৈনিকের মতোই গুরুদাসমল তাদের বললেন—আবদুল গফ্ফর খান তাদের নেতা, তার নির্দেশই তাদের মেনে চলা উচিত।

রক্তক্ষয়ী ধ্বংসলীলায় যা পরিণত হতে পারতো—এই ভাবেই তার পথ সেদিন রোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র হরিকিষণের ফাঁসি আর শোকসভা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থাতেই ব্রিটিশের প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি চরিতার্থ হলো না। এইবার তাদের ক্রোধ এসে পড়লো সমগ্রভাবে তলোয়ার পরিবারের উপর। শোনা যায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্নর এই বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। সীমান্ত-অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী গুরুদাসমল নির্যাতিত হলেন। হরিকিষণের ফাঁসির তিন সপ্তাহ পরে মর্দানে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার মেজর হে'র আদালতে হাজির হয়ে তাকে তিনটি অভিযোগের উত্তর দিতে হলো—প্রথমত তিনি পাঞ্জাবের গভর্নরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁর পুত্রের সঙ্গে। দ্বিতীয়ত তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন। তৃতীয়ত তাঁর বাড়ী সার্চ করে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু এবং আরও কয়েকজন নেতার ছবি পাওয়া গিয়েছিল।

তাঁকে বলা, হয়েছিল সীমান্ত অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী তাঁকে জামিন দিতে হবে। গুরুদাসমল আদালতে এক বিবৃতি দিলেন—তাতে প্রথম দুটি অভিযোগ তিনি অস্বীকার করলেন। জোর দিয়ে বললেন—জাতীয় নেতাদের ফটো ঘরে রাখবার ন্যায্য অধিকার তাঁর আছে। তিনি আরও বললেন—জামিন তিনি দেবেন না, কেন না তার অর্থ হবে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা।

প্রথম শুনানির পর আদালত গুরুদাসমলকে নির্দেশ দিলেন ১৯৩১-এর ৭ই জুলাই আবার তাঁকে হাজির হতে হবে। কিন্তু আদালত জামিন নিয়ে আর চাপ দিলেন না। নির্দিষ্ট তারিখে তিনি যমুনাদাসের বন্ধু সর্দার আত্তার সিং-এর বাড়ী থেকে আদালতে রওনা হলেন। সঙ্গে ছিল যমুনাদাস।

পথে তিনি হঠাৎ মৃগীরোগে আক্রান্ত হলেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ও মর্দানের বন্ধুরা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন তাঁকে বাঁচাতে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। সেই দিনই বিকেল চারটায় এই মহান্ দেশসেবকের মৃত্যু হলো—হরিকিষণের ফাঁসির ঠিক সাতাশ দিন পরে। 'Who's who of Indian Martyrs' নামক গ্রন্থে

যে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে তা যথাযোগ্যই হয়েছে সন্দেহ নেই।

তারপর থেকে তলোয়ার পরিবারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত মামলা এনে বয়স্কদের বিপর্যস্ত করার চেষ্টা চলতে লাগলো। আত্মরক্ষায় মামলার তদ্বির করতে গিয়ে তাদের জমিজমা বিক্রয় করতে হলো কিংবা বন্ধক দিতে হলো। শোকের দিনগুলিতে পুলিশবাহিনী এসে বার বার তাদের বাড়ী আক্রমণ করতে লাগলো -বন্ধু বা আত্মীয় যারা শোকপ্রকাশ করতে আসতেন তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পিতার মতো যমুনাদাসকেও সীমান্ত-অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হলো—তারপর আটক রাখা হলো মর্দানের জেলখানায়।

পরিবার থেকে প্রচুর টাকার জামিনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেইখানেই থাকতে হলো!

তৃতীয় ভ্রাতা ভগৎরাম তখন পেশোয়ার জেলে দেড় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছিল। পেশোয়ারের-জেল সুপার নির্দেশ পেলেন, কারাবাসের কাল শেষ হলেও যেন তাকে মুক্তি না দিয়ে মর্দান জেলে স্থানান্তরিত করা হয়, কেননা সীমান্ত-অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিভিন্ন ধারায় তার বিরুদ্ধে আরও মামলা চালানো হবে। ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল সমন পাঠিয়ে পেশোয়ারে ডেকে আনলেন যমুনাদাসকে; সমনের পেছনে ছিলেন বিখ্যাত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট খান বাহাদুর শেখ আবদুল আজিজ। প্রথমে তারা তাকে কৌশলে জয় করতে চাইলেন। তারা আশ্বাস দিলেন, রাজভক্তির নিদর্শন পেলে তার জন্য ভালো চাকুরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তা নাহলে তার ক্রমাগত বিদ্রোহাত্মক আচরণের জন্য তাকে মারাত্মক ফল ভোগ করতে হবে।

তারা যমুনাদাসের বিরুদ্ধে একটির পর একটি মামলা সাজালেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—অস্ত্র আইনের ১৯ নং ধারা অনুযায়ী ৪৫৫ বোরের রিভলবারের দু'টি কার্তুজ তার বাড়ী থেকে পুলিশ সার্চ

করে খুঁজে পেয়েছে। এই অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ এত দুর্বল ছিল যে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা মাত্র, ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ নাকচ করে তাকে মুক্তি দিলেন।

সরকার এত সহজে তাকে মুক্তি দিতে চায় নি। এবার যমুনাদাস ও চতুর্থ ভ্রাতা ঈশ্বরদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো—এই অভিযোগের ধারা—৩০২/১১৫ আই, পি, সি। অভিযোগে বলা হলো, উচ্চ পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যার হুমকি দেখিয়ে ওরা প্রকাশ্যভাবেই চিঠি লিখছেন।

এই দেশভক্ত পরিবারের উপরে প্রতিশোধের মত্ততায় মামলাগুলো অস্বাভাবিক দ্রুততায় কোনোরকমে শেষ করা হলো। ১৯৩২-এর ১৫ই ডিসেম্বর পেশোয়ারের সিটি ম্যাজিস্ট্রেট ৫০৬/৫০৭ ধারা মতে যমুনাদাসকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন—এর সঙ্গে ছিল ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড—অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড।

ঈশ্বরদাসের কপালেও জুটলো চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড আর ৫০০ টাকার অর্থদণ্ড—অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদণ্ড। মামলার ভিত্তি যত মিথ্যে, শাস্তি ততই কঠোর ও প্রতিশোধমূলক। যমুনাদাসের এই মামলা সম্পর্কে জওহরলাল নেহরু কয়েক মাস পর জেল থেকে লিখেছিলেন, "আমরা আশা করতে পারি, আমাদের বিচারকগণ উদার-হৃদয়। তাঁরা নিশ্চয়ই দীর্ঘতম দণ্ড দিয়ে থাকেন। আমার হাতের কাছেই পেশোয়ার থেকে অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের একটি সংবাদ রয়েছে—সংবাদের তারিখ ১৯৩২-এর ১৫ই ডিসেম্বর। কোলড্স্ট্রিম হত্যার অল্পকালের মধ্যেই পুলিশের ইন্স্পেক্টর জেনারেল ও সীমান্তের অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারদের ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখার জন্য আসামী যমুনাদাসকে পেশোয়ারের সিটি ম্যাজিস্ট্রেট ৫০০/৫০৭ ধারা অনুযায়ী আট বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। বোঝাই যাচ্ছে যমুনাদাস অত্যন্ত অল্প বয়স্ক তরুণ।"

পেশোয়ার জেলে কিছুকাল থাকার পর দুই ভাইকেই বন্ধনদশায় এবং হাতকড়া লাগানো অবস্থায় হাজারা জেলার হরিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হলো। এরই মধ্যে জুডিশিয়াল কমিশনের কোর্টে

তাদের 'পৈশাচিক' দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছিল। আদালতে আপীলের কাগজপত্র আসতেই দণ্ডাদেশ বাতিল করা হলো। তবু সরকার জেদ ছাড়লো না হরিপুর জেল থেকে মুক্তির পরই যমুনাদাসকে মর্দান জেলে নিয়ে যাওয়া হলো আর একটি মামলায় আরও নতুন চার্জের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য। এক্ষেত্রেও অভিযোগ ছিল 'অত্যন্ত বাজে'—এর ফলে মর্দান জেলে এক মাস থাকার পর যমুনাদাসকে মুক্তি দিতে হলো। কিন্তু জেলের গেটের কাছে আসতেই তার কাছে চীফ সেক্রেটারীর নির্দেশ এলো—নিজের গ্রাম ঘাল্লার মধ্যেই তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। তাছাড়া, গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে মর্দানের থানায় তাকে প্রতিদিন বিকেল চারটায় হাজিরা দিতে হবে।

এই ধরনের নোটিশ তার ছোট দুই ভাই ভগৎরাম এবং ঈশ্বরদাসের উপরেও জারি করা হয়েছিল। তারা তাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। তিনজন সি. আই. ডি'র লোককে স্থায়িভাবে ঘাল্লায় মোতায়েন করা হয়েছিল। তাদের কাজ ছিল —তিন ভাইয়ের গতিবিধি ও কর্মধারা লক্ষ্য করা এবং কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ রহস্যময় অন্তর্ধান

আমার শিক্ষানবিসির দিনগুলি

আমি ভগৎরাম তলোয়ার !

লালা গুরুদাসমলের আমি তৃতীয় পুত্র—হরিকিষণের ছোট ভাই ! ১৯০৮-এর নভেম্বরে আমার জন্ম ! জন্মস্থান ঘাল্লাদেহর !

পিতা জন্মেছিলেন সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে—সেই পরিবেশেই তিনি পালিতও হয়েছিলেন, তবু তিনি তখনকার নতুন বা বিকাশমুখী ভাবধারা আত্মসাৎ করার ব্যাপারে বেশ সতর্ক ছিলেন। প্রথম দিকে আর্যসমাজ আন্দোলন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, এই আন্দোলন ছিল বিকাশধর্মী। কিছুকাল পরেই তিনি দৃষ্টি ফেরালেন রাজনীতির দিকে; তারপর, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

বেশ আকর্ষণীয় এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি—পুত্রদের চরিত্র নির্মাণে তিনি এক বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্রবল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা এমনি ছিল যে পুত্রদের পক্ষে ন্যায়পথ থেকে সরে আসবার কোনো উপায় ছিল না। দেশের সৎ নাগরিক ও সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে তারা গড়ে উঠুক—এইদিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন : ফলে এক কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের থাকতে হয়েছিল।

মনে পড়ে, একবার আমি এক প্রতিবেশীর বাগানে কতকগুলো সুন্দর ফুল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সবার অগোচরে চুপি চুপি আমি বাগানে ঢুকলাম; তারপর কিছু ফুল তুলে ঘরে নিয়ে এলাম। ফুলগুলো দেখে পিতার সন্দেহ হলো—আমাকে প্রশ্ন করলেন, কোথায় আমি ফুলগুলো পেয়েছি। আমি যখন বললাম, প্রতিবেশীর বাগান

থেকে সেগুলো তুলে এনেছি, তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হলেন। আমাকে কঠোর তিরস্কার ক'রে তিনি বললেন—আমি দুটো অন্যায় করেছি। শুধু যে অন্যের জিনিস নিয়েছি তা নয়—একজন চাষীর সুন্দর বাগানটিও নষ্ট করেছি।

স্কুলে আমি আমার সতীর্থ ছাত্রদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম; শিক্ষকদের কাছেও তেমনি প্রিয় হয়েছিলাম, কেননা আমি কর্মঠ ছিলাম, সমাজসেবায় আমার উৎসাহ ছিল—তাছাড়া স্কুলের পাঠ্য-বহির্ভূত নানারকম কাজে আমার সংযোগ ছিল। অষ্টম শ্রেণীতে যখন পড়ি তখন অধিকাংশের ভোটে আমি 'আর্যকুমার সভার' সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলাম। বয়সে আমার ছোট বা বড়—সকলেই বিপুল সংখ্যায় আমার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। গ্রন্থাগার আর পাঠগৃহের ভারও আমার উপরেই দেওয়া হয়েছিল: এর ফলে আমি প্রাত্যহিক সংবাদ এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলাম।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন আফগানিস্তানের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত—সংবাদপত্রের শিরোনামায় তারই চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হতো। ক্ষমতায় আসবার জন্য তখন অমানুল্লা, বাচ্চা সাক্ক আর নাদির খানের মধ্যে চলছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এতে আমার আগ্রহ ছিল, কারণ ঐ দেশ আমাদের দেশের খুবই কাছাকাছি। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কেন্দ্রীয় কক্ষে ভগৎ সিং-বি. কে. দত্ত বোমার ঘটনাটি এই সময়ে সংবাদপত্রের শিরোনামায় প্রাধান্য পেয়েছিল। এই ঘটনায় দেশের বিপ্লবাত্মক কর্মধারার প্রতি গভীর আগ্রহ আমার চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করলো। এই জাতীয় কাজে আমি এক তীব্র প্রেরণা অনুভব করলাম।

তারপর বিভিন্ন স্কুলের কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে অনেকটা আমাদের নিজস্ব ধরনেই বিপ্লবের কাজ শুরু করে দিলাম। এই ধরনের কাজ সম্পর্কে তখন আমাদের মনোভাব ছিল, প্রথম সুযোগেই ইংরেজ রাজকর্মচারীদের 'প্রহার'—এমনকি সম্ভব হলে 'সংহার' পর্যন্ত করতে হবে।

একদিন আমি আমার অন্যতম বন্ধু অজিত সিংকে নিয়ে সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়লাম ; আমাদের উদ্দেশ্য, ফিরোজপুরের তখনকার ডেপুটি কমিশনার মিঃ হ্যারেনকে গভীর রাত্রিতে হত্যা করা। আমাদের অস্ত্র ছিল কেবলমাত্র ছোরা। যাবার আগে আমরা ডেপুটি কমিশনার যে বাংলোতে থাকতেন তার সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিয়েছিলাম। অজিত সিং-এর পিতা কিছুকাল ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করেছিলেন—তার কাছেই সব খবর পেয়েছিলাম।

তখন গ্রীষ্মকাল ; ডেপুটি কমিশনার বাইরেই খোলা আকাশের নীচে ঘুমুতেন। আমরা বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। উঠোনেই শয্যা পাতা—মশারি দিয়ে শয্যার চারপাশ ঘেরা।

কিন্তু আমরা নিরাশ হলাম। দেখলাম শয্যা শূন্য! পরে জেনেছিলাম, সে রাত্রিতে মিঃ হ্যারেন অন্যত্র ছিলেন!

সে সময়ে বিপ্লবের কাজ চালিয়ে নেবার জন্য ফিরোজপুর জেলায় কোনো সুসংগঠিত দল ছিল না। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে তখন কলকাতায় নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে বিপুল আয়োজন চলেছে। এই আয়োজনের প্রভাবেই আমাদের জেলায় রাজনৈতিক কর্মীদের কার্যকলাপ বিশেষভাবেই উদ্দীপিত হয়েছিল। ১৯২৮-এ লাহোরে পুলিশের নিষ্ঠুর লাঠি চালনার ফলে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু আমাদের উপরে গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তারপর ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গীদের সেই স্মরণীয় বিপ্লবীকর্ম! হত্যার দ্রুত প্রতিশোধ সঙ্কল্প! স্যাণ্ডার্স গুলিবিদ্ধ হলেন। এই ঘটনাও আমাদের তরুণ হৃদয়কে উদ্দীপিত করেছিল। আমরা রাজনৈতিক বিপ্লব-অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমরা জনসভায় হাজিরা দিতে লাগলাম—জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিলাম।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের পর আগামী অধিবেশনের জন্য উদ্যোগ চলতে লাগলো। এই অধিবেশন

হয়েছিল লাহোরে, ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে। এটিকে এক ঐতিহাসিক অধিবেশন বলা যেতে পারে। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন জহরলাল নেহেরু এবং রবি নদীর তীরে এই অধিবেশনেই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। অজিত সিং এবং আরও কয়েকজন কমরেড্-এর সঙ্গে লাহোরের এই অধিবেশনে আমি যোগ দিয়েছিলাম; সেখানে চমনলাল কাপুর এবং আরও যেসব স্বেচ্ছাসেবক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে এসেছিলেন তাদের সবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

১৯৩০-এর এপ্রিলে 'আইন-অমান্য আন্দোলন' শুরু হলো মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত পাঞ্জাব, বাঙলা ও উত্তর প্রদেশে বিপ্লবী দলগুলি সজাগ হয়ে উঠেছিল। আমরা কংগ্রেসের আয়োজিত সভাগুলিতে নিয়মিতভাবে যোগ দিতাম, প্যারেড্-এ যোগ দিতাম আর কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হলে তার জন্য 'হরতাল' সংগঠিত করতাম।

১৯৩০-এর মার্চে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে যখন গ্রামে ফিরে এলাম তখন তিনজন গুপ্তচর বিভাগের লোক আমার গতিবিধি লক্ষ্য করতো—কেননা, পুলিশের সন্দেহ হয়েছিল যে ফিরোজপুরের গুপ্ত বিপ্লবাত্মক কর্মধারার সঙ্গে আমার যোগ রয়েছে।

আমি ফিরে আসা মাত্র একদিন পরেই মর্দান থেকে পুলিশের লোক এসে আমাকে সাবধান করে দিয়ে গেল যেন আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ না দিই। আমি তাদের বললাম, যদি তাদের উপদেশের প্রয়োজন আমার হয় আমি নিশ্চয়ই তার জন্য তাদের কাছে অনুরোধ জানাবো—আপাততঃ আমার ইচ্ছেমত কাজ করাই আমার সঙ্কল্প। তারা চলে গেল, কিন্তু একজন লোক রেখে গেল আমার কাজের উপর নজর রাখতে। যাই হোক, আইন-অমান্য আন্দোলনে আমার কাজ আমি করে যেতে লাগলাম। একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৩০-এর মার্চ মাসের শেষের দিকে, খান আবদুল গফ্ফর খানের গ্রাম উটমনজাই-তে; আমি সেই সম্মেলনে গেলাম। ফিরে এসে আমি 'লাল কুর্তা আন্দোলনে' কাজ শুরু

করলাম—আইন-অমান্য আন্দোলনে প্যারেড সংগঠিত করা, সাধারণ জনসভার আয়োজন ও মিছিলের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি আমার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সব কাজের ফলে ১৯৩০-এর মে মাসে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলো—ফিরোজপুর থেকে ফিরে আসার দু'মাস পরে। দু'সপ্তাহকাল মর্দান জেলে আটক রাখার পর আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমি আমার রাজনৈতিক কর্মসূচীই গ্রহণ করলাম। নওশেরা তেহ্শিলের অন্তর্বর্তী 'জিয়ারত কাকা সাহেব'-এ এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। আমি সেখানে গেলাম। লাল কুর্তা আন্দোলনের নেতৃগণ ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্যই এই সম্মেলনে জমায়েত হয়েছিলেন। এর মধ্যেই খান আবদুল গফ্ফর খান ও অন্যান্য বিখ্যাত নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

১৯৩০-এর জুনে সম্মেলন থেকে ফিরে আসার পর আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হলো। এবার শাস্তি—দেড় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড—অবশ্য সংক্ষিপ্ত বিচার একটা হয়েছিল। দণ্ডাদেশের পরে মর্দান থেকে পেশোয়ার সেন্ট্রাল জেল-এ আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সেই সময়ে কারাগারের ভিতরের অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। বিভিন্ন শ্রেণীর বহু বন্দীকে একসঙ্গে একই ব্যারাকে রাখা হতো। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি এই বিসদৃশ আচরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়েছিলেন রাজনৈতিক বন্দীরাই; তারা প্রতিবাদের ধ্বনি তুলেছিলেন—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'! ফলে, শাস্তি হিসেবে অল্পবয়স্ক রাজনৈতিক বন্দীদের ভাগ্যে জুটলো বেত্রদণ্ড! একবার আমাকেও এই দণ্ডভোগের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল. তবে অল্প বয়সের জন্য শেষ মুহূর্তে আমাকে এই শাস্তি পেতে হয় নি।

তখনকার দিনে জেলখানাগুলো ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের নিয়ে ঠাসা। এমনকি আদালতের 'লক্-আপ'গুলো পর্যন্ত খালি করে এদের পুরে দেওয়া হতো।

একবার মাঝ রাতে আমাকে জাগিয়ে দেওয়া হলো। ১৯৩০-এর

২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সে রাত ! আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো জেল-সুপারের অফিসে। সেখানে ওরা আমাকে এক ঘণ্টা ধরে জেরা করলেন। তাদের প্রশ্ন ছিল আমার ভাই হরিকিষণ এবং আরও কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে কেন্দ্র করে। ২৩শে ডিসেম্বর যে পাঞ্জাবের গবর্নরকে গুলি করা হয়েছে এ সংবাদ আমি জানতাম না ; তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলাম। জেরার পরে আমাকে ফিরিয়ে আনা হলো কারাগারে। চোরাপথে আমাদের কাছে খবরের কাগজ আসতো—পরদিনই কাগজ পড়ে জানতে পারলাম, হরিকিষণ পাঞ্জাবের গবর্নরকে গুলি করেছে আর ঘটনাস্থলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম—গভীর রাতে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে পুলিশ এত জেরা করেছিল কেন। তারা হরিকিষণ, তার সহকর্মী বা আত্মীয়—যাদের এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা সম্ভব—তাদের সব কিছুই তারা জানতে চেয়েছিল।

কয়েকমাস পরেই হলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এই চুক্তির ফলে প্রায় সব রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হলো। কিন্তু আমি হরিকিষণের ছোট ভাই ; সেই অপরাধে জেলেই থেকে যেতে হলো। কিস্‌সা খোওয়ানি বাজারে একজন ইংরেজ রাজকর্মচারীকে হত্যার অভিযোগে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদেরও মুক্তি দেওয়া হলো না।

জেলে থাকার এই সময়কালেই কয়েকজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম—একজন হলেন শিনওয়ারি উপজাতির হাজি মহম্মদ আমিন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মাক্‌রি গুদামের উপর যে আক্রমণ চালিত হয়েছিল, ইনি তার নেতৃত্ব করেছিলেন—পেশোয়ারে ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধও তিনি পরিচালনা করেছিলেন। আর একজন বিপ্লবীকে দেখেছিলাম—সানোবর হুসেন, সীমান্ত প্রদেশ 'নওজোয়ান ভারত-সভা'র ইনিই ছিলেন সভাপতি। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পরে সানোবর হুসেনকে মুক্তি দেওয়া হলো। কিন্তু হাজি মহম্মদ আমিনকে পাঠানো হলো বিচারের জন্য। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে কোনো

মামলা দাঁড় করানো গেল না বলে তাঁকেও ওরা মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। মুক্তির পরে ইনি উপজাতি অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন—সেখান থেকে আফগানিস্তানে। ঐখানে তাঁর সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার বলে তিনি এক মহান্ ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলেন। পেশোয়ার-কাবুল পথে অবস্থিত জালালাবাদ থেকে কয়েক মাইল দূরে 'আদ্দা সরীফ', মুসলমানদের এক বিখ্যাত সমাধিক্ষেত্র—ইনি সেখানেই রইলেন।

তাছাড়া আমি আবদুল লতিফ আফান্দীর সংস্পর্শেও এসেছিলাম—ইনি ছিলেন মালাকান্দ্ রাজনৈতিক এজেন্সীর সঙ্গে যুক্ত। হিজরত্ আন্দোলনের সময় আফগানিস্তানে এবং সেখান থেকে তুরস্কে গিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলছিল তখন তিনি পুনর্বার দেশে ফিরে এসে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩১-এর ৯ই জুন মিয়ানওয়ালি জেলে হরিকিষণের ফাঁসি হবে—এই সংবাদ যখন আমি জানলাম—তখন ফাঁসির আগে আমার ভাইকে দেখার অনুমতি চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম। আমার আবেদনপত্র রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, রাজ্য সরকার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

পুলিশ-প্রহরায় আমাকে হাতকড়া পরিয়ে মিয়ানওয়ালি জেলে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা পেশোয়ার ছাড়লাম ১৯৩১-এর ৭ই জুন তারিখে। দৈবযোগে আমার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনও নওশেরা থেকে একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন। পরদিন মিয়ানওয়ালিতে পৌঁছলাম। রেলস্টেশন থেকে আমাকে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো জেলে। ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার পিতামাতা ও আত্মীয়গণও একই দিনে তাকে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলেন।

হরিকিষণকে প্রথম দেখামাত্রই আমি অবাক হয়ে গেলাম। স্বাস্থ্যের এক অক্ষুণ্ণ রূপ দেখলাম ওর দেহে! মুখে যে দীপ্তি দেখলাম তা সত্যিই বিস্ময়কর! এমন ভরা-স্বাস্থ্যের অধিকারীরূপে আমার জীবনে আর আমি ওকে দেখি নি! ও আমার চেয়ে মাত্র এগারো মাসের বড় হলেও আমরা ভাবতাম আমরা একই বয়সের। ও ছিল আমার কাছে একই

সঙ্গে ভাই, বন্ধু ও সখা! আমরা একই সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিলাম—সব সময় মনের কথা পরস্পরকে বলতাম। আমি জানতাম এবং নিশ্চয়ই সে-ও জানতো যে তাকে পরদিন ফাঁসি দেওয়া হবে। তাই আমি তাকে এত হৃষ্ট এমন কি প্রফুল্ল দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে গেলাম।

ও আমার স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইল। আমি তাকে বললাম, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে না। ওকে নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা ছিল—আমি ওকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তার প্রাণ বাঁচাবার সব রকম চেষ্টাই করা হচ্ছে! সে বললো—'না—না, ওদের তা করা উচিত হবে না। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি কবে ফাঁসির মালা আমার গলায় পরবো!'

আমি ওকে চিরদিন সাহসী দেশপ্রেমিক বলে জেনে এসেছি—দেশের জন্য ওর প্রেম যে কত গভীর তা-ও জানতাম! কিন্তু এখন এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে দেখলাম ওর আত্মশাসনের শক্তি এবং চরিত্র-বল, দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম! মানুষের সহনশক্তি যে কত বিরাট—যার প্রেরণায় একটি মহৎ কারণে সে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, এই সত্যটি যেন সেই মুহূর্তেই প্রথম উপলব্ধি করে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম! তার মতো দেশপ্রেম ও নিষ্ঠা নিশ্চয়ই মানুষকে সীমাহীন ত্যাগের পথে ঠেলে দিতে পারে!

পুনর্জন্মের দার্শনিক তত্ত্বে হরিকিষণের বিশ্বাস ছিল। তাই সে বললো—'ব্যাপারটা যত শাগ্‌গির সম্ভব শেষ করে দিতেই আমি চাই, যাতে আবার জন্ম নিয়ে আরব্ধ কাজ শেষ করতে পারি। এই ভেবেই আমি সুখী যে খুব শাগ্‌গিরই আমি আমার পূর্বগামী ভগৎ সিং আর তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো!'

তারপর বিদায় নিতে হলো। মনে হলো, ওর আদর্শবাদী রূপ যেন আমার মনে আরও বড় হয়ে উঠেছে!

ওরা আমাকে নিয়ে এলো মিয়ানওয়ালি জেলের এক নির্জন কক্ষে! এইখানে রাত কাটাতে হলো। ঘরটি ছোট আর অন্ধকার, তার উপর মশা আর ছারপোকার উপদ্রব! পায়খানাটা ঘরের মধ্যেই,

সুতরাং অসহ্য দুর্গন্ধ! জুন মাসের গরমে মিয়ানওয়ালি তার দুঃসহ তাপের জন্য বিখ্যাত। আমি কিছুই খেতে পারলাম না, ঘুমুতেও পারলাম না।

পরদিন খুব ভোরেই ধ্বনি উঠলো—'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', 'ভারত-মাতা জিন্দাবাদ, 'ভগৎ সিং জিন্দাবাদ!' এই ধ্বনি কিছুক্ষণ ধরেই আমি শুনলাম—তারপর হঠাৎ সব থেমে গেল। চারধারে এক অদ্ভুত নীরবতা! আমি বুঝতে পেরেছিলাম তখন কি ঘটেছিল! একটু পরেই সহসা এক চাপা গুঞ্জনধ্বনিতে সারা জেল যেন পূর্ণ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কেটে গেল এই ভাবেই। ভোর প্রায় দশটায় অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেলার আর একজন ওয়ার্ডার এলো আমার ঘরে—তারা দরজা খুলে একটা উঠোনের মত জায়গায় আমাকে নিয়ে এলো। মুখ-হাত ধোবার জন্য কিছু জলও পেলাম। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেলার সাহেব একটু সহানুভূতির সুরেই বললেন আমাকে—হরিকিষণ বীরের মৃত্যু বরণ করেছে!—এমন সাহস আর মুখে হাসি নিয়ে কোনো তরুণকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে এর আগে তিনি আর দেখেন নি। মৃত্যুর আগে সে বলেছিল—'ভারতমাতা জিন্দাবাদ'! 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ!' মিয়ান-ওয়ালি জেলে আসার পর তার তেরো পাউণ্ড ওজন বেড়ে গিয়েছিল!

সেইদিন সন্ধ্যায় ওরা আমাকে নিয়ে এলো মিয়ানওয়ালি রেল স্টেশনে; আবার পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে ফিরে যেতে হবে। আমার পিতামাতা, আত্মীযজনও একই ট্রেনে গ্রামে ফিবে গেলেন।

কয়েকদিন পরে আমি দেখলাম পেশোয়ারের 'নওজোয়ান ভারত-সভার' আরও অনেক কর্মীকে আনা হয়েছে জেলে। তাদের অপরাধ—তারা মিছিল করেছিল, সভা করেছিল, শহীদ হরিকিষণের ফাঁসির প্রতিবাদে ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এরই মধ্যে একদিন রামকিষণকেও সীমান্তে গ্রেপ্তার করে জেলে আনা হলো; তিনি ছিলেন কোনো এক সময়ে পাঞ্জাব প্রদেশিক নওজোয়ান ভারত-সভার সভাপতি। তাঁর লম্বা দাড়ি ছিল—গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি মোল্লার ছদ্মবেশে ছিলেন—নাম ছিল গুলাম মুর্তজা! তিনি আসবার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। যাতে ওরা

যথার্থ পরিচয় না জানতে পারে এইজন্য তিনি দাঁড়ি কামাবেন—আমাকে এই ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে বললেন। আমার কাছে তিনি সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত করলেন—তাঁর অতীত কর্মধারার কথাও বললেন। লাহোরে সংবাদ পাঠিয়ে যোগাযোগ রাখতে চান—এই ব্যাপারেও আমাকে অনুরোধ জানালেন। আমি সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমার কারাবাসের শেষ তিনটি মাস আমরা একসঙ্গেই জেলে ছিলাম। আমরা সব সময়েই রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নীতি ও জাতীয় সংগ্রামের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করতাম। এই সব আলোচনার ফলেই রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানতে পেরেছি—আমার চিন্তাধারাও এর পর একটা আদর্শগত পরিণতি লাভ করেছে। রাজনৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে তাঁকে আমি আজও গুরু হিসেবেই জানি।

১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরে আমার দণ্ডকাল শেষ হয়ে গেলো। পুলিশ-প্রহরায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মর্দান জেলে; সেখানে 'সীমান্ত-অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ' আইন অনুযায়ী আমাকে আটক করে রাখা হলো। কয়েকদিন পরে জেলেই আমাকে এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হলো। তিনি বললেন, 'সীমান্ত-অপরাধ-নিয়ন্ত্রণ' আইন অনুযায়ী পাঁচ হাজার টাকার জামিন দিতে হবে; অবশ্য পাঁচটি সমান মূল্যের জামিন হলেই চলবে। জামিন যদি না দিই তবে আরও তিন বছরের জন্য কারাবাস করতে হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই আমার বড় ভাই যমুনাদাস এবং আমার ছোট ভাই ঈশ্বরদাসকে একই নিয়ন্ত্রণ আইনে গ্রেপ্তার করেছিল—তাদের লক্ষ্য ছিল ভয় দেখিয়ে আমাদের পরিবারকে ধ্বংস করা। আমার আত্মীয়জনের মধ্যেও অনেককেই গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়েছিল—এরা হলেন চরণদাস কাপুর, বংশীরাম কাপুর, রাধাকিষণ গোকুলচাঁদ এবং আরো অনেকে। পুলিশের ভীতি-প্রদর্শন সত্ত্বেও কোনোরকমে জামিনের ব্যবস্থা করা হলো। আমাকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া সরকারের আর কোনো পথ খোলা রইলো না।

এদিকে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ব্যর্থ হলো।

গান্ধীজি ভারতে ফিরে আসার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো। ব্যাপকহারে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল। সে এক অভূতপূর্ব্ব ভীতি-প্রদর্শন ও পুলিশী দলননীতি!—মিলিটারি এলো তারই পেছনে। ১৭-বি ধারা অনুযায়ী আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হলো ১৯৩২-এর জুন মাসে। আমাকে আনা হলো মর্দান জেলে—সেখানে প্রায় পাঁচ মাস বিচারাধীন আসামী হয়ে রইলাম। শেষে বিচারে আমার শাস্তি হলো—এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড! আমাকে ওরা নিয়ে গেল হরিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আমার ভাইরা লালা যমুনাদাস ও ঈশ্বরদাস সেই জেলেই তাদের দণ্ডভোগ করছিল। তিন মাস আমিও দণ্ডভোগ করলাম। ১৯৩৩-এর গোড়ার দিকেই একটা আপীলের ফলে আমাকে মুক্তি দেওয়া হলো। আমার কারাবাস যখন চলছিল তখন আমি হরিপুর সেণ্ট্রাল জেলের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে আলাপ করে একটি দাবী তুলেছিলাম যে, বন্দীদের পাদুকা দিতে হবে। এই আন্দোলনে বেশ সাড়া পাওয়া গেল এবং জেলের প্রায় সব বন্দীই এই দাবী সমর্থন করলেন। জেলের অন্যান্য বন্দীদের স্বপক্ষে আনার জন্য জেল-সুপার এর আগে তাদের কাজের চাপ. কিছু লাঘব করেছিলেন। জেল-সুপারের এই নীতির ফলে রাজনৈতিক বন্দীদের বিভিন্ন স্তরে অনৈক্য দেখা দিয়েছিল। এই নূতন সংগ্রাম এবং জুতাপরার দাবী সমস্ত বিভেদ দূর করে সকলকেই ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত করলো।

যাই হোক, ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী মাসে আমি মুক্তি পেলাম। মুক্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে জানিয়ে দেওয়া হলো, আমাকে গ্রামের সীমানার মধ্যেই থাকতে হবে আর মর্দান পুলিশ স্টেশনে রোজ বিকেলে ৪টায় রোদ-বৃষ্টি তুচ্ছ করে আমাকে হাজিরা দিতে হবে—এই পুলিশ স্টেশন আমাদের গ্রাম থেকে ছয় মাইল দূরে।

এইভাবে আমি অন্তরীণ হয়ে রইলাম প্রায় ১৯৩৬-এর সমাপ্তি পর্যন্ত।

দুই

প্রজা-আন্দোলন ঃ প্রতিক্রিয়া

ঘাল্লা দেহর-এ চাষীরা ছিল তোরুর নবাবের প্রজা। কিছু গ্রামের এজেন্টদের সাহায্যে কিছু বা ব্রিটিশের সাহায্যে এই নবাব গ্রামের প্রায় সমস্ত জমির মালিকানা নিজের নামে করিয়ে নিয়েছিলেন। এজেন্টদের সহায়তায় তিনি চাষীদের কাছ থেকে বিপুল কর আদায় করতেন—তাছাড়া সবরকম বে-আইনি আদায় তো ছিলই। ব্রিটিশের আইন এবং পৃষ্ঠপোষকতা তার স্বপক্ষে ছিল বলেই ব্যাপারটা দরিদ্র চাষীদের উপর একটা জঘন্য শোষণের রূপ নিয়েছিল। সংক্ষেপে এই সময়ে প্রচলিত কয়েকটি আচার ও রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

১. যখন চাষীদের পরিবারে কোনো বিয়ে হতো তখনই দুই পক্ষ থেকেই নবাবের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাঠাতে হতো।

২. চাষীদের জমিতে বড় বড় গাছ নবাবের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হতো।

৩. নবাবের হুকুমে নবাবের জন্যই প্রত্যেক পরিবারকেই মাসে তিন-চারদিন করে বেগার খাটতে হতো; এ খাটুনির জন্য কোনো মজুরি জুটতো না।

৪. চাষীদের মধ্যে কোনো বিরোধ বা কলহ বাধলে নবাব বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা করতেন, এইভাবে তাঁর রাজস্ব বাড়তো!

৫. চাষীদের সঙ্গে নবাব ব্যবহার করতেন দাসের মতো—তার সুরে সুরেই তাদের নাচতে হতো—তিনি পরিদর্শনে এলে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হতো। গ্রামে যখন আসতেন তখন তাঁর বিলাসিতার বোঝা তাদেরই বইতে হতো। তাঁর অনুচরদের হাতে নানারকম অপমান ও অত্যাচার তাদের অদৃষ্টে জুটতো। তারা নবাবের কোনো

অসন্তোষের কারণ ঘটালে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো বিপুল অর্থদণ্ড দিয়ে। পরে নবাব গ্রামের সমস্ত জমি তার চার পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তারপর নিজের নিজের ভাগ বুঝে নিয়ে চাষীদের উপর বহিষ্কারের নোটিশ জারি শুরু করে দিত। তার কারণ—

ক. নবাবের জুলুমের ফলে চাষীদের মধ্যে যেমন অসন্তোষ জাগছিল তেমনি এক রাজনৈতিক চেতনারও উন্মেষ হচ্ছিল। চাষীরা সম্প্রতি লাল কুর্তা আন্দোলনে সহানুভূতি দেখিয়েছিল—এমন কি অংশগ্রহণও করেছিল; তারা বুঝেছিল এ আন্দোলন দেশের স্বাধীনতার জন্য। এইসব নতুন ভাবধারা নবাব সহ্য করতে পারতেন না; তাঁর ভয় ছিল চাষীরা হয়তো তাঁকে তুচ্ছ করে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের জমির দখল নিয়ে নিতে পারে। এমন ঘটনারও অভাব ছিল না যেখানে চাষীসম্প্রদায় নবাবের ইচ্ছার বিরোধিতা করেছে!

খ. নতুন বড় বড় জোতদারদের কাছে আরও অধিক রাজস্বের লোভে নবাব জমি বিলি করতে চাইতেন।

গ. অধিক লাভের লোভে জমিতে ওরা ফলের বাগান করতে শুরু করেছিলেন, ফল দাঁড়ালো একই—চাষীরা তাদের জমি হারালেন।

এই সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের সুর ক্রমশ জেগে উঠছিল তাই শেষে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের রূপ নিয়ে দেখা দিল।

চাষী গুলজাদা-র একটি ষাঁড় একদিন অনধিকার প্রবেশ করলো এক প্রতিবেশী চাষীর জমিতে। প্রতিবেশী ব্যাপারটা জানালো নবাবপুত্র আজিম খাঁকে। সে সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ টাকার অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করলো—কিন্তু চাষীর সে অর্থ দেবার ক্ষমতা ছিল না। জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য আজিম খাঁ—তার ষাঁড়টি নিয়ে গিয়ে বেচে দিল। ষাঁড়টি ছিল গুলজাদা-র একমাত্র সম্পত্তি—সে এই ঘটনায় রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

গুলজাদা তার অভিযোগ নিয়ে এলো আমার কাছে। আমি

ভেবে দেখলাম এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করেই এই চাষীদের মধ্যে একটি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার—আন্দোলনের লক্ষ্য হবে নবাবের জুলুমের অবসান ঘটানো। আমি তাকে নির্দেশ দিলাম, আজিম খাঁ যে নতুন ফলের বাগান করেছে তা উপড়ে ফেলে দাও।

একদিন মধ্যরাত্রিতে গুলজাদা নতুন লাগানো চারা গাছগুলি জলে ভাসিয়ে দিল। এই ঘটনায় সপুত্রক নবাব একটি বিরাট ধাক্কা খেলেন—প্রজাদের কাছ থেকে এমন ব্যবহার তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি কিন্তু ব্যাপারটি পুলিশের হাতে তুলে না দিয়ে তারা নিজেদের হাতেই আইনের অধিকার গ্রহণ করলো। ক্ষতিপূরণ বাবদ সমস্ত গ্রামবাসীর উপরেই জরিমানা ধার্য করা হলো। তারা জানতো, এটি গুলজাদারই কীর্তি, ক্ষতিপূরণ করার জন্য তার অন্য সম্পত্তি কিছু ছিল না। স্বভাবতই সারা গ্রামে একটি বিক্ষোভের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠলো।

এই সমষ্টিগত জরিমানায় আমারও দেয় অংশ ছিল বই কি! যখন দিতে বলা হলো তখন আমি নবাবনন্দনকে বলে পাঠালাম যে, এই জাতীয় জরিমানা ধার্য করবার তার কোনো অধিকারই নেই—একথাও জানিয়ে দিলাম, তার ক্ষমতা থাকলে সে আদায় করুক। নবাব ও তার পুত্রদের বিরুদ্ধে চাষীদের আন্দোলন এখান থেকে শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলন আরও ব্যাপক হয়ে পরিণত হলো ঐ অঞ্চলের ভূমিসংস্কার আন্দোলনে। পাশাপাশি গ্রামগুলিতেও চাষীদের এমনি দুর্দশাতেই দিন কাটছিল, তাদের উপরেও এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এই চাষীদের আমি একটা দৃঢ় সংহতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করে তুললাম—ভূমিসংস্কারের পক্ষে এবং নবাবের জুলুমের বিরুদ্ধে। সভা ও মিছিলের মধ্য দিয়ে তারা একত্র হলো—সরকার ও জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবী পৌঁছে দিতে লাগলো। আন্দোলনের ঢেউ সন্নিহিত গ্রামগুলোকেও স্পর্শ করলো। আন্দোলনকে অহিংস রাখার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল—কিন্তু নবাব, তার পুত্রগণ ও তার অনুচরদের উৎপীড়নে চাষীরা এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে আন্দোলনের রূপান্তর ঘটতে দেরি হলো না।

কয়েকজন পথভ্রষ্ট এবং অত্যুৎসাহী যুবক মিলে একদিন নবাবের এক দালালকে হত্যা করে বসলো—দালালটি ছিল অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, নাম দালেল খাঁ। এই ঘটনায় সরকার ও নবাবপক্ষ যোগ্য হাতিয়ার পেলো—সর্বত্র শুরু হলো আন্দোলন দমনের বিভীষিকা! বহু চাষী চলে গেল কারার অন্তরালে—কিন্তু তারা দমলো না, কোনো রকমে জমির মালিকানা বজায় রেখে চললো।

এই আন্দোলনের সুফল দাঁড়ালো এই যে বেগার খাটাবার প্রথা, সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত জরিমানা আদায় এবং এমনি আরও সব সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাস একেবারে চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এই সংগ্রামে চাষীদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল কিন্তু লাভও হয়েছিল পর্যাপ্ত! এর ফলে তারা পেয়েছিল ঐক্য ও আত্মশক্তিতে অখণ্ড বিশ্বাস। আমি তখন গ্রামে অন্তরীণ হয়েছিলাম, আমার উপর পুলিশ ও সি. আই. ডি কর্মচারীদের তীক্ষ্ণ নজর ছিল—তা সত্ত্বেও আমি যে এই আন্দোলনকে এক সফল পরিণতিতে পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম—তাতে আমি তৃপ্তি পেয়েছিলাম, গভীর গৌরববোধও জেগেছিল আমার মনে। আমার বিরুদ্ধেও নবাবের শত্রুভাব যে যোগ্য উত্তর দিতে পেরেছিলাম তার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত প্রতিশোধবৃত্তির চরিতার্থতার বোধও যে ছিল তা আমি অনুভব করেছিলাম। এই সব উৎপীড়নের সূত্র ধরেই এই নবাবেরাই যে একদা আমার পিতামহকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করিয়েছিল, সে কথা নিশ্চয়ই আমি ভুলতে পারি নি! —আমার পিতাকেও এই নবাবদের অত্যাচারে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল।

পেশোয়ার ও মর্দান জেলায় বহু চাষীরাই নবাব এবং এই সামন্ততান্ত্রিক খাঁ-দের দখল-করা জমি চাষ করতো—এরা থাকতো মহমন্দ্ ও সফি উপজাতীয় অঞ্চলে। আমি যে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলাম তার মধ্যে এরাও যেন নিজেদের মুক্তির সন্ধান পেলো। উৎপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সমজাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য আমার কাছেই নির্দেশ চেয়ে পাঠালো। এতে আমি উপজাতীয় অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও সেই সম্পর্ক সুসংগঠিত করে

তোলার এক সুযোগ পেলাম। আমার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মধারায় এই অভিজ্ঞতা আমাকে খুবই সাহায্য করেছিল।

১৯৩৭-এ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। আমার বড় ভাই লালা যমুনাদাস কংগ্রেসের টিকিট নিয়ে মর্দান ও পেশোয়ার কেন্দ্র থেকে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কঠিন প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়েছিলেন। সেই সময় আমাদের পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল—তাছাড়া আমাদের সংস্থা থেকেও কোনোরকম সাহায্য করা সম্ভব হয় নি।

যাই হোক, ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন কংগ্রেস সরকার। খান আবদুল গফ্‌ফর খাঁ-র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর খান সাহেব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। যে চাষী-সম্প্রদায় ব্রিটিশের সুরক্ষিত সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় অকথ্য দুঃখ ভোগ করেছিল—কংগ্রেস সরকার ও খান-ভ্রাতাদের ক্ষমতায় আসীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আশা হলো ঊর্ধ্বগামী। সাধারণভাবে শান্তির আশ্বাস তারা পেয়েছিল—বিশেষভাবে ভূমিসংস্কারের সুযোগও তারা উপেক্ষা করতে চাইল না; এই ভূমিসংস্কার বহুকাল আগেই ছিল তাদের প্রাপ্য।

ওদিকে সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাবাহী নবাব ও খাঁ-এর দল ব্রিটিশের পরামর্শে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হলো। তারাও গোপনে কংগ্রেস সংগঠনে এবং সরকারে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলো—তাদের আশা, সেখানে তারা প্রভাব বিস্তার করবে। কাজটা কঠিন ছিল না; কেননা, এই প্রদেশে সরকার পক্ষের ও কংগ্রেস সংগঠনের বহুনেতা নিজেরাই সামন্তশ্রেণী বা বড় বড় ভূস্বামীদের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত কারণেই কংগ্রেস সরকার কোনো আমূল ভূমিসংস্কারের পথে গেলেন না। এর ফলে চাষী-সম্প্রদায়ের কিছুটা মোহভঙ্গ হলো—তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হলো তাদের মধ্যে। ধৈর্যহারা হয়ে তারা সংস্কারের জন্যই সংগ্রাম করতে হবে—এই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হতে লাগলো। ঘাল্লা দেহর অঞ্চলের চাষী-সম্প্রদায় এর আগে এই ধরনের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে—স্বাভাবিক নিয়মে তারাই হলো এই নূতন

অভ্যুত্থানের নেতা।

সরকারের কাছে, জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে, এমন কি নবাবদের কাছেও আমাদের দাবী পাঠিয়ে আমরা ১৯৩৮-এ আন্দোলন শুরু করলাম। সকলের কাছেই আঞ্চলিক চাষীদের প্রতিনিধিত্বমূলক দল পাঠালাম—কোনো সাড়া এল না। ওদিকে নবাব ও তার পুত্রেরা আবার জমি থেকে উৎখাতের নির্দেশগুলো পাঠাতে শুরু করলো। ১৯৩৩-৩৪-এ ওরা যেমন করতো তেমনি ভাবেই ঐ নোটিশ-গুলো যাতে কাজে পরিণত হয় তার জন্য জেদ করতে লাগলো। বংশানুক্রমে যে জমি ওরা চাষ করে এসেছে তা হারালে ওদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। এটা ওদের কাছে ছিল জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। তাই ওরা 'আমাদের নিজেদের সরকারের কাছে' আবেদনের পর আবেদন পাঠাতে লাগলো। এই আবেদন ছিল—সরকার যাতে এই জঘন্য খেলায় নবাবদের সাহায্য না করেন। কিন্তু বধিরের কর্ণে এই কান্না ব্যর্থ হলো। জেলার শাসন-কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ জমি থেকে চাষীদের উৎখাত করবার কাজে সর্বতোভাবে নবাবদের সাহায্য করলেন। কিন্তু চাষীরা স্বভাবতই এমন অবস্থা চলতে দিতে পারলো না।

জমি থেকে বা ঘর থেকে এইভাবে উৎখাত করার বিরুদ্ধে আমরা প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললাম। যখন নবাবের লোক বা পুলিশ কোনো একটি জমি দখল করতে চেষ্টা করতো তখনই সমস্ত গ্রামের চাষীরা এমন কি প্রতিবেশী গ্রামগুলির চাষীরা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রবলভাবে বাধা দিত—যাতে তারা তাদের ষড়যন্ত্র সফল করে তুলতে না পারে। নবাবের লোক ও পুলিশ বাহিনীকে তাদের উদ্দেশ্য অপূর্ণ রেখেই ফিরে যেতে হতো। এমন কি যেসব ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ জমির দখল ওরা নিতে পারতো—সেখানেও অল্পসময়ের মধ্যেই সে জমি পুনরুদ্ধার করা হতো।

নবাবেরা ছিল জেদী—ওদের সহায় ছিল জেলার শাসন-কর্তৃপক্ষ। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশ চাষীদের উপরে লাঠিচালনা করেছিল—সংগ্রামীদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে জমির দখল নবাবকে দিয়ে দেওয়াই

ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এই লাঠিচালনার হাত থেকে শিশু বা স্ত্রীলোকেরও রেহাই ছিল না।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য প্রগতিশীল সংস্থার নেতৃবর্গও আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পুলিশ নেতাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করলো। গ্রেপ্তারের প্রথম দলে তারা দাগ-ইসমাইল খেল-এর মিয়াঁ মুকরামশা'র মতো কয়েকজন নেতাকে আটক করেছিল। আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্য আমি কোনোরকমে গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেলাম। দ্বিতীয় দলে গ্রেপ্তার হলেন মৌলানা আবদুল রহিম পোপালজাই, অচরাজ রাম ঘুমণ্ডী, সাধু সিং, রামশরণ নাগিনা এবং আরো অনেকে। কিছুকাল পরে মর্দানের প্রধান বাজারগুলির মধ্য দিয়ে একটা বিরাট মিছিল পরিচালনার সময় আমাকেও গ্রেপ্তার করা হলো। এইসব গ্রেপ্তার সত্ত্বেও আন্দোলনের গতিবেগ বেড়ে গেল—ক্রমে অন্যান্য গ্রামেও তা ছড়িয়ে পড়লো। শাসন-কর্তৃপক্ষ আতঙ্কিত হলেন—মরিয়া হয়ে উঠলেন। ব্যাপকহারে জনতার গ্রেপ্তার শুরু হলো। তারপর গ্রামের প্রায় সমস্ত বয়স্ক পুরুষেরাই গ্রেপ্তারের কবলে পড়লেন। আমার ছোট ভাই অনন্তও বাদ গেল না। তেরো থেকে উনিশ বৎসর বয়েসের ছেলেদের মধ্যেও অনেকে বন্দী হলো—জমির দখলে পুলিশকে বাধা দেবার জন্য রইলো শুধু শিশু ও স্ত্রীলোক।

এদিকে আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার দেখে ডক্টর খান সাহেব ও তাঁর সরকার চঞ্চল হয়ে উঠলেন—কেন না, ১৯৩৮-এর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে এই আন্দোলনের বিষয়টি উত্থাপিত হলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব, মুন্সী আহ্‌মদ দীন ও অন্যান্য নেতৃবর্গ; এঁদের কাজ হলো তদন্ত করে এই আন্দোলনের সমস্ত বিবরণ পেশ করা।

চাষী-সম্প্রদায় অনেক দুঃখ বরণ করেছিল—কিন্তু তাদের জমি থেকে উৎখাত করার জন্য নবাবের সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়। একমাত্র একটি গ্রাম, আমাদের ঘাল্লা দেহর থেকেই তিনশোর বেশী

বয়স্ক পুরুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

জাতীয় মঞ্চেও এই আন্দোলনের গভীর প্রভাব পড়েছিল—এর ফলে পরপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো—তাতে এরা এই ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন যে, সমগ্র দেশেরই ভূমিব্যবস্থার সংস্কার আশু প্রয়োজন। জনমতের চাপে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের মুক্তি দেওয়া হলো।

এই বিবরণ থেকে একথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লালকুর্তা আন্দোলনে এবং কংগ্রেস সংস্থায় আমি আমার রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করেছিলাম। ১৯৩৭ থেকে মর্দানের হল্‌কা কংগ্রেস কমিটির আমিই ছিলাম সভাপতি। আমি তেহ্‌শিল এবং জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলোর কার্যকরী সমিতিরও সভ্য ছিলাম।

১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্র বসু যখন কংগ্রেস সভাপতিপদের নির্বাচনে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ডক্টর পট্টভি সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন আমি তখন প্রবলভাবে সমর্থন জানিয়েছিলাম সুভাষচন্দ্রকে। গান্ধীজির সঙ্গে মতভেদের ফলে যখন সুভাষবাবু কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করলেন তখন এই সংস্থা-গঠনে আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম এবং এই সংস্থার প্রাদেশিক প্রচার-সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। এই সময়ে সুভাষ বসু দেশের সর্বত্র ব্যাপক সফর করছিলেন। ১৯৩৯-এ এই সফর উপলক্ষ্যে তিনি এলেন পেশোয়ারে। পেশোয়ার নগরের অধিবাসীরা এবং সমস্ত শ্রেণীর লোকেরাই তাঁকে জানিয়েছিলেন আন্তরিক অভিনন্দন।

যখন তাঁকে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নগরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ডক্টর খান সাহেবের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ তিনি জানতে পারলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শোভাযাত্রা থামিয়ে পেশোয়ারে খান সাহেবের গৃহে উপস্থিত হলেন—তাঁর শোকে তাঁর সমবেদনা জানাতে।

সন্ধ্যায় পেশোয়ারে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হলো। সেই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু ব্যাখ্যা করে বললেন তিনি কেন কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন।

তিন

অন্তর্ধানের আয়োজন

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন শক্তিগুলি জোট পাকাচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে একটা আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের কালোছায়া জাতিগুলিকে গ্রাস করছিল। ভারতেও বিপ্লবীদল চিন্তা শুরু করেছিল কিভাবে এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজতন্ত্রের বিরোধী শক্তিগুলির সাহায্য দেশের স্বার্থে কাজে লাগানো যায়। এই প্রসঙ্গেই আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সীমান্ত অতিক্রম করে যাবার জন্য বিভিন্ন পথের অনুসন্ধান করা—আর উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এই সব পথ ধরে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। এই পথেই আমরা দেশের মুক্তিসাধনে সাহায্য করতে পারবো—এই বিশ্বাসও আমাদের ছিল।

১৯৩৯-এর মধ্যে আমি কম্যুনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় সদস্য হয়েছিলাম—সেই সময়ে এর নাম ছিল কীর্তি পার্টি। পার্টি আমার উপর একটি বিশেষ দায়িত্বভার ন্যস্ত করেছিল। যেসব দেশপ্রেমিক বিপ্লবী বিদেশের নির্বাসিত জীবন থেকে দেশে ফিরে আসতে ইচ্ছুক তাঁদের সাহায্য করা। আর সেই সঙ্গে আমাদের বিপ্লবীদের সীমান্ত পার হয়ে অন্য দেশে যেতে সাহায্য করাও আমার কাজ ছিল। কর্তব্য পালন করতে গিয়েই বিভিন্ন অব্যবহৃত পথ খুঁজে বার করতে হয়েছিল—যাতে এই পথে ঐ সব কর্মীকে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারি, আর বাইরে থেকে নতুন যোগাযোগও সহজে করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৯-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে চিত্রল হয়ে মাসতুজ পর্যন্ত একবার ঘুরেও এসেছিলাম। আমি যখন চিত্রলে ছিলাম তখনই শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

এই নতুন পরিস্থিতিতে আমাদের নীতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির

করার জন্য সীমান্ত প্রদেশে ও পাঞ্জাবে আমাদের কয়েকটি বৈঠক হয়ে গেল।

আমার গুরু রামকিষণ এবং সেই সময়কার লাহোরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—ধন্বন্তরী, এঁদের সঙ্গেও আমি দেখা করলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত হলো—পুরাতন ধারায় প্রাত্যহিক রাজনৈতিক কর্ম থেকে আমাকে সরে আসতে হবে—আমার কাজ সীমাবদ্ধ থাকবে আমারই বিশেষ ক্ষেত্রে, সেই কাজ বিপ্লবীদের সীমান্ত অতিক্রমণে সাহায্য করা।

সীমান্ত অঞ্চলের যোগাযোগগুলি যাতে নিরাপদ থাকে সেই উদ্দেশ্যে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং ব্রিটিশের হাত থেকে দেশের মুক্তিসাধনে বিপ্লবী প্রচেষ্টার তাৎপর্য সম্পর্কে উপজাতীয় লোকদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল।

এই কাজের জন্য নির্বাচিত হলেন গুরচরণ সিং। তিথত্ বাঈ, পেশোয়ার, বদ্‌রসি, মর্দান এবং আরও অনেক জায়গায় তাঁকে রাখা হলো। এই সব জায়গায় থেকে তিনি যোগাযোগ বুঝে 'শিক্ষা ও পাঠ' দিয়ে যেতে লাগলেন।

১৯৪০-এ আমি বিয়ে করলাম—যদিও আমার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মধারার পক্ষে বিবাহিত জীবন খুব অনুকূল ছিল না। তবু আমাদের পরিবারে ও আত্মীয়-সমাজে যে প্রথা প্রচলিত ছিল তার কথা ভেবেই আমাকে বিয়ের ব্যাপারে সম্মত হতে হয়েছিল।

এই বছরেই ফেব্রুয়ারীতে ঘাল্লায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন রামকিষণ আর সোধি হরমিন্দর সিং। ইয়োরোপে তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমাদের যোগাযোগ ছিল—তারা সশস্ত্র বাহিনীতে থেকেই কাজ করে যাচ্ছিল। সেনাবাহিনীতে আমাদের লোক যারা ছিল তাদের কেউ কেউ বিদেশে যেতে অসম্মত হলো—কেউ বা কাজ ছেড়ে দিল। এদের ভরণপোষণ কিংবা কিভাবে রাজনৈতিক কাজে তাদের নিযুক্ত করা যায় তা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। উপজাতীয় অঞ্চলে এদের পাঠিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী অন্তর্ঘাতকর্মে এদের শিক্ষিত করে তোলার

সম্ভাবনা কতটুকু তা সন্ধান করে দেখারও প্রস্তাব এল। এই প্রস্তাবটি কাজে পরিণত করা কতদূর সম্ভব তা আলোচনার জন্য আমাকে বলা হলো উপজাতীয় অঞ্চলে যেতে এবং সেখানে আমাদের যেসব কমরেড আছেন তাদের সঙ্গেই আলোচনা করতে।

আমি যে অঞ্চলে গেলাম সেখানে বাস করতো বাজাউর জাতি। সেখানে আমি দেখা করলাম সানোবর হুসেনের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হলো। তিনি অভিমত দিলেন, ব্যাপারটা নিয়ে মহম্মদ আমিন সেনওয়ারির সঙ্গে কথা বলা দরকার; তিনি তখন আদ্দা সরিফ থেকে মহামন্দ্ জাতির কাছে এসেছিলেন। আমরা দু'জনেই গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, খবর পেলাম তিনি ইতিমধ্যেই উপজাতীয় অঞ্চল ছেড়ে আদ্দা সরিফের দিকে রওনা হয়ে গেছেন।

অবশ্য আরও তিনজন কমরেড ও বন্ধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো—তাদের সঙ্গেই আলোচনা করলাম। প্রস্তাব অনুযায়ী একটা বড় জমি কেনবার কথা হয়েছিল—সেখানে কলোনি স্থাপন করে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে-আসা এই সব লোকদের থাকবার এবং শিক্ষিত করে তোলবার ব্যবস্থা হবে। সবাই বললেন—প্রস্তাবটি কার্যকরী সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী অন্তর্ঘাতকর্মে তাদের শিক্ষা কাজে লাগানো ভারতে সম্ভব হবে না, কেননা উপজাতিদের মধ্যে ব্রিটিশেরও এজেন্ট আছে—তারা সবদিকে লক্ষ্য রাখবে এবং সব খবর চলে যাবে প্রভুশক্তির কাছে। অবশ্য উপজাতীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশের যদি কখনো বিরোধ বাধে তবে সেই ক্ষেত্রেই এই শিক্ষা কাজে লাগবে।

ফিরে এসে আমার আলোচনার ফলাফল জানালাম রামকিষণকে। প্রস্তাব পরিত্যক্ত হলো।

বিকল্প হিসেবে এই সব লোকদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে গোপনে আমাদের পার্টির কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে এদের নিযুক্ত করা হলো।

আমার বিয়ের একপক্ষকাল পরের ঘটনা।

১৯৪০-এর মে মাস!

রামকিষণ আর অচ্ছর সিং চীনা একদিন ঘাল্লায় আমাদের

বাড়ীতে এলেন। তাঁরা বললেন—একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবার পথে সাহায্য করতে হবে। সীমান্ত পার হবার পথে সঙ্গে সঙ্গে থাকার জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন।

তখন বাবা গুরমুখ সিং-এর গ্রেপ্তারের পরে কাবুলে আমাদের সব যোগাযোগই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সব রকম ব্যবস্থাকেই হতে হবে নিশ্চিত এবং 'পাকা'। পরদিন এই ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও আলোচনার জন্য আমরা তিনজন পেশোয়ার যাত্রা করলাম।

পেশোয়ারে আবাদ খানের সঙ্গে দেখা করলাম—ওর সঙ্গে অনেক দিন আগের পরিচয়। আগে সে পেশোয়ার ও কাবুলের মধ্যে যে যানবাহন সংস্থা ছিল সেখানেই কাজ করতো। তাই কোনো এক সময়ে ভারতের কমরেড ও কাবুলে বাবা গুরমুখ সিং-এর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজে সে নিযুক্ত ছিল। সে ছিল নির্ভরযোগ্য, রাজনীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সাহায্য করার জন্য উন্মুখ এক কমরেড। আমরা ওর সঙ্গে কাবুলে যাবার বিভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনা করলাম—নিরাপত্তার জন্য যেসব ব্যবস্থার প্রয়োজন তা নিয়েও কথা হলো।

অনেকদিন পর্যন্ত কাবুলে কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না বলেই কাবুলে যাবার পথ সম্পর্কে কোনো সুনিশ্চিত আয়োজনও সম্ভব হলো না। কাজেই আমরা স্থির করলাম, কাজের গুরুত্ব যখন বেশী তখন এই আয়োজন সাময়িকভাবেই করা হোক্। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ব্যবস্থাগুলো পাকা করে ফেলতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

এই ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধানগুলো চালাতে হবে; আবাদ খান, রামকিষণ ও আমি প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে তাই করতে শুরু করে দিলাম। প্রস্তাবিত পথ দিয়ে যাবার জন্য যেসব সন্ধান নিতে হবে সে সম্পর্কে বিচার ও গবেষণা করে আমরা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে তার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করলাম। বিবরণগুলো আমরা পাল্টা-পাল্টি করে দেখলাম এবং তারপর যে-পথ চূড়ান্তভাবে স্থির করা হলো তা এই: পেশোয়ার থেকে শবকাদর, সেখান থেকে গণ্ডব

উপত্যকা, লালাপুরা, জালালাবাদ—সেখান থেকে আদ্দা সরিফে হাজী মহম্মদ আমিনের কাছে; তারপর আবার জালালাবাদে ফিরে এসে, সেখান থেকেই শেষ পর্যন্ত কাবুল। অচ্ছর সিং চীনাকে বলা হলো সেই 'বিশিষ্ট ব্যক্তি'র সঙ্গে যোগাযোগ করে পেশোয়ার পর্যন্ত তাঁর যাত্রার ব্যবস্থা করতে। কিস্‌সা খোওয়ানি বাজারে একটা বাড়ী আমরা ঠিক করেছিলাম সেই 'বিশিষ্ট ব্যক্তি'র অবস্থানের জন্য। মিঞা ফিরোজ শাহ্‌ ছিলেন এই বাড়ীর মালিক। অচ্ছর সিং এই সময়ে আমাকে জানালেন, যে-বিশেষ ব্যক্তিটির জন্য আমরা এই সব আয়োজন করে যাচ্ছিলাম তিনি বাঙ্‌লা সরকারের কাছে চূড়ান্ত নোটিশ পাঠিয়ে বলেছেন, ১৯৪০-এর ৪ঠা জুলাই-এর মধ্যে হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারিত করতে হবে। এই নতুন পরিস্থিতির কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন সংবাদপত্র থেকে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই বোঝা গেছে যে, আমাদের উদ্দিষ্ট সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

অচ্ছর সিং কাগজে ঐ সংবাদ পড়ে এই ভেবে বিস্মিত হলেন যে নেতাজী বসু কি তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করেছেন, না সীমান্ত পার হয়ে তাঁর যাত্রার ব্যাপারটি থেকে সরকারের মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্য এটা একটা কৌশলমাত্র? এই বিষয়ে আমরা একমত হলাম যে নেতাজী বসু তার সঙ্কল্পিত কর্মপন্থা থেকে সরে আসার লোক নন।

১৯৪০-এর ১লা জুলাই অচ্ছর সিং নেতাজীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর অন্তর্ধানের জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানালো। নেতাজী বললেন, তিনি খুবই নিরাশ হয়ে পড়েছেন।

হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ আন্দোলনের জন্য তিনি ঠিক এখনই প্রস্তাবিত যাত্রা শুরু করতে পারছেন না। তিনি আশঙ্কা করছেন—যে কোনো মুহূর্তেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তিনি অচ্ছর সিংকে বললেন—এই পরিস্থিতিতে এই 'অভিযান' আপাতত স্থগিত রাখা যেতে পারে।

অচ্ছর সিং পেশোয়ারে এসে আমাদের এই সব কথা জানালেন।

কিন্তু আমরা কাজ চালিয়ে গেলাম—সেই কাজ বিভিন্ন পথের খোঁজ খবর নেওয়া আর পথে পথে যোগাযোগের ব্যবস্থা রাখা। স্থির হলো রামকিষণ কাবুলে যাবেন এবং সেখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে—উদ্দেশ্য নতুন যোগাযোগের সন্ধান শুরু করা। ১৯৪০-এর ৫ই কি ৬ই জুলাই তিনি কাবুল যাত্রা করলেন। এক মাস পরে তাঁর এক লিখিত বার্তায় জানতে পারলাম—কাবুলের লোকদের মধ্যে সহ-যোগিতার মনোভাব দেখা যাচ্ছে না, ওঁকেও ওরা বিশ্বাস করছে না। এই অবস্থায় নতুন নির্দেশের প্রয়োজন।

তখন আমাদের দলের অধিকাংশ নেতাই ছিলেন কারাগারে। সুতরাং দলের নেতাদের নির্দেশ জেনে ওঁকে পাঠানোর ব্যাপারটি আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ালো, কেননা যারা কারাগারের বাইরে আছেন তারাই বা কে কোথায় আছেন সঙ্গে সঙ্গে জানার কোনো উপায় ছিল না।

কোনো রকমে আমি অচ্ছর সিং চীনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলাম। গুরচরণ সিং-এর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে গেল। তাঁর মারফৎ আমি অচ্ছর সিংকে সংবাদ পাঠালাম—ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরী দরকার।

সংবাদ পেয়ে অচ্ছর সিং আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন আমাদের গ্রামের বাড়ীতে। আমি তাঁকে কাবুল পরিস্থিতির কথা জানালাম। তিনি বললেন, দলের নির্দেশ আছে দরকার হলে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে কাবুল যেতে হবে। আমাকে তিনি বললেন আমি যেন পেশোয়ার পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে গিয়ে ওঁর কাবুল-যাত্রার ব্যবস্থা করি।

আমরা দু'জনে পেশোয়ার পৌছুলাম। সেখানে আবাদ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঁর কাবুল যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। কাবুলে নিরাপদেই পৌছুলেন অচ্ছর সিং কিন্তু তিনিও পারলেন না কাবুলস্থিত দূতাবাসের মারফৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তখন রামকিষণ আর অচ্ছর সিং স্থির করলেন—ওঁরা নিজেরাই সীমান্ত পার হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে ওখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন।

সোভিয়েতের সীমান্ত পর্যন্ত যেতে ওঁদের অসুবিধা হলো না। সঙ্কট দেখা দিল 'আমু' নদী পার হবার সময়। অচ্ছর সিং পার হয়ে গেলেন—কিন্তু স্রোতে ভেসে গেলেন রামকিষণ। এইভাবেই ভারতের এক বীর সন্তান প্রাণ দিয়েছিলেন দেশেরই সেবায়, দূর বিদেশে!

অচ্ছর সিংকে গ্রেপ্তার করলো সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষিবাহিনী। মস্কো কর্তৃপক্ষের কাছে সংবাদ গেল, ওঁর বার্তাও পাঠানো হলো। মস্কোতে অচ্ছর সিং আগে আরও অনেকবার গেছেন—সুতরাং তাঁর পরিচিত একজন এলেন তাঁকে সনাক্ত করতে। তারপর তাঁকে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হলো।

তারপর দীর্ঘকাল ওঁর কথা কিছু জানতে পারি নি—ওঁর কাছ থেকে কোনো খবরও আসে নি!

এইখানে বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কেমন করে কীর্তিপার্টি (কম্যুনিস্ট পার্টি) নেতাজীকে নিরাপদে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দেশদর্পণ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন সর্দার নিরঞ্জন সিং তালিব। তিনি নেতাজীর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু—এঁর কাছে নেতাজী নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তোলার জন্য তিনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সাহায্যও প্রার্থনা করেছিলেন। অচ্ছর সিং ছিলেন পার্টির আত্মগোপনকারী এক নেতা। তিনি তখন কলকাতায় অবস্থান করছিলেন; তালিব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ছাত্রজীবনে চীনা ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার গদর পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। পড়াশুনার জন্য গদর পার্টি তাঁকে পাঠায় সোভিয়েতে। সেখানে তিনি বেশ কিছুকাল থাকেন তারপর ভারতে ফিরে আসেন। তখনকার দিনে কীর্তি পার্টির সেরা নেতাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। নেতাজীর ইচ্ছার কথা তালিব তাঁকে বললেন। অচ্ছুর সিং চাইলেন তিনি নিজে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করবেন; তাঁর উদ্দেশ্য, পার্টিকে এই দায়িত্ব

গ্রহণ করতে বলার আগে এই কাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে নেতাজীর সঙ্গে আলোচনা করা।

সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হলো। কাবুলে যখন আমি নেতাজীর সঙ্গে ছিলাম তখন তিনি নিজেই এই আলোচনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন। অচ্ছর সিং তাঁর কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি তা জানতে চেয়েছিলেন। নেতাজী তাঁকে বলেছিলেন, যেখানে—

ক) কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী তাঁকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে সরাতে পেরেছে, সেখানে—

খ) বামপন্থীদের গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে বা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংহত করে তোলা সম্ভব নয়, আর—

গ) সেই পরিস্থিতিতে নেতাজীর দৃঢ় ধারণা এই ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান না ঘটলে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করা যাবে না। তাছাড়া—

ঘ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই অভ্যুত্থানের অনুকূল একটি অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে, তাই তিনি চান এক মিত্রভাবাপন্ন এবং রাজতন্ত্র-বিরোধী শক্তির কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য সংগ্রহ করতে।

নেতাজী সেদিন স্পষ্ট ভাষায় একথা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস, একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই তাঁকে তাঁর অন্তর্ধান প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে।

অচ্ছর সিং-এর কাছে নেতাজী একথাও বলেছিলেন যে, তাঁর এই পরিকল্পনা নিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়প্রকাশ নারায়ণ, দিল্লীর লালা শঙ্করলাল, শার্দুল সিং কবীশর এবং আরও অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সকলের অনুমোদনই তিনি লাভ করেছেন।

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই ছিল, যে-ব্যক্তি তাঁরই মতো দেহের গড়ন বা শক্তির অধিকারী—তাঁকে দিয়েই তাঁর স্বপ্ন সফল হবে। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ থেকেই তিনি এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন।

নেতাজীর মুখে তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা শুনলেন অচ্ছর সিং।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং মুক্তির জন্যে আমরা যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিই আমাদের যথার্থ সাহায্য করতে পারে—নেতাজীর মুখে এই কথা শুনে অচ্ছর সিং তাঁকে কথা দিয়ে এলেন—তিনি তাঁর পরিকল্পনা পার্টির কাছে উপস্থিত করবেন।

আমাদের পার্টি সমস্ত প্রশ্নটি সবদিক থেকে বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে এলো—পার্টির নীতির সঙ্গে এর কোনো অসঙ্গতি নেই। এই সিদ্ধান্তে আসবার আগে আমরা তেজ সিং স্বতন্ত্র-র সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলাম—তিনি তখন জেলে ছিলেন। আমরা ভাবলাম সোভিয়েত ইউনিয়নে একবার যেতে পারলে তিনি অনেক কিছুই জানতে পারবেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবার সুযোগও পেয়ে যাবেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট, সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী শক্তিগুলির পক্ষে তিনি এক আশ্রয়স্থল রূপে গণ্য হতে পারেন। সুতরাং তাঁকে সর্বথা সাহায্য করা প্রয়োজন—আমরা এই রকমই ভেবেছিলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন অবস্থাও হতে পারে যখন সে তার লক্ষ্য সাধনে আমাদের দেশকে কার্যত সাহায্যও করবে।

পার্টি স্থির করলো—প্রত্যেকটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করে, খুবই সতর্কভাবে অন্তর্ধানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেহেতু তিনি এক প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা, সেইহেতু তিনি যাতে নিরাপদে চলে যেতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করতে হবে—এ ব্যাপারে কোনোরকম ঝুঁকি বা অনুমানের উপর নির্ভর করা চলবে না। যদি তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয় তবে তা হবে পার্টির পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক!

রামকিষণ, অচ্ছর সিং এবং আমার মতো অভিজ্ঞ কমরেডদেরই পার্টি এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো—কেননা, সীমান্ত অঞ্চল কিংবা ওখানকার অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। নেতাজী নিজেও অচ্ছর সিং ও রামকিষণকে জানতেন, তাঁদের পার্টির কাজের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল।

আমরা জানি ১৯৪০-এর জুলাই মাসে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে নেতাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই আন্দোলন শুরু করার জন্য তাঁকে তাঁর মূল পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হচ্ছে—তাই এ ব্যাপারে নেতাজী খুশী ছিলেন না। সুতরাং, কলকাতায় যখন তিনি জেলে ছিলেন তখন যতদূর সম্ভব শীঘ্র জেল থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টাও করছিলেন।

এই উদ্দেশ্যে তিনি অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। এত বড় একজন জনপ্রিয় নেতার জীবন নিয়ে সরকার কোনো ঝুঁকি নিতে চাইলেন না—সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাদের নতি স্বীকার করতে হলো।

জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি নিরঞ্জন সিং তালিবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন—তাঁর মনে হলো কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আরও বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই অচ্ছর সিং চীনা চলে গিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। তাছাড়া, পার্টির শীর্ষ-স্থানীয় নেতাদের মধ্যে অনেকেই জেলে ছিলেন, তাই নতুন যোগাযোগ সম্ভব হলো না। তখন নেতাজী স্থির করলেন—নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যনির্বাহক সমিতির এক অধিবেশন ডাকবেন।

সীমান্ত প্রদেশের মিঞা আকবর শাহ্ এলেন এই অধিবেশনে। ইনি নওশেরার একজন অ্যাড্ভোকেট—হিজ্রত আন্দোলনের সময়ে তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে—মস্কোর 'শ্রমজীবীদের প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে' তিনি পড়াশোনা করেন। কিছুকাল সোভিয়েত ইউনিয়নে থেকে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ভারতে ফিরে আসার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে তিন বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দণ্ডের পর মুক্তি পেয়েই তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

নেতাজী এঁর সঙ্গে তাঁর 'প্ল্যান' নিয়ে কথা বললেন। মিঞা আকবর শাহ্ বললেন, ঐ অঞ্চলে তাঁর কোনো পরিচিত লোক নেই,

এবং ঐ জাতীয় কাজের অভিজ্ঞতাও তাঁর নেই। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত একজন কমরেড্‌কে তিনি জানেন—এই কমরেড দেশবিখ্যাত শহীদ হরিকিষণের ছোট ভাই। আসলে এই কমরেড্‌ এক বিপ্লবী পরিবারেরই ছেলে। মিঞা আকবর শাহ্‌ নেতাজীকে একথাও জানালেন যে, এই কমরেডের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, ঘাল্লায় এবং অন্যত্র বহু কিষাণ আন্দোলনে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন।

নেতাজী নতুন প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এই কমরেডের কাছ থেকে যাতে সাহায্য নেওয়া সম্ভবনা হয়—সেই উদ্দেশ্যে তিনি সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য গোপন ঠিকানা এবং সাঙ্কেতিক শব্দ প্রভৃতি স্থির করে দিলেন।

কলকাতা থেকে ফিরে মিঞা আকবর শাহ্‌ আমাদের গ্রামে চলে এলেন ; নেতাজীর সঙ্গে তাঁর যেসব কথা হয়েছিল তা আমাকে জানালেন, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁর চলে যাবার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আমি বললাম—আমার পার্টি থেকে এর আগেই আমি নির্দেশ পেয়েছি, আর ১৯৪০-এর জুলাই মাসেই সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।

আমরা পরদিনই পেশোয়ার যাত্রা করলাম—সেখানে গিয়ে দেখা করলাম আবাদ খানের সঙ্গে। আবাদ খানের সঙ্গে আলোচনার পর আকবর শা নেতাজীকে জানিয়ে দিলেন—সব ব্যবস্থা হতে পারে।

আমি সেই অঞ্চলের এবং যাওয়ার পথের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোর কোথাও কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা আবার ততুন করে দেখে নিলাম। নেতাজীর কাছ থেকে সংবাদ পেলাম—তিনি ফ্রন্টিয়ার মেইলে পেশোয়ারে আসবেন ১৯৪১-এর ১৯শে জানুয়ারী। নেতাজী আমাকে পরে বলেছিলেন, তিনি ১৬ই জানুয়ারী গভীর রাত্রিতে কলকাতার বাড়ী ছেড়ে এসেছিলেন—যে গাড়ীতে তিনি এসেছিলেন তা চালিয়েছিলেন তাঁর ভাইপো শিশির বসু (শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র)। ১৭ই জানুয়ারী খুব ভোরে তাঁরা ধানবাদে এলেন। তাঁর অন্য এক ভাইপো, শরৎচন্দ্র বসুর আর এক ছেলে, ধানবাদে কোলিয়ারীর

ম্যানেজার। আগেই সব ব্যবস্থা ঠিক করা ছিল। তিনি গাড়ী থেকে নামলেন ভাইপোর বাড়ীর থেকে একটু দূরে।

তিনি এসেছিলেন উত্তর ভারতীয় এক মুসলমানের ছদ্মবেশে—দর্শনার্থী হয়ে। তিনি একাই বাড়ীতে গেলেন। তাঁকে বহিরাগত হিসেবেই অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট একটি পৃথক ঘরে থাকতে দেওয়া হলো, যাতে প্রতিবেশী বা চাকরবাকরদের মনে কোনো সন্দেহ না জাগে।

সারাদিন সেখানেই কাটলো। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি একাই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এলেন—পরে একই গাড়ীতে তাকে তুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে রইলেন দুই ভাইপো আর অশোক বসুর স্ত্রী। তাঁরা গাড়ী চালিয়ে পৌঁছুলেন গোমোতে।

রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিছু দূরে তিনি গাড়ী থেকে নামলেন, তারপর রাত্রির অন্ধকারে একা চলে এলেন স্টেশনে। তিনি নিরাপদে ট্রেনে না ওঠা পর্যন্ত ভাইপোরা একটু দূরে অপেক্ষা করে রইলেন।

•

গোমো থেকে দিল্লী। দিল্লী পর্যন্ত তিনি একা; দিল্লীতে পৌঁছুলেন ১৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যায়—দিল্লী থেকে ফ্রন্টিয়ার মেলে পেশোয়ারে, ১৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যায়। প্ল্যানমতো নেতাজী ট্রেন থেকে নামলেন পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। ব্যবস্থা অনুযায়ী পেশোয়ার সিটি স্টেশনে এই ট্রেনেই উঠেছিলেন মিঞা আকবর শাহ্—তার উদ্দেশ্য নেতাজী এসেছেন কিনা তা দেখা, আর কেউ তাঁকে অনুসরণ করেছে কিনা কিংবা তাঁর উপর নজর রেখেছে কিনা তাও লক্ষ্য করা।

ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেতাজী নিজেই কুলি ডেকে একটা টাঙ্গা ঠিক করলেন টাঙ্গাওয়ালাকে বললেন, তাজমহল হোটেলে নিয়ে যেতে—আর একটা টাঙ্গায় আকবর শাহ্ তাঁকে অনুসরণ করলেন। তাজমহল হোটেলে নেতাজী একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন 'জিয়াউদ্দীন'—এই ছদ্মনামে। কলকাতা থেকে পেশোয়ার—এই ভ্রমণে উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ছদ্মবেশেই তিনি ছিলেন, তাঁর মুখে ছিল অল্প দাড়ি, মাথায় ফেজ টুপী আর দেহে শেরওয়ানি।

কাবুলে পরে নেতাজী আমার কাছে তাঁর দিল্লী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন. তাঁর সঙ্গে একই প্রথম শ্রেণীর কামরায় ছিলেন হোতির (মর্দান) নবাব আকবর খান। তিনি নানা রকম কৌতুকজনক কথা বলে নেতাজীকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তিনি বলছিলেন বিভিন্ন 'প্রিন্স'দের অর্থসম্পদের পরিমাণ, হায়দ্রাবাদের নিজামের ঐশ্বর্য—এই রকম আরো সব কথা। প্রশ্ন করা হলে নেতাজী জানালেন, তিনি একজন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট—ব্যবসার ব্যাপার নিয়েই পেশোয়ারে যাচ্ছেন।

মিঞা আকবার শাহ্ তাঁর টাঙ্গায় হোটেলের পাশ দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু পরে নেতাজীর কাছে একজনকে পাঠিয়ে দিলেন—তাঁর নাম আবদুল মজিদ খান। ইনি মিঞা আকবর শাহের সহপাঠী, আবদুল কোয়ায়ুম্ খানের ছোট ভাই। এই আবদুল কোয়ায়ুম পরে মুসলিম লীগের নেতা হয়েছিলেন।

আবদুল মজিদ্ খান তাঁকে বললেন, সবই ঠিক আছে—পরদিন সকালেই তাঁকে হোটেল থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। নেতাজী পরে আমাকে বলেছিলেন, তিনি আগেই জানতেন, পরদিন সকালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে—সুতরাং এই কাজে কোনো বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় নি ; আসলে এই দূত পাঠাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি এখানে আর একজন দেশপ্রেমিকের পরিচয় দিয়ে রাখতে চাই, যাঁকে আমরা এই সব ব্যবস্থাপনার মধ্যে গ্রহণ করেছিলাম। তিনি হলেন মিঞা মোহম্মদ শাহ্—পেশোয়ার জেলার অন্তর্গত 'পব্বি'র একজন ভূস্বামী, মিঞা আকবর শাহ্ও আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বহু রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা তিনজনে একসঙ্গে কাজ করেছি। ঘাল্লা দেহরের কিষাণ-বিদ্রোহেও আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তাঁর কয়েকজন আফগান বন্ধু ছিলেন—প্রত্যেক শীতে তাঁরা এঁর কাছে আসতেন। আমাদের ইচ্ছে ছিল জালালাবাদ থেকে কাবুল যাত্রার সময় প্রয়োজন হলে এই সব পরিচয় আমরা কাজে লাগাবো।

নেতাজী পেশোয়ারে পৌঁছুবার আগেই নেতাজী-নিষ্ক্রমণের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা তিনজন দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। স্থির

হয়েছিল, নেতাজীকে একা পাঠানো যাবে না, গাইড যত নির্ভরযোগ্যই হোক, কোনো সাধারণ গাইডের সঙ্গেও তাঁকে পাঠানো চলবে না। আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম—আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গে থাকবেন। ঐ অঞ্চলে আমার কতকগুলো নির্ভরযোগ্য পরিচয়ের ঘাঁটি ছিল—তাছাড়া, এই জাতীয় কাজের অভিজ্ঞতাও আমার ছিল বলে—এই মতই গৃহীত হলো যে কাবুল ও তারও পরবর্তী অঞ্চলে নেতাজীকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার কাজে আমি তাঁর একমাত্র যোগ্য সঙ্গী হতে পারি।

নিরাপদে নেতাজীকে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হলো বলে আমি সম্ভাব্য পথগুলি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম।

প্রথমে রামকিষণ ও আবাদ খানের সঙ্গে আলোচনায় পথ স্থির করেছিলাম পেশোয়ার—শাব-কদর, গন্দব উপত্যকা, লালপুরা—জালালাবাদ—আদ্দা শরিফ—পেছনে ফিরে আবার জালালাবাদ—তারপর কাবুল। এই পথ স্থির করবার পর কয়েক মাসের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যাতে এই পথের ব্যাপারে আমাদের আর উৎসাহ রইলো না। আমি সংবাদ পেলাম ব্রিটিশ পুলিশ ঐ পথে এক অপরিচিত লোককে গ্রেপ্তার করেছে। লোকটি নাকি শত্রুর গুপ্তচর! আমার মনে হলো ঐ পথের উপর ব্রিটিশ সি. আই. ডি'র লোক তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে—সুতরাং ও-পথ পরিত্যাজ্য।

এ এক কঠিন ও সঙ্কটময় অবস্থা, কেননা নেতাজী তখন আমাদের সঙ্গে। নতুন পথ, নতুন ঘাঁটি—সব সম্পর্কেই এখন দ্রুত এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেবল দ্রুত সিদ্ধান্ত নয়, নিরাপত্তা সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হতে হবে। মিঞা আকবর শাহ্ এবং মিঞা মহম্মদ শাহ—এঁদের কারো এই অঞ্চল সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না—সুতরাং তাঁদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতে পারি নি। তাঁদের সাহায্য বা নির্দেশ নেবারও কোনো উপায় ছিল না। অন্য কোনো বিকল্প পথ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারতো একমাত্র আবাদ খান। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করে আমি এই পথ স্থির

করলাম: পেশোয়ার-জামরোদ-খাজুরি ময়দান—ব্রিটিশ সামরিক শিবির—আফ্রিদি ও সিনওয়ারি উপজাতীয় অঞ্চল—তারপর কাবুল-পেশোয়ার পথে আফগান অঞ্চল গরহদি—ভাটি কট—জালালাবাদ—আদ্দা সরিফ—তারপর আবার পিছনে এসে জালালাবাদ—পরে কাবুল।

এই পথে বেশী লোক চলাচল ছিল না। আমাদের কমরেড্‌দের মধ্যে কেউ এর আগে এই পথ ব্যবহার করে নি—তাই আমরা ভাবলাম আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এইটিই নিরাপদ পথ। যে সমস্ত পথ বিভিন্ন বিপ্লবীরা সীমান্ত পার হতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে এইটিই হলো সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। অবশ্য পথটি একটু খাড়া—এ পথ খাইবার গিরিপথের প্রায় তের মাইল দক্ষিণে।

নেতাজীর বসবাসের জন্য পেশোয়ারে বজৌরি গেটের মধ্যে দু'টো বাড়ী আমরা ভাড়া নিয়েছিলাম। বাড়ী দু'টোর মালিক ছিলেন মিঞা ফিরোজ শাহ্। বিশে জানুয়ারী সকালে আবদুল খান এই বাড়ী দু'টোর একটিতে নেতাজীকে নিয়ে এলেন। কারো সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে—এই আশঙ্কায় আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম না।

এই সময়টিতে আমরা তাঁর জন্য জামাপোশাক, আফগান দেশীয় মুদ্রা ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডক্টর চারুচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে আমরা এই ঔষধ পেয়েছিলাম—অবশ্য তিনি জানতেন না কার জন্যে এই ঔষধ যাচ্ছে। তাছাড়া ভ্রমণে লাগতে পারে এমন সব জিনিসপত্রের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাবার জন্য আমি একজন 'গাইড্' চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। কখন সে আসবে শুরু হলো তারই প্রতীক্ষা।

চার

অন্তর্ধান

আমি প্রথম নেতাজীকে দেখেছিলাম ১৯৪১-এর ২১ জানুয়ারীর এক সন্ধ্যায়। আমার নিজের পরিচয় দিয়ে আমি তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা যা করা হয়েছে তা বুঝিয়ে বললাম। তিনি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পেশোয়ার ছেড়ে যেতে ইচ্ছুক, কেননা তাঁর পলায়নের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ামাত্র পুলিশ ও সি. আই. ডি তৎপর হয়ে উঠবে—তাহলে এই মুক্তি বিপন্ন হতে পারে। আমি তাঁকে জানালাম, পরদিন ভোরেই আমরা যাত্রা করবো।

পরে কাবুলে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। বিপ্লবী আন্দোলনে আমার কাজ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী তিনি শুনেছিলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের পরিবারের আত্মত্যাগের বহু কথাও জেনেছিলেন। কাহিনী শুনে শুনে তাঁর কল্পনায় আমার একটা মূর্তি গড়ে উঠেছিল —এক পুষ্ট ও বলিষ্ঠ পাঠানের মূর্তি, যে দীর্ঘদেহী, বিশাল এবং খুবই আকর্ষক। তিনি বলেছিলেন, আমার হালকা ও পাতলা দেহ এবং একটু বেঁটে আকৃতি তাঁকে খানিকটা নিরাশই করেছিল।

নেতাজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই স্থির হয়েছিল—একেবারে নতুন রূপে তিনি নিজেকে পরিচিত করবেন। তিনি হবেন এক বোবা ও কালা মুসলমান ভদ্রলোক—তীর্থযাত্রী হিসেবে আদ্দা সরিফ-এ যাচ্ছেন। তাঁর 'জিয়াউদ্দীন' নাম এখনও থাকবে।

তিনি পাঠানের ছদ্মবেশ নিলেন—মালয়েশিয়ার বস্ত্রে তৈরী শালোয়ার, কামিজ আর চামড়ার জ্যাকেট পরলেন, এর সঙ্গে রইল খাকি কুল্লা, লুঙ্গী আর মাথার ফেজ; পায়ে থাকলো পেশোয়ারী চপ্পল। একটি কাছলি কম্বলও তিনি সঙ্গে নিলেন।

এই সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা দাড়ি গজিয়েছিল। বলিষ্ঠ গড়ন, সুতীক্ষ্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সর্বোপরি দেহের বর্ণ—তাঁকে সত্যিকারের একজন পাঠানের মতোই দেখাচ্ছিল। আমি খুবই খুশী হয়ে উঠেছিলাম এইজন্য যে, এই ছদ্মবেশে তাঁকে সনাক্ত করার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। আমি আশা করেছিলাম, তিনি সাধারণের কাছে মুখ খুলবেন না, কেন না 'পশ্‌তু' ভাষা তাঁর জানা ছিল না। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে নতুন বেশে তাঁর অভিনয় একেবারে নিখুঁত হয়েছিল।

নতুন পোশাক পরে তিনি সব সময় ছিলেন হাসিমুখ। 'রহমৎ খান্'—এই ছদ্মনাম নিলাম আমি। আবাদ খানের ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৪১-এর একুশে জানুয়ারী সন্ধ্যায় একজন 'গাইড' এলো। পরদিন খুব ভোরেই নেতাজীকে যে বাড়ীতে রাখা হয়েছিল সেই বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো।

প্রায় সাড়ে ছ'টায় নেতাজী আর আমি হেঁটে চলে এলাম সেই জায়গাটিতে যেখানে গাড়ীটি রাখা হয়েছিল। গাড়ীর চালক ছিলেন আবাদ খান নিজে। তিনি ও গাইড আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম কয়েকটা পরোটা, ডিমভাজা আর আমাদের কম্বল। আমাদের সঙ্গে কোনো মালপত্তর ছিল না।

গাড়ীতে উঠে জামরোদ রোডের দিকে আমরা রওনা হলাম—সেখানে সীমান্তে গাড়ী থামিয়ে তল্লাসী করা হলো। আবাদ খান সই করলো ওদের রেজিস্টারী খাতায়—তারপর আমরা আবার রওনা হলাম। আমরা পৌঁছুলাম খাজুরি ময়দানের ব্রিটিশের ফৌজি ক্যাম্পে—জায়গাটি পেশোয়ার থেকে এগারো মাইল দূরে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে এলাম। সামনেই সীমান্ত অঞ্চল, ওখানে সিনওয়ারি জাতির বাস। এই সীমান্ত থেকে পায়ে-হাঁটা পাহাড়ী পথে আমরা এগিয়ে গেলাম—থামলাম ফৌজি ক্যাম্পের প্রায় এক ফার্লং দূরে। সীমান্ত পার হয়েই মুসলমানদের একটি মঠ—বহু তীর্থযাত্রী মাঝে মাঝে সেখানে ভীড় করে।

আমরাও তীর্থযাত্রী হয়ে গেলাম। ফৌজি পাহারাদার আমাদের

দেখতে পেয়েছিল কিন্তু সত্যিকারের তীর্থযাত্রী ভেবে ওদের মনে সন্দেহই জাগে নি। গাড়ীটা আমাদের নির্দেশ মতোই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল— সেই সময়ের মধ্যে আমরা সেই উপজাতীয় অঞ্চলের আরও ভিতরে ঢুকে গেলাম।

আমরা এখন তিনজন—নেতাজী, গাইড আর আমি। আমরা মঠ থেকে প্রায় এক মাইল এগিয়েছি এমন সময় নেতাজী বললেন, তিনি ক্লান্তি বোধ করছেন—বসে একটু বিশ্রাম নেবেন। অবশ্য তখনও পর্যন্ত আমাদের এই অভিযান ক্লেশদায়ক হয়ে উঠবার কথা নয়; আমার মনে হলো অনিশ্চিত লক্ষ্যের উত্তেজনা আর পদে পদে গ্রেপ্তারের আশঙ্কা হয়তো তাঁর দেহে এই ক্লান্তির ভাব জাগিয়ে থাকবে। এই রকম অবস্থায় এই জাতীয় অনুভূতি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমার মনে পড়ে গেল, এই রকম অভিযানে কতবার আমার এই অনুভূতি জেগেছে, বুঝি আর হাঁটতে পারবো না।

সামান্য বিশ্রামের জন্য আমরা বসলাম। আমার মনে হলো, নেতাজী বোধহয় বুঝতে পারেন নি আমরা ব্রিটিশ রাজ্যসীমা অতিক্রম করে চলে এসেছি উপজাতীয় অঞ্চলের গভীরে। তাঁকে একথা জানাতেই তিনি খুশী হয়ে উঠলেন—অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলেন, কেননা তিনি এমন এক অঞ্চলের বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন যা স্বাধীন—পরজাতির দ্বারা পীড়িত নয়। তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখালো; এই কথাটি আগে কেন বলি নি ওঁকে, এই ভেবে আমার দুঃখ হলো। কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে এনে আমরা আগুন জ্বাললাম; সেই আগুনে গরম করে নিলাম আমাদের পরোটাগুলি। তারপর দ্রুত কিছু খেয়ে নিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর থেকেই নেতাজীকে দেখলাম অত্যন্ত প্রফুল্ল আর উৎসাহে ভরা। আমরা চড়াই-এর পথ ধরেই যাচ্ছিলাম। একটি পাহাড়ের উঠবার পথে আমাদের একটা ছোট গিরিপথ অতিক্রম করতে হলো। পাহাড়ের শিখরে উঠলাম, এবার শুরু হলো উৎরাই-এর পথ। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা একটা গ্রামে পৌঁছে গেলাম; গ্রামটা পাহাড়ের নীচে—নাম পিশ্‌কান ময়না।

আমরা যখন গ্রামে গেলাম তখন রাত দুপুর। উপজাতীয় প্রথা অনুযায়ী অপরিচিত বা আগন্তুক অতিথিদের থাকতে হতো মসজিদে, না হয় হুজিরাতে; হুজিরা হলো সর্বসাধারণের একটি বসবার জায়গা, এখানে অবিবাহিত যুবক, অপরিচিত লোক বা অতিথিরা রাত কাটাতো। এটা যেন অনেকটা সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ বিশ্রামাগার—এখানে কথাবার্তা বলে অবসর সময় কাটাবার জন্যেও লোকেরা আসতো।

গাইড আমাদের নিয়ে এলো গাঁয়ের মসজিদে। মসজিদে ছিল একটা হলঘর, ঢোকবার পথটি খুবই ছোট, হলঘরে জানালা বা ঘুলঘুলি ছিল না। প্রায় পঁচিশ জন লোক ছিল হলের ভিতরে; কেউ বা রাতের ঘুম ঘুমিয়ে নিচ্ছিল, আবার কেউবা নোট বিনিময় করছিল—কিংবা নিজেদের বাড়ী ফিরবার আগে কিছুক্ষণ গল্প করে নিচ্ছিল। রাতটা ছিল ঠাণ্ডা, তাই তারা ভিতরে আগুন জ্বালবার ব্যবস্থাও করে নিয়েছিল।

দরজায় শব্দ করতেই তা খুলে গেল, আমরা ভিতরে গেলাম। ঘরে কোনো আসবাবপত্র বা খাট ছিল না; বেশ পুরু করে খড়ের বিছানা ছড়ানো ছিল মেঝের উপরে, বেশ আরামদায়ক কুশনের মতো। আমরা সেখানে বসলাম; একদল লোকের কাছেই বসলাম—আমরা আগন্তুক, পেশোয়ার থেকে এসেছি। তারপর কিছু খেতে চাইলাম।

ওদের মধ্যে দু'জন লোক সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন নিয়ে এলো দু'টি পাত্রে তৈরী করা চা—আর একজনের হাতে এল কয়েকটি নুন-মাখানো যবের কেক। এই মসজিদে পৌঁছুতেই আমরা প্রায় দশ মাইল পথ পার হয়ে এসেছিলাম, তাই কিছুটা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্তও হয়ে পড়েছিলাম। এই ছোট গ্রামে মাঝরাতে আমরা যে কিছু খেতে পেলাম—এতে বেশ ভালোই লাগলো।

এই গ্রামে উপজাতীয় স্বাধীন পাঠানদের বাস—প্রায় ষাটটি বাড়ী, পাথর ও কাঠের তৈরী, কাঠে অবশ্য ভিতর থেকে কাদার প্রলেপ দেওয়া। খাদ্য খুবই সাধারণ হলেও আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। নেতাজীও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন

—খেতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার লোকদের কাছ থেকে এমন সাড়া পাওয়াতে তিনি বেশ বিস্মিতই হয়েছিলেন। আমরা কে কোথায় যাবো এসব কিছুই ওরা জান্‌তে চায় নি—এই খাদ্যের জন্য আমাদের কোনো দামও দিতে হয় নি। আগন্তুকদের জন্য বিনা খরচে খাদ্য ও বিশ্রামদানের ব্যবস্থা করে দেওয়া পাঠানদের সামাজিক রীতি। আমরা যদি কোনো দামের প্রশ্ন তুলতাম তাহলেই এরা বিব্রত হয়ে পড়তো—তাছাড়া এটাও বোঝা যেত যে আমরা তাদের রীতি-নীতি জানিনা, তাই আমরা পাঠান নই। খাবার খেয়ে আমরা মেঝের উপর শুয়ে পড়লাম। ঘরটি গরম ছিল, কোনো আচ্ছাদনের দরকার ছিল না।

এক ঘণ্টাও বোধহয় ঘুম হয় নি, মনে হলো কে যেন গায়ে ঠেলছে। জেগে উঠে দেখলাম—নেতাজী। নেতাজী বললেন, তাঁর সঙ্গে বাইরে যেতে। বাইরে এসে তিনি বললেন—ঘরটা অনেক লোকে ঠাসা, তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছেন ; তাছাড়া ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি, তাঁর একটু নির্মল বাতাস দরকার। আমি কিছু টাট্‌কা জল ওঁকে দিলাম, সেই জলের ফোঁটা নাকে দিয়ে নাক আর গলা পরিষ্কার করে নেওয়া হলো। অবশ্য অনেকক্ষণ এভাবে বাইরে থাকা আমাদের কাছে সঙ্গত মনে হয় নি, কেননা এতে কারো সন্দেহ জাগতে পারে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা ভিতরে গেলাম ; ঘুমুতে চেষ্টা করলাম কিন্তু ঘুম এলো না। কারণ ঘরটা সত্যিই লোকেঠাসা ছিল। নেতাজীর সব সময়েই একটা দম বন্ধ হবার মতো ভাব। টাট্‌কা 'বাতাসের আশায় তিনি জেগে রইলেন আর কয়েকবারই তাঁকে বাইরে যেতে হলো। রাত যখন শেষ হলো তখন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ভোর বেলা লোকেরা এসে আবার আমাদের চা ও পরোটা দিয়ে গেল। এইবার তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি। আগেই যেমন ঠিক করা ছিল সেই ভাবেই আমরা তাদের বললাম—আমরা রাজমিস্ত্রী, পেশোয়ার থেকে এসেছি, এখন যাচ্ছি পাশের গাঁয়ে মালিক লতিফ খানের বাড়ী তৈরী করতে। এ জাতীয় অভিযানে এটা খুবই প্রয়োজন, কোন্ কোন্ প্রশ্ন হতে

পারে তা আগেই ভেবে রাখা আর সেই সঙ্গে উত্তরগুলোও ঠিক করে রাখা।

অতিথি-সেবকদের যথারীতি ধন্যবাদ জানিয়ে ১৯৪১-এর ২৩ শে জানুয়ারী সকাল নটায় আবার সামনের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। নেতাজী জেনে ফেলেছিলেন যে তিনি আর ভারতীয় ভূখণ্ডে নন—তাই তাঁর একটা স্বচ্ছন্দভাব ছিল আর সব কিছুকেই তিনি সহজভাবে নিচ্ছিলেন। তাঁর অধৈর্য বা যুক্তিহীন তাড়াহুড়ার ভাব একেবারেই ছিল না—তাঁর চাল-চলন খুবই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। রওনা হওয়ার আগে তিনি জানতে চাইলেন, খচ্চরের পিঠে চড়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা হতে পারে কিনা—কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল—এইভাবে আমরা আরও দ্রুত যেতে পারি। কিন্তু আমরা এর আগেই আমাদের অতিথি-সেবকদের বলে ফেলেছি যে আমরা পাশের গাঁয়ে যাচ্ছি, তাই খচ্চরে চড়ে যাবার প্রস্তাবটা এদের কাছে না তোলাই ঠিক মনে করলাম। ভাবলাম, পরবর্তী বিশ্রামস্থান থেকেই এই ব্যবস্থা করা যাবে।

পাশের গাঁ-টি ছিল প্রায় তিন মাইল দূরে—প্রায় দুপুরের দিকে আমরা সেখানে পৌঁছুলাম। পায়ে হেঁটে অনেক দূর যাবার অভ্যাস নেতাজীর ছিল না—বিশেষত পথ ছিল রুক্ষ আর উঁচু-নীচু। আগের দিনের যাত্রা বেশ ক্লান্তি এনে দিয়েছিল, তাছাড়া রাতের ঘুমও পর্যাপ্ত বা গভীর হয় নি। এই সব কারণে তিনি মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিচ্ছিলেন—তার ফলে, তিন মাইল পথ যেতে আমাদের প্রায় তিনঘণ্টা সময় লেগেছিল।

আগের গাঁয়ের তুলনায় এই গাঁ-টি সামান্য বড়—কয়েকটি মণিহারী দোকানও এখানে ছিল। এখানে আমি নেতাজীর ব্যবহারের জন্য একটি খচ্চরের খোঁজ করলাম। একজন আফ্রিদি শিখ-দোকানীর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম—একটা খচ্চর ভাড়া মিলবে কিনা। সে বললো, তার নিজেরই খচ্চর আছে, আমরা ইচ্ছে করলেই ভাড়া নিতে পারি। কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর সে তার খচ্চর ভাড়া দিতে রাজী হলো—আফগান সীমান্তে প্রথম গ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া

আট টাকা। সে জানালো, খচ্চরের পিঠে বসবার বেশ ভালো ও আরামদায়ক আসনের জন্য কুশনের ব্যবস্থা করতে তার কিছু সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে খাওয়ার কাজটাও সেরে নিতে পারি। সে তার খচ্চরটিকে যাত্রার জন্য তৈরী করতে লাগলো—এদিকে আমাদের কাছে পরিবেশন করলো—সুন্দর গরম চা আর পরোটা। এমন খাদ্যকে নিশ্চয়ই 'স্বাগত' জানাতে হয়! যখন থলে ভর্তি শুক্‌নো খড়ের কুশন পিঠে নিয়ে খচ্চর তৈরী হলো আমরা শিখ-দোকানীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলাম। এবার আমাদের যাত্রা সামনের গ্রাম পর্যন্ত। প্রায় দশ মাইল দূরে আফগান-সীমান্তে এই গ্রাম।

যে পর্বতমালা উপজাতীয় অঞ্চলকে আফগান রাজ্য থেকে পৃথক করে রেখেছে তার মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হলো। বেশ উঁচুতে এই পর্বতমালার মধ্য দিয়ে একটি গিরিপথ রয়েছে; পায়ে হাঁটার পথও সেখানে ছিল। উপজাতীয় অঞ্চল ও আফগান রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল বাধাহীন।

খচ্চরের পিঠে নেতাজীর এই যাত্রা ছিল আরামদায়ক। আগের ব্যবস্থা মতো পথে নেতাজীর কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল—বিশেষত তৃতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি মুখ খুলবেন না। এই সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত ছোটখাট ব্যবসা, চোরাই চালান বা এমনিতরো অন্য কিছু করে। তাই তারা অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না, আর অন্যেরা এদের ব্যাপারে নাক গলাবে এ-ও ওদের ইচ্ছে নয়। এর ফলেই গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে আমাদের এই যাত্রা হলো বাধাহীন ও নিরাপদ।

রাত প্রায় ন'টাতেই আমরা গিরিপথে এসে গেলাম। পথটি সম্পূর্ণ অন্ধকার কিন্তু খচ্চরের চালক আর আমাদের গাইড এক্ষেত্রে আমাদের খুবই সাহায্য করেছিল। পথের কি কি অসুবিধা তা তারা বেশ ভালো করেই জানতো। যে-পথ দিয়ে আমরা গিরিপথে উঠেছিলাম তা ছিল পূব দিকে—সেই পথ ছিল সূর্যকরোজ্জ্বল; পশ্চিম দিকে আলো ছিল না—সে পথ দিয়েই নেমে যেতে হবে; আমাদের সামনে

গভীর বন আর পথ তুষারময়। এই অসুবিধার কথা আমরা আগে ভাবি নি। নেতাজীর কাছে এটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাঁর খচ্চর পা পিছলে বরফের উপর পড়ে গেল ; তিনিও খচ্চর থেকে পড়ে গেলেন কিন্তু গাইড আর সেই খচ্চর-চালক সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তুলে ধরলো। ভাগ্যের কথা, তিনি আহত হন নি—সামান্য কয়েকটি জায়গায় ছড়ে গিয়েছিল মাত্র। খচ্চরের পিঠে এই ভাবে নেমে আসা, বিশেষ করে, এই রকম পথে, একেবারেই নিরাপদ নয়, আরামদায়ক তো নয়ই। নেতাজী স্থির করলেন, গিরিপথ শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি হেঁটেই যাবেন।

প্রথম আফগান গ্রামে আমরা পেঁাছলাম ২৪ শে জানুয়ারী, রাত প্রায় ১ টার সময়। পাহাড়ের নীচে এই গ্রামটি খুবই ছোট—এখানকার অধিবাসীরা সিনওয়ারি জাতিভুক্ত। আমাদের গাইড এবং খচ্চর-চালকের কাছে এই গ্রাম পরিচিত। তাদের বললাম এই গ্রাম থেকেও নেতাজীর জন্য একটি খচ্চর সংগ্রহ করতে হবে। এই খচ্চরে চড়ে যেতে হবে।

পোশোয়ার-কাবুল রোডে গরহ্‌দি গ্রামের নিকটবর্তী অ্যাসফল্‌ট্‌ পর্যন্ত পৌঁছানো গেল। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, এইখানেই রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে যাত্রা করবো।

গাইড আর সেই খচ্চরের চালক ওদের খুবই পরিচিত একজন গ্রামবাসীর গৃহে আমাদের নিয়ে গেল। তখন মাঝ-রাত পার হয়ে গেছে—রাতটি খুব ঠাণ্ডাও ছিল। একটি বাড়ীতে এসে আমরা দরজায় ঘা দিলাম—বাড়ীটিতে একটি মাত্র ঘর। একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল ; দু'একটি কথার পর আমরা তাকে বললাম—আমরা নবাগত, যাচ্ছি পাশের গাঁ গরহ্‌দিতে—রাতটা এই গাঁয়েই কাটিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে। লোকটি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ—স্বচ্ছন্দভাবেই আমাদের ভিতরে যেতে বললো। ঘরে দু'টো খাট—এক কোণে কয়েকটি ছাগল বাঁধা।

একটি খাটে আমরা বসলাম। আমরা আসবার পর লোকটি একটা কেরোসিনের প্রদীপ জ্বাললো।

অদ্ভুত ঘটনাচক্র ! আমরা জানতে পারলাম লোকটির সেই দিনই বিয়ে হয়েছে—আর এই রাতটিতেই নিজের ঘরে পত্নীর সঙ্গে তার প্রথম বিবাহবাসর। লোকটি ওর স্ত্রীকে জাগালো—স্ত্রীর চোখে মুখে ফুটে উঠলো আনন্দ ও বিস্ময়। সে বললো—আমাদের সে রান্না করে খাওয়াবে। আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম—তাই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম; সত্যিই আমাদের কিছু খাদ্যের দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওখানে আমরা বেশ সহজ বোধ করতে লাগলাম—তখন আমাদের ভ্রমণ-প্রসঙ্গে কথা বলতে শুরু করলাম। গৃহের মালিকের কয়েকটি খচ্চর ছিল—আমরা একটি চাইলাম নেতাজীর জন্য। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল—এইটুকু দূরত্বের দর চাইলো তের টাকা। সে প্রস্তাব করলো—খাবার খেয়েই আমরা যেন রওনা হয়ে যাই, ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা না করি। সে বললো, এই ব্যবস্থাই নাকি আমাদের পক্ষে নিরাপদ! উপজাতীয় অঞ্চলের অন্যান্য অনেক লোকের মতোই সে-ও হয়তো ভেবেছিল—কোনো সন্দেহজনক ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে। তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে আমরা ঠিক করলাম—খাবারের পরেই আমাদের অভিযানের পরবর্তী পর্ব শুরু করা যাবে।

এমন দ্রুত রান্না করে সেই নববধূ আমাদের পরিবেশন করলো যে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। সে আমাদের দিয়েছিল ডিমভাজা আর নুন মাখানো পরোটা। নেতাজীর মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম যে তাঁর এই খাবার খুবই পছন্দ হয়েছিল—ঐ রকম অসময়ে সে যে এই রুচিকর খাদ্য তৈরী করে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য অত কষ্ট করেছিল এতে তিনি যেন বেশ কৃতজ্ঞই বোধ করেছিলেন। বধূটির ব্যবহারে বিনয় ছিল কিন্তু অযথা লজ্জায় সে কখনো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নি। ওর চালচলনে মনে হচ্ছিল আমরা যেন ওর নিকট আত্মীয়-পরিজন। পৃথিবীর কোথাও কোনো বড় হোটেলে আমাদের ভোজন এত আরামদায়ক হয়ে উঠতে পারতো কিনা সন্দেহ। তখনও তার পরনে ছিল বিয়ের পোশাক—অঙ্গে ছিল নববিবাহিত বধূর অলঙ্কার।

ভোজনপর্ব শেষ হলো। আমাদের গাইডের এই পর্যন্তই আসবার কথা ছিল—এইবার ওকে ফিরে যেতে হবে। আমার মনে হলো সাঙ্কেতিক ভাষায় আবাদ খানের কাছে একটা সংবাদ পাঠানো দরকার; এক টুক্‌রো কাগজ আর কলমের খোঁজ করলাম কিন্তু পেলাম না। আমার এই সমস্যাটি নববধূটি অনুমানে বুঝতে পেরেছিল। সে সুতোর একটা গুটি নিয়ে এলো—গুটি থেকে কাগজের মোড়কটা খুলে আমাকে দিল চিঠি লিখবার জন্য। হাতের তেলোয় কয়েক ফোঁটা জল ফেলে তাতে সে নীল গুলে দিল—তারপর কলমের কাজ করবার জন্য ছোট একটি কাঠিও এগিয়ে দিল। সেই কাগজের টুক্‌রোতে আমি সংবাদটি লিখলাম। গাইডের হাতে দিলাম সেই কাগজের টুক্‌রো। সে তা নিয়ে খচ্চর-চালকের সঙ্গে চলে গেল।

আমাদের অতিথি-সেবক সেই ভদ্রলোকের কাছে বলেছিলাম, আমরা তীর্থের উদ্দেশ্যে আদ্দা সরিফ-এ যাচ্ছি। তবু সে যেন আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না—তাই সে বারবার জেদ করতে লাগলো, আমাদেব নিরাপত্তার জন্যই রাতের অন্ধকারে আমাদের অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হওয়া দরকার।

১৯৪১-এর ২৭শে জানুয়ারী। খাবার খেয়ে ভোর প্রায় পাঁচটায় আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। অতিথি-সেবক সেই ভদ্রলোকও কিছু দূর পর্যন্ত এলেন তার একটি খচ্চর আর একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে।

নেতাজী আবার খচ্চরের পিঠে আরোহী হলেন। একটা শুকনো নদী-খাতের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে। পথে কোনো অসুবিধা হলো না। নেতাজীর উৎসাহ আর মেজাজও ভালো ছিল। হাবভাবে মনে হচ্ছিল তিনি যেন স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ!

গরহ্‌দিতে আমরা পৌঁছুলাম ৯টায়—আগে যেখানে খেয়েছিলাম সেখান থেকে এই জায়গা প্রায় এগারো মাইল দূরে। খচ্চর-চালক আমাদের জানালো, সেখানে এক মূর্তি আছে—'গরহদি বাবা'; মূর্তিটি আছে গরহ্‌দি গ্রামের বাইরে, গ্রামের কবরখানার মধ্যে। তার

প্রস্তাব, আমরা যখন তীর্থযাত্রায় যাচ্ছি তখন প্রথমেই যেন এই মূর্তিটি দেখে যাই।

ওর কথা মেনে নিয়ে আমরা মূর্তিটির কাছে গেলাম, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত মুসলিম প্রথা অনুযায়ী আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। একটু পরেই অতিথি-সেবক সেই ভদ্রলোক বললেন—যদি আমাদের কিছু ঘটে আমরা যেন কিছুতেই প্রকাশ না করি যে আমরা ওর বাড়ীতে এক রাত কাটিয়েছি কিংবা আমাদের ব্যবহারের জন্য ওর খচ্চর ভাড়া করেছি। একথাও সে জানালো—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আমরা যেন ওকে জানাই। ওর কথার অর্থ বোধ হয় এই ছিল যে, ফিরতি যাত্রার সময়েও সাহায্যের জন্য ওর উপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

আমরা খুবই খুশী হয়ে উঠেছিলাম এই ভেবে যে পেশোয়ার-কাবুল পথের প্রথম লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে গেছি, আফগানিস্তানের প্রায় তেরো মাইল ভিতরে—আর পথে কোনো বিরূপ ঘটনা ঘটে নি।

পাঁচ

জালালাবাদের পথে

গরহ্‌দি থেকে জালালাবাদ !—প্রায় চল্লিশ মাইলের পথ।

এই পথটুকু আমরা ট্রাকে যাবো ঠিক করলাম। এর আগেও পেশোয়ার থেকে আমরা বাসে আসি নি—সেটা নিরাপদ ছিল না—এরকম পরামর্শ দেবারও উপায় ছিল না, কেননা বাসে সি. আই. ডি'র লোকেরা থাকতে পারে, পেশোয়ারের পরিচিত লোকদের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পথের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করাটাও যুক্তিযুক্ত মনে হলো না—কোনো কৌতূহলী মানুষ হয়তো প্রশ্নের তীর ছুড়তে থাকবে।

আমরা তাই পথ দিয়ে যেতে শুরু করলাম—আশা, কোনো ট্রাক হয়তো জালালাবাদ যাবার পথে আমাদের অনুরোধে থেমে আমাদের তুলে নেবে। আমরা জানতাম, টাকা পেলেই ট্রাক যাত্রীদের তুলে নেয়—এইটেই ছিল প্রচলিত নিয়ম, কেননা গ্রামগুলোর মধ্যে কোনো নিয়মিত বাস চালু ছিল না।

এখন আমরা মাত্র দু'জন—নেতাজীকে মনে হচ্ছিল খুবই খুশী আর উচ্ছ্বসিত। আমরা কিছুদূর মাত্র গিয়েছি—দেখলাম, নেতাজী আনন্দে প্রায় নাচতে শুরু করেছেন। তিনি বলছিলেন—'ক্যায়সা সুন্দর দেশ হ্যায়!' আমি প্রশ্ন করলাম, এই রুক্ষ পাহাড় আর শুক্‌নো জমির মধ্যে কি এমন সৌন্দর্য দেখলেন? তিনি বললেন, 'ইয়ে তো বহুত বড়ি সুন্দরতা হ্যায়!'

এর পরই আমাদের চিন্তা শুরু হলো, আফগান রাজ্যে যদি নেতাজীকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন কি হবে। নেতাজী বললেন, বর্তমান সরকার ব্রিটিশের সাহায্যেই ক্ষমতায় এসেছে, তাই এইটেই স্বাভাবিক

যে তারা আমাদের ব্রিটিশের হাতেই তুলে দেবে। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম—এই ব্যাপারে আফগান সরকার স্বাধীনভাবেই তাদের কর্মপন্থা ঠিক করে নেবে—কারণ তারা বাচ্চা-ই সাকো'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে —বাচ্চা-ই সাকো তো ছিল ব্রিটিশের বন্ধু। ভারতের লোক তাদের সংগ্রামে সহানুভূতি জানিয়েছে আর বর্তমান নেতৃত্বকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া সংস্কৃতির দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে আফগানদের সঙ্গে ভারতীয়দের, বিশেষত উপজাতি অঞ্চলের লোকদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই জাতীয় প্রশ্নে, এর আগেও দেখা গেছে, আফগান সরকার তাদের স্বাধীন নীতি গ্রহণ করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, বাবা গুরমুখ সিং ও বাবা পৃথ্বী সিং এর মতো প্রখ্যাত বিপ্লবীদের আফগানিস্তানেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু তাঁদের ব্রিটিশের হাতে সমর্পণ করা হয়নি। বরং তাদের বলা হয়েছে তাঁদের ইচ্ছামতো তাঁরা দেশে যেতে পারেন। তাঁরা অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নেই গিয়েছিলেন—সেই দেশও তাঁদের বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিল।

আমি বললাম, বিশেষ করে নেতাজীর ক্ষেত্রে এটাই বেশী সম্ভব যে, আফগান সরকার স্বাধীনভাবেই চলবে—তার কারণ নেতাজীর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা আছে। আফগান সরকার যদি তাঁকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেয় তবে তাঁর নিজের দেশের লোকেরাই তার প্রতিবাদ জানাবে, কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সহানুভূতি রয়েছে। সব চেয়ে বড় কথা, আফগান ঐতিহ্যই এই জাতীয় কর্মপন্থার বিরোধী। তিনি আমার সঙ্গে একমত হয়েও বললেন—সময়টা স্বাভাবিক নয়, সব কিছুই ঘটতে পারে।

এই ভাবে পথে যেতে যেতে অনেক রকম সমস্যা নিয়েই আমরা আলোচনা করলাম। ততক্ষণে আমরা আর একটা গ্রামে এসে গেছি।

গ্রামের নাম আর্জানাও—বুঝলাম স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটলেও প্রায় দু'মাইল পথ পার হয়ে এসেছি। পথের পাশেই আমরা বসে পড়লাম —একটু বিশ্রামের জন্য।

আমাদের সামনেই পথটা যেন হঠাৎ একটা বাঁক নিয়ে পাহাড়ের

মধ্য দিয়ে চলে গেছে। কাজেই পথের ওদিক থেকে কেউ এলে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ ঐ পথেই একটা বিশালকায় পাঠান এসে দাঁড়ালো আমাদের সামনে। দেহের মাপেই . বিরাট তার গোঁফ। আমাদের পাশে থেমেই সে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। সে জানতে চাইল, আমরা কোথা থেকে এসেছি—ওখানে কি করছি। আমি তাকে বললাম, আমরা লালপুরা থেকে এসেছি। ওখান থেকে প্রায় ছ' মাইল দূরে কাবুল নদীর তীরে লালপুরা একটি ছোট্ট গ্রাম। লালপুরার নাম করলাম তাকে বোঝাবার জন্য যে, আমরা আফগানিস্তানেরই লোক। তাছাড়া ঐ গ্রামটির সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগাযোগও ছিল; আমার কয়েকজন প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ বিপ্লবী বন্ধু এই গ্রামেরই লোক। আমরা একসঙ্গে পেশোয়ার জেলে ছিলাম। এঁরা ছিল আমাদের গোপন ঘাঁটির মতো, আমাদের আন্দোলনে আফগানিস্তানের বিপ্লবী কমরেড্-দের এঁরা খুবই সাহায্য করেছে।

কিন্তু আগন্তুক সেই পাঠান বলে উঠলো, এ হতেই পারে না, সে নিজেই ঐ গাঁয়ের লোক। আমি তাকে বললাম—আসলে আমরা সীমান্ত থেকে এসেছি। আমার কাকা সঙ্গে আছেন। তিনি অসুস্থ—বোবা আর কালা: রোগের উপশমের জন্যই তাঁকে আদ্দা সরিফ-এ নিয়ে যাচ্ছি।

এই উত্তরে মনে হলো, লোকটা খুশী হয়েছে। সে বললো, তারও কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানা আছে। আমার কাকার জিভ্টা সে দেখতে চাইল—! আমাদের বক্তব্যের সারমর্মটুকু বুঝিয়ে আমি নেতাজীকে অনেক সঙ্কেত করলাম।

নেতাজী জিভ বার করলেন—লোকটা তার শার্টের কোণায় হাতটা মুছে জিভ্টাকে বেশ ভালো রকম পরীক্ষা করলো—তারপর আরোগ্যের একটা পথ বাত্লে দিলো। সে বললো, জিভটা শক্ত মনে হচ্ছে। আদ্দা সরিফ-এ যেতে পরামর্শ দিয়ে সে বললো, ওর ওষুধটাও যেন ব্যবহার করে দেখা হয়।

ওষুধটা এই রকম—গরমজলে খানিকটা থ্যালাম গুলে নিয়ে সেই

জলটা খানিকক্ষণ মুখে রেখে ফেলে দিতে হবে। এই রকম দিনে তিন চার বার।

আমরা উঠে পড়লাম; যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি এমন সময় সে বললো।—সে-ও লালপুরার লোক; যদি তার সাহায্যের দরকার হয়—তাকে যেন জানাই। আমি তাকে জানালাম—এখন আমরা সোজা আদ্দা সরিফেই আগে যাবো। পরে ফেরার পথে হয়তো আমাদের লালপুরা হয়েই যেতে হবে, সেই সময় তার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। যাই হোক ওর নাম বা ঠিকানা কিছুই নিলাম না। সে যখন বিদায় নিল তখন আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু কোনো ট্রাক এলো না; আমরা তখন পায়ে হেঁটেই আবার যাত্রা শুরু করলাম। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটে আমরা যে গাঁয়ে গেলাম—তার নাম বাসোল। এই গাঁয়ে যাবার পর দেখলাম একটা ট্রাক পেশোয়ার থেকে আসছে। আমি ইঙ্গিত করলেও গাড়ীর চালক আমাদের তুলে নিতে রাজী হলো না। সে বললো, গাড়ী জালালাবাদ যাচ্ছে না, তবে আরও একটা ট্র্যাক পেছনে আসছে, সেই গাড়ীর চালককে আমি যেন অনুরোধ জানাই।

তখন বিকেল প্রায় তিনটা। খুবই ক্ষুধার্ত বোধ করছিলাম—কিন্তু কাছে কোনো চায়ের দোকান দেখলাম না। অবশ্য দোকান খোঁজার ইচ্ছেও আমাদের ছিল না—খাদ্যের জন্য গাঁয়ের ভিতরে ঢোকা ঠিক মনে হয় নি। তাছাড়া চেয়েছিলাম একটা 'লিফ্‌ট্‌'—তার জন্যই আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। খাদ্যের পেছনে ছুটলে হয়তো সে সুযোগ হারাতে হবে। যাই হোক, একটু পরেই পেশোয়ারের দিক থেকে দ্বিতীয় ট্রাকটা এলো। এই ট্রাকটা ছিল চায়ের বাক্সে বোঝাই। আমি হাত নাড়তেই গাড়ীটা থামলো—চালক আমাদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল; আমরা উঠে পড়ে চায়ের বাক্সের উপরই বসে পড়লাম।

পথের পাশে একটি গ্রাম—নাম ভাটি কট—সেইখানে এসে ট্রাক থেমে গেল। চালক বললো—আরও এগিয়ে যাবার আগে আমরা ইচ্ছে করলে চা-খাবার খেয়ে নিতে পারি।

আমরা নেমে পড়লাম, একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ডিম সেদ্ধ আর চা খেয়ে নিলাম। নেতাজী আমাকে বলেছিলেন, তিনি 'লাঞ্চ্' খেতে চান না—একেবারে জালালাবাদে পৌঁছেই ভালো করে খেয়ে নেবেন। চা খেয়ে আমরা আবার উঠলাম সেই ট্রাকে। গঠনের দিক দিয়ে নেতাজী একটু ভারিই ছিলেন। ট্রাকে উঠবার সময় তাঁকে সাহায্য করতে হলো। কিন্তু এই কঠিন অভিযান তিনি উৎসাহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁর আত্মবিশ্বাস আর সেই সঙ্গে আনন্দও অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বেশ খুশী হয়েই পথের সব অসুবিধা সহ্য করেছিলেন। আমার কাছে এইটেই মস্ত বড় এক অনুপ্রেরণা।

প্রায় আধ ঘণ্টা থেমে থাকার পর ট্রাক আবার রওনা হলো। কয়েক মাইল যাবার পর তুইজন 'ইউনিফর্ম' পরা কন্‌স্টেবল এসে ট্রাক থামালো। তারা বলল, 'চর দেহ্' গ্রাম থেকে 'ইলাকোয়াদার' (জেলা কর্মচারী) আসছেন, তিনিও জালালাবাদ যাবেন। চালক সম্মত হলো—তারপর ত্নু' ঘণ্টার উপরে বসে রইলাম—তারপর এলেন সেই 'ইলাকোয়াদার'। সামনের দিকে একটি আসন তার জন্য খালি করে দেওয়া হলো। যাই হোক, ১৯৪১-এর ২৪শে জানুয়ারী রাত প্রায় আটটায় আমরা পৌঁছুলাম জালালাবাদে; সঙ্গে সঙ্গে একটা ভালো হোটেলে আশ্রয়ের জন্য আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

পূর্ব জালালাবাদ প্রদেশের রাজধানী জালালাবাদ—দেশের বৃহত্তম নগরগুলির মধ্যে একটি। এখানে কাবুল নদীর তীরে ছিল ব্রিটিশের কন্সাল অফিস। বাণিজ্যিক দিক থেকেও স্থানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লাঘমান উপত্যকার কৃষিজাত পণ্য—শুক্‌নো ফল—বিশেষ করে চালঘোজা, চাল আর কাঠ এখান থেকে চালান হয়ে থাকে। সেই সময়ে আধুনিক ফ্যাসানের অট্টালিকা ও পথ তৈরী হচ্ছিল। আধুনিক রীতিতে গড়ে তোলা হচ্ছিল শহরের নূতন অংশ—প্রশস্ত রাজপথ ও গলি।

রাজা আমানুল্লার পিতা আমীর হবিবুল্লার আমলে এই নগর ছিল প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানের শীতকালীন রাজধানী। দায়ুদ খান

ছিলেন সেই সময়ে এই প্রদেশের রাজ্যপাল—পরে তিনি হয়েছিলেন আফগানিস্তানের প্রধান মন্ত্রী—বর্তমানে প্রেসিডেন্ট।

পথের পাশেই একটি বাজার আছে—তাতে সব রকম জিনিসই পাওয়া যায়; বাজারে বিরাজ করতো ব্যস্ততা আর লোকজনের ভীড়। শহরে হোটেলও অনেক; সাধারণভাবে বলতে গেলে এই সব হোটেলে অতিথিদের জন্য কোনো আলাদা ঘর নেই। সুন্দর পুরু কম্বলে সাজানো একটা বড় হলঘর আছে। যে রীতিতে হলঘরটি গরম রাখা হয় তাকে বলা হয় 'বুখারি' রীতি। একটা ইস্পাতের চুল্লী—ঢাকের মতো দেখতে, উপরে জলের ড্রাম বসানো। একটা খালি পাইপ চলে গেছে জলের ড্রামের মধ্য দিয়ে একেবারে ঘরের বাইরে, ধোঁয়াটাকে শুষে নেবার জন্য। জ্বালানি কাঠ রয়েছে ইস্পাতের চুল্লীতে—সেই কাঠ জ্বলতে থাকে। যারা আসেন তারা যতক্ষণ খুশী থাকতে পারেন; সাধারণত তারা চা ও খাবার খেয়েই থাকেন। ঠাণ্ডার জন্য চায়ের পালাটাই অবশ্য বেশী চলতে থাকে। বিশ্রাম বা ঘুমের জন্য তারা হলঘরের সেই নরম কম্বলের বিছানায় শুয়ে পড়তে পারেন—তৃপ্তি ও আরামের জন্য গরম রাখার পদ্ধতি তো আছেই। অতিথির দল হলঘরে বসেই খাবার খান।

আমরা চেয়েছিলাম নিজেদের জন্যই একটি আলাদা ঘর, যাতে ভালো ঘুমের ব্যপারে বেশ নিশ্চিত হতে পারি। হোটেলওয়ালার পরামর্শ হলো—ঘুমের পক্ষে হলঘবটাই প্রশস্ত—ওখানে দিব্যি আরাম আর গরম। সে বললো, আলাদা ঘর সুবিধের হবে না। আমরা পীড়াপিড়ি করতেই আমাদের জন্য সে আলাদা ঘর দিতে সম্মত হলো, এমনকি যখন বললাম আমার কাকা অসুস্থ তখন সে খাট আর বিছানার ব্যবস্থা করে দিতেও রাজী হয়ে গেল। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার কাকাকে যদি হলঘরে রাত কাটাতে হয় তবে তাতে অন্য অতিথিদেরই অসুবিধে হবে। ঘরটিকে গরম রাখার জন্য হোটেলের মালিক কয়লা আর 'অঙ্গিঠি'রও ব্যবস্থা করে দিলেন।

এখানে রাতের খাবারটা খুবই ভালো হয়েছিলো। নেতাজী প্রাণভরে খেয়ে নিলেন। সত্যিই উপাদেয় হয়েছিল মুরগীর মাংস

আর কাবাব। নেতাজীর জন্য পোলাও-এর ব্যবস্থাও ছিল। দিনের কঠোর ক্লান্তির পর সেই খাবার আর সেই আরামদায়ক বিছানাকে 'স্বাগত' না জানিয়ে উপায় ছিল না।

রাত দশটার মধ্যেই আমরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠলাম ভোর সাতটায়। হোটেলের মালিককে বলে রেখেছিলাম, খুব ভোরে আমরা 'আদ্দা সরিফ'-এ যাব, আমাদের জন্য চা, ডিম আর শুক্‌নো 'নান' যেন সময়মতো তৈরী থাকে। ভোর আটটায় আমরা হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। গভীর ঘুমের পরে নেতাজীকে খুবই প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

'আদ্দা সরিফ' জালালাবাদ থেকে প্রায় সাড়ে চার মাইল দূরে। একটা টাঙ্গা ভাড়া করে আমরা রওনা হলাম—সেখানে পৌছেই সোজা মসজিদে চলে গেলাম; প্রচলিত নিয়মে মূর্তির সামনে প্রার্থনা করলাম, প্রথা অনুযায়ী নগদ কিছু দানও করলাম। তারপর খুব সতর্ক হয়ে, অনেকটা কথাপ্রসঙ্গেই যেন হাজি মহম্মদ আমিনের খোঁজ করলাম। আমাদের আদ্দা সরিফে আসার আসল উদ্দেশ্যই ছিল ওঁর সঙ্গে দেখা করা। খোঁজ নেবার সময় আমরা চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম—হাজি সাহেবের দর্শন যদি নিজেরাই পেয়ে যাই! জানতে পারলাম, হাজি সাহেব এখন তাঁর গ্রামের বাড়ীতে থাকেন। গ্রামের নাম লালমন—সেখানে তিনি নিজের একটি প্রার্থনার জায়গাও করে নিয়েছেন। আদ্দা সরিফ থেকে এই গ্রাম প্রায় দেড় মাইল দূরে। আমরা লালমন যাত্রা করলাম, বেলা প্রায় এগারোটার মধ্যেই পৌছে গেলাম সেখানে।

লালমন ক্ষুদ্র হলেও একটি সমৃদ্ধ গ্রাম—চারদিকে কৃষিযোগ্য ভালো জমি আছে। বাড়ীগুলো পাথর আর কাদায় তৈরী। অনেকটা জায়গা নিয়ে হাজি সাহেবের বেশ বড় বাড়ী—লাগোয়া একটি মসজিদও ছিল। শুনলাম সেই সময়ে তিনি মসজিদে আছেন। আমরা মসজিদে তাঁর 'প্রাইভেট' ঘরে গেলাম, আরও দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে তিনি তখন মেঝের উপর বসে ছিলেন। ঘরে শুকনো ঘাসের এক পুরু আস্তরণ বিছানো ছিল, নরম কুশনের মতো। ঘরে অন্য কোনো সাধারণ

আসবার বা স্থায়ী আসবার কিছু ছিল না; অবশ্য কতকগুলো ধর্মগ্রন্থ সাজানো ছিল—অনেকটা যেন হাজি সাহেবের পড়ার ঘর। দরজায় শব্দ করতেই খুলে গিয়েছিল। আমি হাজি সাহেবকে চিনতে পারলাম—কিন্তু তিনি চিনতে পারলেন না। চেনা কঠিন, শেষ দেখার পর দীর্ঘ এগারো বছরের ব্যবধান, তাছাড়া আমার ছিল ছদ্মবেশ। তিনি আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন—কোথা থেকে এসেছি তা-ও জানতে চাইলেন। এই রকম পরিস্থিতির সম্ভাবনার কথা আমরা আগেই ভেবে রেখেছিলাম আর তার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম। আমরা জানতাম, এই জাতীয় প্রশ্নের এমনভাবে উত্তর দিতে হবে যে তিনি নিজেই গোপনতার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন।

আমি তাঁকে বললাম—আমরা এসেছি 'বজাউর সওয়াল কিল্লা' থেকে। ওই স্থানেই আমাদের পরস্পরের বন্ধু, সানোবর হুসেন আর সৈয়দ গোলাম মর্তুজা তো মানিক মুহম্মদ উমর খানের সঙ্গে বাস করতেন, বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন—ঘরে যারা ছিলেন তাদের যেতে বল্লেন। তারপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। এইবার আমি আমার পরিচয় দিলাম—সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন; নেতাজীকেও তিনি আলিঙ্গন করলেন।

আমাদের বসতে বলে খাবারের ব্যবস্থা করতে তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন—আসবার সময় নিয়ে এলেন কতকগুলো কাবলী ডালিম। বুঝতেই পারা যাচ্ছিল—আমাদের দেখে তিনি খুশী হয়েছেন, বেশ খানিকটা উত্তেজিতও হয়েছেন।

আমাকে তিনি বললেন—দেরী হোক, কিন্তু কখনও না হওয়ার চেয়ে তা অনেক ভালো! তাঁর কথার তাৎপর্য এই ছিল—বিশ্বযুদ্ধের জন্য সমগ্র বিশ্বেই একটা বিপ্লব চলেছে। এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে কোনো দেশের রাজনৈতিক কাঠামো রাতারাতি বদল হয়ে যেতে পারে। কেউ অধীনতা মেনে নেয় আবার কেউ বা বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করে মুক্তি লাভ করে। তিনি বললেন—এখনই যোগ্য সময় এসেছে যখন আমরা ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিতে পারি।

আমরা ওখানে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসলাম, খোলাখুলি সব কথাই হলো। নেতাজীর সুবিধার জন্য আমরা উর্দুতেই কথাবার্তা বলছিলাম। আমি বুঝিয়ে বললাম—আমাদের আসার প্রধান উদ্দেশ্য যোগাযোগের ব্যবস্থাগুলো আবার নতুন করে পাকা করে নেওয়া আর নেতাজীকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো—কারণ তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশিষ্ট নেতা। আমাদের শক্তি এখন একবার যাচাই করে নেওয়া এবং নতুন করে সংগঠিত করে নেওয়া প্রয়োজন—যাতে আমরা সঙ্কল্প নিয়ে সংগ্রামে অগ্রসর হতে পারি, আর শত্রুর উপরে হানতে পারি শেষ আঘাত।

আমি তাঁকে একথাও জানালাম—আমি আমার লক্ষ্য সাধন করে এসে তাকে জানাবো কি ঘটেছে আর কি ঘটানোর প্রয়োজন। সব শেষে আমি তাঁকে বললাম, আমাদের যাত্রাপথের সবিশেষ তথ্য জেনে নেবার জন্যই ওঁর কাছে এসেছি—সামনের পথে কোথাও কোনো সঙ্কটের আশঙ্কা রয়েছে কিনা, থাকলে সতর্কতামূলক কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে—সে-সব জেনে নেওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য।

হাজি সাহেব বললেন—সেখান থেকে আমরা যেন জালালাবাদে ফিরে যাই ; জালালাবাদ থেকে কাবুলে যাবার জন্য আমাদের একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করতে হবে। পেশোয়ারের দিক থেকে কতকগুলি বাস কাবুল যায়। ট্রাক না পেলে টাঙ্গা ভাড়া করতে হবে। জালালাবাদে নানান্ ধরনের মানুষ বসবাস করে, সুতরাং দরকার না থাকলে ওখানে বেশী দিন থাকা সঙ্গত হবে না।

হাজি সাহেব পরামর্শ দিলেন—কেউ যদি পথে আমাদের প্রশ্ন করে আমরা যেন বলি—'আমরা নকীব সাহেবের লোক'। নকীব সাহেব একজন ধর্মনেতা, জনসাধারণের মধ্যে বহুবিস্তৃত তাঁর প্রভাব—তাছাড়া প্রশাসনেও তিনি আছেন। তাঁকে সবাই ব্রিটিশ পক্ষপাতী বলেই জানে—সুতরাং ওঁর নাম করলে কেউ আর পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

হাজি মহম্মদ আমিনের কাছ থেকে কোনো গাইড নেওয়া আমরা সমীচীন মনে করি নি—তার প্রয়োজনও ছিল না। আমি হাজি

সাহেবকে বললাম, আমি এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসবো—হয়তো সামান্য কিছু দেরীও হতে পারে; সেটা নির্ভর করবে, পরিস্থিতি কি রকম দাঁড়ায় তার উপর।

আমি জানতে চাইলাম, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধে কিভাবে এবং কতখানি সাহায্য তিনি আমাদের দিতে পারেন। হাজি সাহেব বললেন, তিনি চিরকালই ব্রিটিশকে ভারতীয়দের শত্রু মনে করে এসেছেন। এককালে তিনি আন্দোলনের পুরোভাবে ছিলেন—প্রয়োজন হলে আবার এগিয়ে আসবেন। ১৯৩০-এ পেশোয়ার জেলে আমার সঙ্গে ওঁর যে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার স্মৃতি তিনি সযত্নে সঞ্চিত রেখেছেন। তিনি বললেন—জেলে থাকতেই তিনি আমাদের পরিবারের ত্যাগের কাহিনী শুনেছেন—পরে অবশ্য সানোবর হুসেনের কাছেও শুনেছেন। তিনি বললেন, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই অভিযানে—আমার কথা তাঁর কাছে আদেশের মতো। পেশোয়ার বাসী মহম্মদ শাহ্ নামে আমাদের একজন কমরেড এই অঞ্চলের কিছু লোককে জানতেন। প্রত্যেক শীতে তাঁরা এখানে আসতেন—উপলক্ষ্য বাৎসরিক কতকগুলো কাজ শেষ করে যাওয়া। হাজি সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না, তাই আমরা নিজেরাই জালালাবাদ থেকে কাবুল পর্যন্ত আলাদা একজন 'গাইডে'র ব্যবস্থা করেছিলাম। আমাদের হিসেব মতো ২৫শে জানুয়ারীই আমাদের আদ্দা সরিফে পৌঁছবার কথা। মোহম্মদ শাহের সঙ্গে এই ব্যবস্থা ছিল—মোহ্‌কম দীন নামে এক গাইড ঐ তারিখে আদ্দা সরিফে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এই গাইডের সন্ধান করবার জন্য একজন লোক ঠিক করে দিতে আমরা হাজি সাহেবকে অনুরোধ জানালাম—আমাদের মনে হলো, এই গাইড সম্পর্কে খোঁজখবর আমাদের নিজেদের পক্ষে করা ঠিক হবে না।

হাজি সাহেব যে লোকটিকে ব্যবস্থা করে ছিলেন সে আমাদের সঙ্গে আদ্দা সরিফ পর্যন্ত গেল; সেখানে সে সন্ধান করে সেই গাইডকে খুঁজে বার করলো। নেতাজী, মোহ্‌কম দীন ও আমি

পায়ে হেঁটে জালালাবাদ যাত্রা করলাম। জালালাবাদ ফিরে যাবার সময় কোন টাঙ্গা পাই নি—তবে পায়ে-হাঁটা এই পথটা সংক্ষিপ্ত।

আবার জালালাবাদ! পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। মোহ্‌কম দীনকে কিছু টাকা দিয়ে বললাম, কিছু খেয়ে নিতে আর রাতটা কোনো একটা 'চাইখানা'তে কাটিয়ে দিতে। ওকে জানিয়ে রাখলাম, আমরা ট্রাকে জালালাবাদ ছেড়ে যাবো পরদিন ভোরে, অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী। তাই তাকে একটা ট্রাকের খোঁজ করতে হবে আর একটা লিফ্‌ট্ দেবার জন্য গাড়ীর চালকের সঙ্গে সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলতে হবে।

আগের রাত যে ঘরে আমরা কাটিয়েছিলাম—আমাদের হোটেলের সেই ঘরে আমরা গেলাম। মোহ্‌কম দীন সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে দেখা করেছিল কিন্তু পরদিন ভোরে আর ওর দেখা মিললো না। আমরা ওর জন্য প্রতীক্ষা করলাম—হোটেলের মালিক ওকে ভয় দেখিয়েছিল ; সে ভেবেছিল—লোকটা চোর!

ছয়

কাবুলের পথে

সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের ব্যবস্থা করার কোনো আশা ছিল না—জালালাবাদে বেশীক্ষণ থাকাটাও আমরা সঙ্গত মনে করি নি—তাই টাঙ্গাতেই আমরা রওনা হলাম।

ন' মাইল দূরবর্তী সুলতানপুর গ্রামে পৌঁছুলাম। এইখানে এসে আমরা একটু অপেক্ষা করলাম, কেন না অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো করার ইচ্ছে আমাদের একেবারেই ছিল না। শুধু যে টাঙ্গাটা আমাদের নিয়ে এসেছিল তার উপর নজর রাখলাম, যখন দেখলাম টাঙ্গাটা ফিরে যাচ্ছে—আমরা আর একটা টাঙ্গা ভাড়া করে চলে এলাম আমাদের দ্বিতীয় বিশ্রামস্থান ফতেহাবাদে—সুলতানপুর থেকে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে। দেখতে সুন্দর এই ফতেহাবাদ শহর। এখানে একটা ভদ্ররকমের বাজারও আছে।

দুপুরের আহারের জন্যই এখানে থামতে হলো। যেখানে খাওয়া চলে—তার নাম হোটেল, চায়ের দোকানগুলোকে বলা হয় 'চাইখানা'। একটা হোটেলে গিয়ে আমরা চাইলাম পোলাও, মুরগীর মাংস আর 'নান্-ই-খুশ্ক্'। নেতাজী এই ভোজনে তৃপ্ত হলেন—তাঁকে দেখাচ্ছিল প্রফুল্ল আর আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত। একটা ধরা-বাঁধা নিয়মের মধ্যে থেকে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছিল—সেই হিসেবে আশা করছিলাম ২৭ শে জানুয়ারী আমরা কাবুলে যেতে পারবো।

দুপুর কেটে গেল--তবু পেশোয়ারের দিক থেকে আসা কোনো ট্রাকের সন্ধান মিললো না। আমরা পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সামনে দেখলাম 'মিম্লা' হোটেল।

ঢুকে পড়বার একটা অদম্য লোভ জেগেছিল কিন্তু নিরাপত্তার কথা ভেবে এড়িয়ে গেলাম। নিরাপত্তার কথা ভাবতে হয়েছিল, কারণ

দেখে মনে হচ্ছিল এটি সরকারী হোটেলের মতো ফিটফাট—ভ্রমণকারী কর্মচারী, বিদেশী এবং সরকারি অতিথিদের জন্যই তৈরী। মিম্‌লা একটা সুন্দর অঞ্চল—এখানে ওখানে অনেকগুলো বেড়া-দেওয়া ফলের বাগান, সবুজ মাঠ আর চারধারে জলের ধারা। মিমলা সুন্দর, এতে সন্দেহ নেই।

পথের পাশেই কতকগুলো হোটেল ছিল। এর মধ্যেই আমরা ফতেহাবাদ থেকে দশ মাইল পথ চলে এসেছিলাম, সুতরাং বিশ্রাম এবং খাদ্যেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। একটা হোটেলে আমরা ঢুকে গেলাম—একটা 'বাহন' না পাওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে যাবার ইচ্ছা ছিল। এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে গিয়েছিল, অন্ধকারে পায়ে হেঁটে যাওয়াও সম্ভব ছিল না।

আমরা চাইলাম সুরুয়া, নান্‌ আর ভাত। নৈশভোজনটা বেশ হাল্‌কা হবে—নেতাজীর তাই ইচ্ছে ছিল। ওরা নৈশভোজন পরিবেশন করার আগেই আমরা একটা ট্রাককে আসতে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিত্‌ করলাম—চালক গাড়ী থামালো। আমি হোটেলের লোকটিকে বললাম—খাদ্যের সদ্ব্যবহার করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না, কেন না ট্রাক-ভ্রমণের এই দুর্লভ সুযোগ আমরা হারাতে চাই না। খাদ্য তৈরীর করার জন্য আমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু দিতে চাইলাম, কিন্তু সে টাকা নিতে চাইল না —বললো, ঠিক আছে. এ নিয়ে ভাববার দরকার নেই, ঐ খাদ্য সে অন্য কারো কাছে বিক্রী করে দিতে পারবে।

কিন্তু ঘটনার কি আশ্চর্য মিল! এই ট্রাকটিও আগের ট্রাকের মতোই চায়ের বাক্সে বোঝাই! আমরা ট্রাকে উঠে গেলাম। রাত প্রায় ন'টায় আমরা যে জায়গায় পৌঁছুলাম তার নাম—গণ্ডামক। নৈশ ভোজনের জন্য ট্রাক এখানে থামানো হলো। জায়গাটা কাবুল ও পেশোয়ারের প্রায় মধ্যবর্তী। দু'দিক থেকে যে ট্রাকগুলো আসে—সেগুলো এখানে এসে বেশ কিছুক্ষণের জন্য থামে।

গণ্ডামক-এ 'খুগিয়ানি' নামক উপজাতির বসবাস। পথের দু'পাশে বহু সংখ্যক দোকান আর হোটেল। এইসব হোটেলে বেশীর ভাগ

আসেন গাড়ীর চালক, যাত্রী বা পরিদর্শকের দল। খাবারের জন্য আমরাও ঢুকলাম একটা হোটেলে—চাইলাম মুরগীর মাংস, পোলাও আর নান্-ই খুশ্‌ক্।

প্রায় রাত দশটার মধ্যেই আবার রওনা হলাম ট্রাকে। বুদখক্ পর্যন্ত আমাদের যাত্রাপথের যে অংশ তা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছিল। ট্রাকে এখানে আসতে লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা। পার্বত্য পথটি বিখ্যাত লতাবান্দ্ গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। আমরা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ করছিলাম। তুষারপাতের বিরাম ছিল না আর আমরা বসে ছিলাম চায়ের বাক্সের উপর একটা খোলা ট্রাকে। দীর্ঘ নৈশযাত্রার শেষে আমরা 'বুদ্‌খক'-এ এলাম ভোর-রাতে প্রায় চারটেয়।

বুদ্‌খক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে সরকারের শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীরা এসে পরীক্ষা করে থাকেন। যেসব বিদেশী পাসপোর্ট নিয়ে আসেন তাঁদেরও কাগজপত্র এখানে পরীক্ষা করে দেখা হয়। অন্য সব যাত্রীদের নাম ও ঠিকানা এখানে লিখিয়ে নিতে হয়—এটি আফগান সরকারের নির্দেশ। এ সবই আমরা জানতাম আর এর জন্য প্রস্তুতও ছিলাম।

আমি নেতাজীকে অনুরোধ করেছিলাম চালকের সঙ্গে যেতে, কারণ রেজিস্টারে তাদের নাম লেখাবার দরকার হয় না। আমি যখন দেখলাম নেতাজী চালকের পিছনে পিছনে হোটেলে গিয়ে ঢুকেছেন তখন আমি অন্য যাত্রীদের সঙ্গে নাম লেখাতে গেলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, যে কর্মচারী এই ব্যাপারে এসেছিলেন তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—যাত্রীদের নাম-ঠিকানা লিখে নেবার জন্য আর কেউ সেখানে ছিল না। আমি শুনলাম, কে যেন বলছিল—যখন নাম লিখে নেবার কেউ নেই তখন পার হয়ে চলে যাওয়াই ভালো। সবাই গেটের দিকে অগ্রসর হলো।

আমি নেতাজীর সঙ্গে মিলিত হলাম হোটেলে। আমাদের ট্রাকের অন্য সব যাত্রীও সেই হোটেলেই এলেন। আমরা চা খেয়ে একটু ঘুমের আশায় মেঝের উপরে শুয়ে পড়লাম অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে।

বুদ্‌খকের ব্যাপারটা এই ভাবে শেষ হওয়ায় আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। আমাদের মনে ভয় ছিল ওখানকার পরীক্ষাটা খুবই কঠোর হবে। রাতের এই সময়টাই ছিল বাধা লঙ্ঘন করে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল। নেতাজী আনন্দে হাসছিলেন—তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা শেষ 'পরীক্ষা কেন্দ্র'টি বিনা বাধায় পার হয়ে এসেছি।

বুদ্‌খক জায়গাটি ফলের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত। বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে এইটিই একমাত্র স্থান যেখানে খুবই ভালো জাতের 'সর্দা'র চাষ হয়। 'সর্দা'র জন্য আফগানিস্তানের নাম আছে—এখানকার প্রিয় 'সর্দা'।

কাবুলে পৌঁছিতে আমাদের আর তেরো মাইল মাত্র বাকী। ভোর আটটার সময় চালক জানালো—এইবার ট্রাক ছাড়বে। যাত্রীরা উঠে পড়লো—কিন্তু বাকী পথটুকু ট্রাকে যেতে আমাদের ইচ্ছে ছিল না, কেননা ট্রাকটাকে এখনও শুল্ক বিভাগীয় পরীক্ষা কেন্দ্রের বাধা অতিক্রম করতে হবে। তাছাড়া ধরেই নেওয়া হবে ট্রাকে যাত্রীরা দূর থেকে আসছে—সেই দূরবর্তী স্থান পেশোয়ারও হতে পারে। আর কোনো তদন্তের সম্মুখীন হতে আমরা চাচ্ছিলাম না, কেন না সেই তদন্তের চেহারাটা আমাদের সবিশেষ জানা ছিল না। তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম 'স্থানীয় লোক' বলে।

কাবুলে যাবার জন্য আমরা একটা টাঙ্গা ঠিক করলাম প্রায় ন'টার সময়। এখানকার স্থানীয় লোকেরা টাঙ্গায় চড়ে কাবুলে যাবে—ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক।

২৭শে জানুয়ারী বেলা এগারোটায় আমরা পৌঁছুলাম কাবুল সীমান্তে ; পথে কোনো তদন্তের খোঁচা ছিল না। তারপর কাবুলের 'লাহোরী গেট্'-এ আমরা টাঙ্গা থেকে নামলাম।

কাবুল শহরটা গড়ে উঠেছে পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকার মধ্যে। কাবুল নদী শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত—নদীর দুই তীরে বাজার। পাহাড়ের নীচে এই শহর বহু বছর আগের তৈরী একটা

সুবৃহৎ প্রাচীর দিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত। পাহাড়ের উপরে শহরের তিন দিক ঘিরে এই প্রাচীন প্রাচীরটি তৈরী করা হয়েছে বাইরের আক্রমণ থেকে নগররক্ষিবাহিনীর আত্মরক্ষার একটি আশ্রয় হিসেবে। চারদিকে প্রাচীরের মধ্যেই নির্মিত রয়েছে কতকগুলি গেট—কিন্তু পাহাড়ের উপরে গেটের কোনো ব্যবস্থা নেই।

এখন আমাদের থাকবার একটা আশ্রয় খুঁজে নেওয়া দরকার। দর্শনার্থী অতিথি, ভ্রমণকারী আর বিদেশী লোকদের জন্য কয়েকটা ভালো হোটেল আছে। কিন্তু এই সব হোটেলে যাওয়া আমরা নিরাপদ মনে করলাম না। সাধারণ একটা সরাইখানার খোঁজ করলাম—যেখানে সাধারণ মানুষ থাকতে পারে। লাহোরী গেটের মধ্যে ঢুকে একটু ভিতরের দিকে গিয়ে একটা সরাইখানার সন্ধান পেলাম—সেই সরাইতে সাধারণত উটওয়ালারা এসে তাদের উট নিয়ে থাকে। কয়েকটা একলা থাকবার ঘরও আছে—কয়েকটি খাট নিয়ে বড় শোবার ঘরও আছে। এটি কাঁচা ইঁটে তৈরী একটা দ্বিতল দালান। এই সরাইতে কোনো খাবার দেওয়া হতো না। দ্বিতলের একটি ঘর আমরা ভাড়া করলাম—প্রত্যেক দিনের ভাড়া প্রায় এক টাকা– আফগানী মুদ্রায় পাঁচ টাকা। সরাই-এর বিপরীত কোণে একটা চায়ের দোকান থেকে আমরা চা আনতাম। আমরা শুধু দু'টো খাট পেয়েছিলাম সেই ঘরে—তাই বিছানার জিনিসপত্র কিনবার জন্য আমরা বাজারে গেলাম। হোটেলের মালিক আমাদের জন্য জ্বালানি কাঠ কিনে দিয়েছিল; আমরা কিছু কয়লা কিনে নিলাম ঘরটাকে গরম রাখার জন্য। কিছু সস্তা রেশমের পোশাক কিনে নিলাম নেতাজীর জন্য—যে ধরনের পোশাক শহরের সাধারণ লোকেরা পরে।

থাকবার এই সব ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবার পর আমরা কিছু খেতে বেরিয়ে পড়লাম। তখন বেলা প্রায় দেড়টা, বেশ পরিচ্ছন্ন একটা হোটেল খুঁজে বার করলাম—এখানে বেশ বড় সাদা গোলাকার পাত্রে সাজানো গরম হালুয়া আর কাটলামা, অর্থাৎ ঘিয়ে ভাজা বেশ বড় বড় বহুস্তর বিশিষ্ট পরোটা।

লোভনীয় সন্দেহ নেই! দোকানে ঢুকে গিয়ে আমরা চাইলাম—প্রত্যেকের জন্য আধপোয়া হালুয়া আর আধপোয়া কাটলামা।

অর্ডারি খাদ্য যখন দেওয়া হলো তখন পরিমাণ দেখে চমকে উঠলাম। প্রত্যেকটা প্লেটে আমরা যা চেয়েছিলাম বলে ভেবেছিলাম—তার প্রায় চারগুণ খাদ্য! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল কাবুলের এক সের ভারতের প্রায় আট সেরের মতো। চরক ভিত্তিতে (আফগান সেরের এক চতুর্থাংশ) হিসেব করলে প্রত্যেকটি খাদ্যের ঐ অর্ধ পোয়া যা আমাদের দেওয়া হয়েছিল তা ভারতীয় এক পোয়ার চেয়ে ঢের বেশী!

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ভুলটা সংশোধন করে নিলাম—পাছে ওরা আমাদের অজ্ঞ বিদেশী বলে মনে না করে। পরিবেশককে বললাম, এক প্লেট হালুয়া আর কাট্‌লামা প্যাক করে দিতে। আর একটা প্লেট থেকে দু'টি ছোট প্লেটে সাজিয়ে দিতে বললাম ওখানে বসে খাবার জন্য। স্থির করলাম, খুব তাড়াতাড়ি ওখানকার নানারকম রীতিনীতি ও প্রথা যা জানিনা তা আয়ত্ত করে নিতে হবে—যাতে ভবিষ্যতে আর এরকম ভুল না হয়।

সেই কেনা জিনিসপত্র নিয়ে এলাম সরাইখানায়—আমাদের ঘরে। এর মধ্যে ছিল কিছু মোমবাতি, কেন না সরাইতে বৈদ্যুতিক আলো ছিল না।

বিকেলে যখন আমরা জিনিসপত্র কিনছিলাম তখন রেডিও-প্রচারিত একটি সংবাদ আমাদের কানে এলো—'সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর কলকাতার বাড়ী থেকে অন্তর্ধান করেছেন—তাঁর সন্ধানে ব্যাপক তল্লাসী চালানো হচ্ছে।' পরে সন্ধ্যায় সরাইখানার নিভৃত সেই ঘরে নেতাজী আমাকে বলেছিলেন কিভাবে তিনি কলকাতার বাড়ীতে থেকে অন্তর্ধানের পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁকে সীমান্ত পার করে দেবার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেছে তখন ছদ্মবেশের সুবিধের জন্য তিনি দাড়ি রাখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সন্দেহের

উদ্রেক করতে পারে বলে প্রকাশ্যে দাড়ি রাখা সম্ভব ছিল না। তিনি প্রচার করে দিলেন তিনি বন্ধ ঘরে মৌনব্রত অবলম্বন করছেন এবং ধ্যানে রত আছেন, তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। নেতাজীর গভীর নির্ভরতা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল তাঁর বৌদির (শরৎচন্দ্র বসুর স্ত্রী) উপর। তিনি তাঁকে মায়ের মতোই মনে করতেন।

তিনি বললেন, বিপদের মুহূর্তে তিনি তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ চাইতেন। তাঁকে, শরৎচন্দ্র বসুকে আর তাঁদের ছেলে শিশির বসুকে —তিনি মনের কথা খুলে বললেন। তাঁদের সাহায্যেই তিনি পুলিশকে ধোঁকা দিতে পেরেছিলেন। প্রায় আটদিন তিনি একটি আলাদা ঘরে আত্মনির্বাসনে ছিলেন—সেই সময়ের মধ্যেই তাঁর ছদ্মবেশ ধারণ করার মতো দাড়ি গজিয়েছিল।

তিনি কলকাতা ছেড়েছিলেন ১৬ই জানুয়ারী রাত্রে; কিন্তু এই ধারণাটা ঠিকই রাখা হয়েছিল যে তিনি তাঁর ঘরেই আছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি থাকার সময় যেভাবে রোজ তাঁর ঘরে খাবার যেতো তেমনি যেতে থাকবে। ২৭শে জানুয়ারী তাঁর কলকাতায় কোর্টে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল। এর একদিন আগে, আর গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী নেতাজীর কলকাতা ছাড়বার দশ দিন পরে, প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হলো যে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। সেদিন রাত্রে নেতাজী বলেছিলেন—সব ব্যাপারটাই তাঁর পরিকল্পনা মতো হয়েছে—তিনি এই দশ দিনের মধ্যেই সীমান্ত পার হয়ে যেতে পারবেন, আর পুলিশ ও সি. আই. ডি সর্বত্র তাঁকে খুঁজে বেড়াবে না —এই পরিকল্পনাই ওঁর ছিল। যেদিন কাবুলে পৌঁছুলাম সেদিন বিকেল বেলা আর তার পরদিনও শহরটা ঘুরে বেড়ালাম—দেখে বেড়ালাম ওখানকার বাজার, বিভিন্ন দূতাবাস এমনকি আরও সব জায়গা যাতে এইসব খুঁটিনাটির সঙ্গে অপরিচয় থাকার জন্য কোনো অসুবিধেয় পড়তে না হয়। আমাদের সরাইকে কেন্দ্র করেই আমরা এদিক ওদিক দেখে বেড়ালাম। এখান থেকে আমরা 'পুল-ই-খিশ্‌তি', লবে দর্যা. বাজার-ই-শাহী প্রভৃতি বাজার ঘুরে গেলাম 'বাবর' দেখতে। ওখানে মোগল সম্রাট বাবরের একটি

জাঁকালো সমাধি আছে—চারধারে সুন্দর বাগানে ঘেরা। তারপর দেখলাম আলি আবেদ, তারপর নতুন কাবুল, রাশিয়ার দূতাবাস, শুল্ক বিভাগের অফিস 'গুমরক', শোর বাজার—এমনি আরও অনেক জায়গা।

এমনি ঘুরে বেড়াবার সময়েই নেতাজী একদিন লক্ষ্য করলেন এক ফটোগ্রাফারকে—বাজার-ই-শাহী যেখানে লবে দর্যা নামক বাজারের সঙ্গে মিলেছে সেইখানে। তিনি প্রস্তাব করলেন, যে-পোশাকে আমরা আছি, সেই পোশাকেই আমাদের দুজনের একটা ফটো তোলা হোক। আমি সবিনয়ে জানালাম—ঠিক ঐ মুহূর্তে এই রকম দুঃসাহস করা ঠিক হবে না। ভবিষ্যতে আরও অনেক সুযোগ আসবে যখন আমাদের দু'জনের ফটো তুললে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না।

আমি বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম যে, ঐ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাগজে নেতাজীর ছবি নিশ্চয়ই ছাপা হয়েছে। এমন কি সাধারণ লোকেও তাঁর ছবি দেখে তাঁকে চিনে নিতে পারবে। তাঁর ছবি আফগানিস্তানের কাগজেও খুব সম্ভবত ছাপা হয়ে থাকবে। যখনই কোনো ফটোগ্রাফার ছবি তোলে—বা 'ডেভেলপ' করে সে নিশ্চয়ই ছবির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে, তাছাড়া ছবির 'নেগেটিভ' তো তার কাছে থাকবেই। সে সুভাষ বসুকে চিনে নিতে পারবে পদে পদে এই সম্ভাবনাই তো রয়েছে। সে যে-কোনো সময়ে কাগজে দেখা ছবির সঙ্গে নিজের তোলা ছবি মিলিয়ে দেখতে পারে।

আমি বেশ জোর দিয়েই বললাম—ঐ সময়ে আমাদের ফটো তুলে কোনো অনাবশ্যক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া মানুষ হিসেবে ফটোগ্রাফার বিশ্বাসযোগ্য হবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। পুলিশের সঙ্গে বা ব্রিটিশ সি. আই. ডি র সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকতে পারে—ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা আরও বেশী।

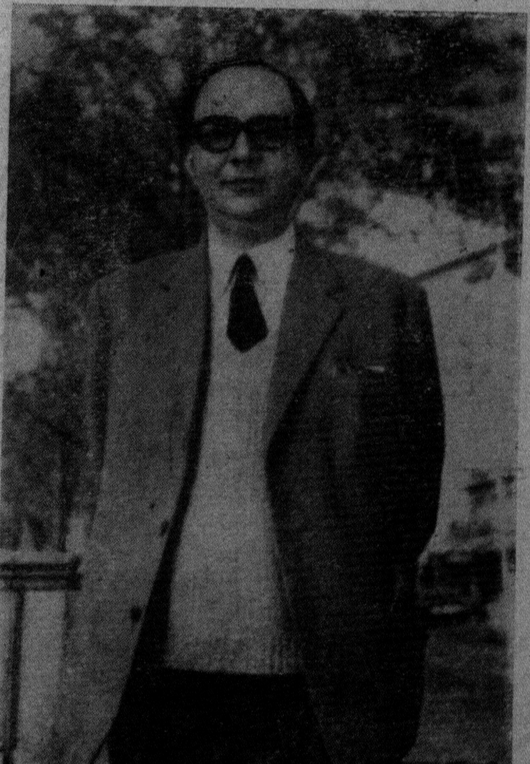
একথা ঠিক যে ফটো তোলার একটা সামান্য ইচ্ছা থেকে এত বড় একজন নেতাকে নিবৃত্ত করার জন্য আমার খুবই দুঃখ হচ্ছিল। আমার এখন মনে পড়ছে কিভাবে বাঙলার এই মহান পুরুষ অজস্র দুঃখকে বরণ

করে নিয়েছেন, কিভাবে আমার সঙ্গে এমন সব দেশের কঠিন পথ পার হয়ে এসেছেন—যে-দেশের ভূপ্রকৃতি, ভাষা, প্রথা বা জীবনযাত্রার রীতি-নীতি কিছুই তিনি জানতেন না। যিনি স্বচ্ছন্দ এবং স্বচ্ছ জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত, তিনি কোনো খাদ্য বিনাই রয়েছেন। একমাত্র অনির্বাণ দেশপ্রেমের বহ্নিই তাঁকে এই অজানা অভিযানে প্রতি পদক্ষেপে উজ্জীবিত রেখেছিল।

আমার খুবই আনন্দ হলো এই দেখে যে, আমার পরামর্শ নেতাজী বেশ প্রসন্ন মনেই মেনে নিলেন। তিনি বললেন, অন্ধকারের এই গুপ্ত জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁর নেই—এর খুঁটিনাটি বিষয়-গুলিও তিনি জানতেন না। সুতরাং এই জাতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা আছে এমন এক নিপুণ পরিচালককে সঙ্গী পেয়ে তিনি সত্যিই আনন্দিত।



সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু; সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান-পরিকল্পনার আগাগোড়া তিনি জানতেন।



শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র শিশিরকুমার বসু; এলগিন রোডের বাড়ী থেকে গোমো রেলষ্টেশন পর্যন্ত ইনি পথপ্রদর্শক হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গী ছিলেন।



উপজাতীয় বেশে ভগতরাম তলোয়ার ; এই বেশেই ইনি উপজাতীয় অঞ্চলে চলাফেরা করতেন ।



আফগান বেশে ভগতরাম তলোয়ার ; এই বেশেই ইনি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কাবুলে ঘুরে বেড়াতেন ।

সাত

কাবুলের কোলে

শহরটির সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেবার জন্যই আমরা ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারী সর্বত্র ঘুরে বেড়ালাম।

আমাদের কাবুলে আসার উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত দূতাবাসের সাহায্য নিয়ে নেতাজীকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পালাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া। এর জন্য প্রথম কাজ---কথাবার্তার জন্য সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন। সেই সময় সোভিয়েত দূতাবাসের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। সুতরাং আফগান সরকারের সন্দেহ সৃষ্টি না করে দূতাবাসের কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ ছিল না—তাছাড়া তখন একে অন্যের কাজের উপর বা কূটনৈতিক চাল-চলনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে—সুতরাং যোগাযোগ করার ব্যাপারটি সত্যই দুরূহ হয়ে উঠলো।

এক এক সময় মনে হতো. দূতাবাসের দরজা দিয়ে আগে থেকে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা না করে জোর করে ভিতরে ঢুকে যাই। কিন্তু কাজটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক—কারণ গেটের প্রহরী আফগান পুলিশ ছাড়া ভিতরে রুশীয় প্রহরীরাও ছিল। তাছাড়া, আমরা কাছাকাছি কয়েকজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকেও ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম—ওরা হলেন অন্যান্য দূতাবাসের প্রতিনিধি। রুশীয় দূতাবাসে কারা আসছেন, কারা যাচ্ছেন তাই লক্ষ্য করছেন। এ বিষয়ে কোনো হঠকারিতা করা সঙ্গত মনে করলাম না। কেন না, সোভিয়েত কূটনৈতিক কর্মচারীদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগের আগেই কেউ আমাদের সন্দেহ করুক এটা আমরা একেবারেই চাই নি।

আমরা সাধারণ আফগানের পোশাকে সজ্জিত ছিলাম। কাবুলে আমাদের কিছুকাল কাটাতে হবে, এই জন্যেই এই বেশ। এতে

কেউ সন্দেহ করবে না। অবশ্য এই বেশ দূতাবাসে প্রবেশ করা বা কর্মচারীদের সঙ্গে—যোগাযোগ কোনোটার পক্ষেই যোগ্য ছিল না।

শেষ পর্যন্ত আমরা আগে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা না করে দূতাবাসে প্রবেশের ভাবনা একেবারেই বাদ দিয়ে দিলাম। নেতাজীর অভিমত এই ছিল যে, আফগান সরকার ব্রিটিশের প্রভাবান্বিত সুতরাং সব বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে এই সরকার অনায়াসে আমাদের ব্রিটিশের হাতে তুলে দিতে পারে। অবশ্য আমি ভিন্নমত পোষণ করতাম—আমার ধারণা ছিল, সেই ক্ষেত্রে আফগান সরকার আমাদের খুশীমতো যে কোনো দেশে চলে যাবার স্বাধীনতা দেবে। তবু এই ব্যাপারে আমি তাঁর মতই মেনে নিলাম।

২৮ শে জানুয়ারী থেকে আমরা লক্ষ্য করতে লাগলাম—দূতাবাসে যাচ্ছেন অথবা দূতাবাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন যেসব সোভিয়েত কর্মচারী তাঁদের দিকে; লক্ষ্য রাখলাম মুখ দেখে তাঁদের সনাক্ত করা যায় কিনা-এই আশায়। আমাদের ইচ্ছে ছিল, সনাক্ত করতে পারলে, যখন তাঁরা শহরের মধ্যে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করবেন—তখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে যোগাযোগের ব্যবস্থাটা ঠিক করে নেব।

২৯শে জানুয়ারী আমরা লক্ষ্য করলাম একজন কর্মচারী দূতাবাস থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসছেন। আমরা কিছুদূর পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করলাম। বাজার 'লবে দর্যার' দিকে যে পথটা চলে গেছে সেই পথে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতেও চেষ্টা করলাম। আমি তাঁর সঙ্গে ফার্সিতে কথা বললাম—তাঁকে জানালাম, আমরা রাষ্ট্রদূতের কাছে লেখা একটি চিঠি ওঁকে দিতে চাই—উনি সেটা রাষ্ট্রদূতের হাতে দিয়ে দেবেন। এই চিঠিতে নেতাজী তাঁর পরিচয় দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎপ্রার্থী কারণ তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চান। দুর্ভাগ্যবশত আমরা কোনো সাড়া পেলাম না। সেই সোভিয়েত কর্মচারী রুশীয় ভাষায় কিছু বললেন, আমরা তার অর্থ বুঝলাম না। তিনি চলে গেলেন।

৩০শে জানুয়ারী আমরা আবার সোভিয়েত দূতাবাসের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালাম। কাবুল নদীর দক্ষিণ তীরে কাবুল বাজার রোডের উপর এই দূতাবাস—চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকটা খোলা জায়গা জুড়ে। দূতাবাসের সেই দোতলা অট্টালিকা বেশ বিস্তৃত—গঠনশিল্পও প্রাচীন ধরনের। বছরের এই সময়টা সমস্ত শহরই যেন বরফের কম্বল দিয়ে ঢাকা। খুবই ঠাণ্ডা ছিল সেদিন। দূতাবাসের বিপরীত দিকে নদীর তীরে রোদের মধ্যে আমরা বসে রইলাম। সেখান থেকে গেট দেখতে পাচ্ছিলাম—দূতাবাস থেকে কারা আসছেন বা কারা দূতাবাসে যাচ্ছেন সবই আমাদের নজরের মধ্যেই ছিল। কোনো লোকের পক্ষেই সেই জায়গায় রোদে বসে থাকা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম দু'জন রুশীয় মহিলা দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসছেন। আমরা লক্ষ্য রাখলাম, তারপর তাঁদের অনুসরণ করে চলে এলাম বাজার 'লবে দর্যা'তে। দেখলাম, তাঁরা গতি মন্থর করে এনেছেন, হয়তো কোনো দোকানে ঢুকবেন। এইবার সুযোগ পেয়ে আমরা তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করলাম। আমি ফার্সিতে কথা বললাম—শান্তভাবে তাঁদের জানালাম যে, আমরা রুশীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে চাই কিন্তু সফল হতে পারি নি—তাঁদের আরও বললাম—আমাদের একটি বার্তা রাষ্ট্রদূতের কাছে বহন করে নিয়ে যেতে, এইটুকুই আমাদের নিবেদন। লিখিত বার্তাটি ওঁদের কাছে দিতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তাঁরা শুধু মাথা নাড়লেন, কিছুই বললেন না—তারপর চলতে শুরু করে দিলেন। আগের দিন রুশীয় কর্মচারীর হাতে যে বার্তা দিতে চেয়েছিলাম—এটা ছিল তাই। দুটি ক্ষেত্রেই দূতাবাসের কর্মচারীদের এই জাতীয় মনোভাব দেখে আমাদের এই ধারণা দৃঢ় হলো যে, তাঁদের উপর নির্দেশ আছে যাতে তাঁরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কোনো ব্যাপারে বা আলোচনায় জড়িয়ে না পড়েন।

খুব নিরাশ হয়েই আমরা সরাইতে ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা, চারদিক ভীষণ ঠাণ্ডা। আমাদের ছোট ঘরটাতে আমরা আগুন জ্বাললাম। নেতাজীর সঙ্গে আমি একই খাটিয়াতে বসলাম যাতে

নিভৃতে দুজনে কথাবার্তা বলতে পারি আর যাতে অন্য কেউ তা না শোনে।

সমস্ত পরিস্থিতিটাই আমরা একবার পর্যালোচনা করে দেখলাম—এখন কোন পথে যেতে হবে তা নিয়েও আলোচনা হলো। আমি জানতাম, বাজার-ই-শাহীতে সোভিয়েত দূতবৃন্দের একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান রয়েছে—দূতাবাস থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে। ভারত ছেড়ে আসবার আগে আমি এই খবরটি সংগ্রহ করেছিলাম। আমরা স্থির করলাম বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করায় বিপদের ঝুঁকি কম, কেননা আফগান জাতীয় লোকেরা ব্যবসার প্রসঙ্গেই ওদের অফিসে প্রায়ই যায়য়াত করে থাকেন।

কিন্তু তখন আমরা খুবই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি বাইরে গিয়ে বাজারের হোটেল থেকে কিছু ভাজা মাছ, আফগানী 'নান্' আর মাংসের 'স্টু' নিয়ে এলাম। সাধারণ আফগান জাতীয় লোকদের থেকে আমাদের খাদ্য একটু পৃথক ধরনের ছিল বলেই সন্দেহ এড়াবার জন্য আমরা কাছাকাছি কোনো রেস্তোরাঁয় যাই নি।

আমরা নৈশ ভোজন শেষ করলাম; ঘুমুতে যাবার আগে কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হলো আমাদের মধ্যে। আমাদের বাধা ছিল অনেক। নেতাজীকে একা এই সব কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে পাঠানো সম্ভব ছিল না। তার দুটো কারণ ছিল। প্রথমত ভাষা-সমস্যা; এই সোভিয়েত কর্মচারীরা সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ইংরেজী জানতেন না—যদিও ফরাসীতে তাঁরা কথাবার্তা চালাতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, এতে নেতাজী সনাক্ত হতে পারেন, এই রকম একটা ঝুঁকি ছিল; সেই ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

যদিও এই সব লোকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ভার আমার উপরেই ছিল তবু মারাত্মক বা জটিল কোনো অনর্থের সৃষ্টি না ক'রে ফেলি—সেই সম্পর্কে নেতাজী নিশ্চিন্ত হতে চাইতেন। কেননা, আমাকে যদি গ্রেপ্তার করা হয়, নেতাজী একলা পড়ে যাবেন—তখন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা ভাবাই যায় না। সমস্যাটি আমাদের পক্ষে খুবই জটিল তবু অনলস চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। যেভাবেই হোক, যত শীঘ্র সম্ভব এই যোগাযোগের ব্যাপারটা শেষ করে ফেলতে হবে কেননা, দীর্ঘকাল ঐ সরাইতে থাকা মোটেই নিরাপদ ছিলনা—ধরা পড়তে কতক্ষণ? যেকোনো ভাবে এই রকম একটা পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নেতাজী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ধরা পড়লে আফগান সরকার তাঁকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে আর তাতে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

পরদিন, অর্থাৎ ১৯৪১-এর ৩১শে জানুয়ারী, আমরা শহরে ঘুরে এলাম—সোভিয়েত বাণিজ্য-সংস্থার অফিসটা কোথায় তা দেখে এলাম। সারাদিন আমরা সেই অফিসের উপর নজর রাখলাম—কারা সেই অফিসে যাচ্ছে, কারা বেরিয়ে আসছে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এইটুকু স্থির করা—সাধারণ আফগানের পক্ষে ঐ অফিসে যাওয়া স্বাভাবিক এবং রীতিসম্মত বলে গণ্য হবে কি না। আফগানের ছদ্মবেশেই আমরা ছিলাম। অফিসটি ছিল বাজার-ই-শাহীতে—একটি সাধারণ দোতলা বাড়ী। আমরা ঠিক করলাম, আমরা যদি সোভিয়েত বাণিজ্য-প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করতে যাই, তবে সেটা অস্বাভাবিক হবে না।

পরদিন, ১লা ফেব্রুয়ারী, আমরা সেই অফিসে গেলাম। কাছেই একটা ফলের দোকান ছিল। আমি দোকানীকে প্রশ্ন করলাম—সোভিয়েত বাণিজ্য-প্রতিনিধির সঙ্গে কিভাবে দেখা করা যায়।

ঘটনাচক্রে ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রতিনিধি তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে বাজারের দিকে আসছিলেন। দোকানী তাঁর দিকে দেখিয়ে বললো, উনিই বাণিজ্য-প্রতিনিধি।

কিছুদূর পর্যন্ত আমরা তাকে অনুসরণ করলাম তারপর সময় বুঝে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তাঁকে বললাম—আমরা ভারত থেকে এসেছি, সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চাই। এই বলে আমাদের একটি বার্তা রাষ্ট্রদূতের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ জানালাম। তিনি জানালেন, এই ব্যাপারে আমাদের সোজাসুজি যেতে হবে সোভিয়েত দূতাবাসের অফিসে। এই উত্তরে আমরা অত্যন্ত নিরাশ

হয়ে পড়লাম। ভেবে দেখলাম, এই রকম উত্তরের পিছনে কতকগুলো কারণ থেকে থাকবে। কয়েকদিন আগে সোভিয়েত দূতাবাসের সেই কর্মচারী তারপর সেই দু'জন সোভিয়েত মহিলার কাছে আবেদন জানিয়েও যে কারণে সাড়া পাই নি, বাণিজ্য-প্রতিনিধির বেলায় হয়তো সেই কারণ ছিল। তাছাড়া বাণিজ্য-প্রতিনিধি হয়তো ভেবে থাকবেন, সোভিয়েত দেশভ্রমণে উৎসাহী হয়ে আমরা 'ভিসার' জন্য উমেদারী করতে এসেছি—আর ভিসার ব্যাপারটার জন্য দূতাবাস ছাড়া গতি নেই।

এই চেষ্টাও আমাদের ব্যর্থ হলো—তাই মনে কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পেলাম না।

আমাদের অবস্থাটা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল, নেতাজীও মাঝে মাঝে মন-মরা হয়ে পড়তেন কিন্তু কখনও মেজাজ হারাতেন না। একটু হেসে অনেক সময় প্রশ্ন করতেন—'রহমৎ খাঁ, অব্ ক্যা হোগা?' আমি বরাবরই আশাবাদী ছিলাম—আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাদের গ্রেপ্তার করলেও আফগান সরকার ব্রিটিশের হাতে তুলে দেবে না—বরং আমাদের ইচ্ছেমতো স্থানে চলে যাবার সুবিধা দেবে। কারণ, এইটেই পাঠান-প্রথা—তাছাড়া আফগানিস্তানের ব্যাপারে ভারতের সহানুভূতি সম্পর্কে আফগান সরকার সম্পূর্ণ সচেতন, আর নেতা হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুর গুরুত্বও তারা জানেন।

শহরে ঘুরে বেড়াবার সময় এবং সরাইতেও আমরা গভীরভাবে আলোচনা করতাম—আমাদের পরবর্তী কর্মধারা কি হবে তাই নিয়ে। আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব। বিকল্প পথ নিয়ে আমরা ভাবতে লাগলাম—অন্যান্য দেশের দূতাবাসগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা চিন্তা করলাম, সীমান্ত পার হয়ে নেতাজীকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছে দেবার কাজে তাদের কেউ কোনোরকম সাহায্য করতে পারেন কি না—তা নিয়েও আমরা আলোচনা করতে লাগলাম।

তখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জার্মানী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আর এই

ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য নেতাজীর সংগ্রাম। উদ্দেশ্য এক দিক দিয়ে সমান—দু'টি সংগ্রাম একই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। স্বভাবতই এটি জার্মান-স্বার্থের অনুকূল। এদিকে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরস্পরের একটা 'অনাক্রমণ চুক্তিও' তখন হয়ে গেছে। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, জার্মানী নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করতে সম্মত হবে—কেন না সাহায্য করাই তাদের স্বার্থ। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম চেষ্টা করে জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

জার্মান দূতাবাসে যাবার আগে আমাদের কর্মপন্থা একবার আগাগোড়া ভেবে ঠিক করে নিলাম। আমরা দুজনেই সেখানে যাব; দূতাবাসে প্রবেশ করবেন নেতাজী একা—তিনি প্রবেশ করতে পারলেন কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ফিরে আসবো সরাইতে। যদি সারাদিনের মধ্যে তাঁর কাছ থেকে বা তাঁর বিষয়ে কোনো খবর না পাই তবে ভেবে নেব, সবই ঠিকমতো হয়েছে এবং জার্মান দূতাবাস নেতাজীকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপদে তাঁকে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও নিয়েছেন। যেহেতু, সেইক্ষেত্রে সেইদিনই হবে নেতাজীর সঙ্গে আমার শেষ ভ্রমণ, কারণ আমি তখন ফিরে আসবো ভারতে—সেইহেতু জার্মান দূতাবাসে যাওয়ার আগে ভারতের জন্য কতকগুলো প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও বার্তা রাখলেন। তিনি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন—বাঙলায় একটি চিঠিও লিখলেন। এই প্রবন্ধ ও চিঠি দিলেন আমাকে—কলকাতায় তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিভাবে কলকাতায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে সে সম্পর্কেও তিনি সবিশেষ নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে বললেন আমি যেন সোজাসুজি কলকাতায় না যাই; বর্ধমানে নেমে আমি যেন একটা লোকাল ট্রেনে কলকাতায় চলে আসি। আমাকে থাকতে হবে কলকাতার একটা হোটেলে। শরৎচন্দ্র বসু একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার—মক্কেলরা সাধারণত সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। মক্কেলের বেশেই ট্যাক্সিতে চেপে ১নং উডবার্ন পার্কে গিয়ে আমি যেন তাঁর

ভাইপো ডক্টর শিশিরকুমার বসুর খোঁজ করি। তিনি সেখানে না থাকলে অবশ্য শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গেই দেখা করে প্রবন্ধ আর চিঠি তাঁর হাতে দিতে হবে—তাঁর কাছে বলতে হবে অন্তর্ধানের সমগ্র কাহিনী। তিনি আর একটি চিঠি আমাকে দিলেন সর্দার শার্দূল সিং কবীশরের হাতে দেবার জন্য।

জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগের সফলতা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট আশান্বিত ছিলাম। আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল জার্মানী নেতাজীকে আশ্রয় দেবে—তাই আশ্রয়লাভের পরে আমাদের দু'জনের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা কিরকম হবে সে বিষয়ে আগেই উপায় ঠিক করে নিলাম। ব্যবস্থা হলো, শুল্ক বিভাগীয় অফিসের (গুমরক) কাছে কাবুল নদীর সেতুটির কাছে ঐ দিনই ৪-৪৫ মিনিটে আমি এসে দাঁড়াবো। নেতাজী তাঁর দূত পাঠাবেন, নয়তো নিজেই আসবেন—তখন কোনো বিশেষ বার্তা বা নির্দেশ আমাকে দিতে হলে দেবেন।

পরদিন, ২রা ফেব্রুয়ারী, আমরা সরাই থেকে বেরিয়ে পড়লাম—জার্মান দূতাবাস কোথায় তা দেখে আসার জন্য। যে ক'দিন আমরা ওখানে ছিলাম—সেই দিনগুলিতে শহরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন ও ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমরা অন্য অনেক দূতাবাস দেখেছিলাম কিন্তু জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি। কারও কাছে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার মধ্যে কোনো বিপদের আশঙ্কা আছে বলে আমাদের মনে হয় নি। তাই একজন দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম জার্মান দূতাবাসটি কোথায়। সে বললো সেতু পার হয়ে সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে এসে ডান দিকে ঘুরতে হবে—সেখানে পথটা বেঁকে গেছে। সেই পথে জাপানী দূতাবাস পার হয়েই জার্মান দূতাবাস। আমরা সোভিয়েত দূতাবাসে যাবার পথটা খুব ভালো করেই জানতাম। তাই ওখানে পৌঁছুতে আমাদের সময় লাগলো না।

নদী বরাবর জাপানী দূতাবাস ছেড়ে আসার পরই আমরা লক্ষ্য করলাম নিউ কাবুলের দিক থেকে একটা গাড়ী আসছে—গাড়ীর সামনে পতাকা উড়ছে। দেখলাম, গাড়ীটি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের—

আমাদের সামনেই পথ যেখানে বেঁকে গেছে সেখানে বরফের উপর গাড়ীটা দাঁড়িয়েছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গেই নেতাজীকে বললাম—ইনি সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত—আমাদের ওঁর সঙ্গে কথা বলা উচিত। রাষ্ট্রদূত তখনও গাড়ীতেই বসে ছিলেন ; আমি তাঁর সামনে এগিয়ে গেলাম—গিয়ে বললাম, আমি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। যখন তিনি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন, আমি বললাম, আমরা ভারত থেকে এসেছি—কয়েক পা দূরেই আমার সঙ্গী আছেন—তিনি হয়তো দেশ থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কাহিনী জানতে পেরেছেন—ওঁকে নিরাপদে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠাবার অনুরোধ জানাতেই আমরা তাঁর কাছে এসেছি।

আমি তাঁর সঙ্গে ফারসীতে কথা বলছিলাম—তিনি নিশ্চয়ই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি আমাকে বললেন—আমার সঙ্গীই যে সুভাষচন্দ্র, ছাড়া আর কেউ নন, তার প্রমাণ কি ? আমি তাঁকে বললাম—আমার সঙ্গীর দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখতে—এখন তিনি আফগানের ছদ্মবেশে আছেন। আমি বললাম তিনি নিশ্চয়ই কাগজে বা সাময়িক পত্রে ওঁর ছবি দেখে থাকবেন আমার সঙ্গীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নেতাজীকে লক্ষ্য করলেন—কয়েক ফুট দূরেই তিনি ছিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে থেকে গাড়ীতে উঠে তিনি চলে গেলেন। যে নতুন আশা আমাদের মনে হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল।

এই দিনটিতে আমরা অবশ্য জার্মান দূতাবাসের জন্যই এসেছিলাম, সোভিয়েত দূতাবাসের জন্য নয়। কিন্তু এই সাক্ষাতের পর মনে হলো সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলার পরই জার্মান দূতাবাসের দিকে যাওয়া নিরাপদ নয়। তাই আমরা নিউ কাবুলের দিকে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম—তারপর ফিরে এসে জার্মান দূতাবাসের দিকে পা বাড়ালাম। এই দূতাবাসটি ছিল জাপানী দূতাবাসের ঠিক পিছনেই। এটিরও চার-দিকে বড় প্রাচীর—সামনে বড় গেট—সেখানে আফগান পুলিশ প্রহরী হিসেবে দাঁড়িয়ে। গেটের কয়েক ফুট আগেই আমি থেমে গেলাম।

নেতাজী এগিয়ে গেলেন—প্রবেশ করার জন্য প্রহরীকে ইঙ্গিত করলেন। হাতে একটি আবেদনপত্র নিয়ে আমিও গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য প্রহরী যদি প্রশ্ন করে, আমি বলবো আমার সঙ্গী অসুস্থ এবং কালা। আমি বলবো তেহ্‌রানের জার্মান দূতাবাসে ওর ভাইপো কাজ করেন—অনেকদিন তার কোনো সংবাদ না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি এক আবেদনপত্র নিয়ে এসেছেন যাতে দূতাবাসের মারফৎ তেহ্‌রান থেকে তার ভাইপোর কোনো খোঁজ খবর করা যায়।

কিন্তু প্রহরী কোনো প্রশ্ন করলো না। গেট খুলে গেল, নেতাজী ঢুকলেন। উনি যে নিরাপদে ভিতরে যেতে পারলেন এতেই আমার মন প্রসন্ন হয়ে উঠলো—আশা হলো, এইবার বোধহয় আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে।

পেছনে মুখ ফিরাতেই দেখলাম একজন আফগান আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দু'জনকেই লোকটা লক্ষ্য করছিল। আমার সন্দেহ হলো, লোকটা ব্রিটিশের গুপ্তচর—জার্মান দূতাবাসকে নজরে রাখাই তার কাজ। সে আমার পেছনে পেছনে এলো—আমি মোড় ঘুরে জাপানী দূতাবাস থেকে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি দীর্ঘ আর দ্রুত পদক্ষেপে বাজারে পৌঁছে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। এর মাঝখানে আমি ভিতরের কোটটা খুলে নিয়ে পরে নিলাম—ভিতরের কোটটার রং আলাদা ছিল। কিছুদূর পর্যন্ত অনেকগুলি পথ ঘুরে আবার বাজারেই ফিরে এলাম। যে লোকটা অনুসরণ করছিল তাকে আর দেখতে পেলাম না।

অনেকটা স্বস্তিবোধ করলাম—একটা বড় বোঝা ও দায়িত্বের ভার কাঁধ থেকে নামাতে পেরেছি ভেবে আনন্দও হলো। আমাদের লক্ষ্যের দ্রুত সার্থকতার ছবি যেন মানস-দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো। তৃপ্তির মনোভাব নিয়েই আমি একটা ভালো রেঁস্তোরায় ঢুকে গেলাম—ভালো খাবার চেয়ে নিয়ে খুশীমতো খেয়ে নিলাম। তারপর চলে এলাম লাহোরি গেটের সেই সরাইতে। দেখলাম বারান্দায় মেঝের উপর বসে আছেন নেতাজী।

অবাক হয়ে গেলাম। চাবি আমার কাছে ছিল, তাই আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিয়ে আমরা ঘরে ঢুকলাম।

নেতাজীকে খুবই অস্থির মনে হলো। তিনি বললেন, এখন যে কোনো মুহূর্তে আমরা গ্রেপ্তার হতে পারি। আমি প্রশ্ন করলাম—কেউ তাকে অনুসরণ করেছিল কিনা। তিনি বললেন—সে রকম কিছু তাঁর মনে হয় নি তবে তাঁর বিশ্বাস, দূতাবাসে প্রবেশ আর সেখান থেকে তাঁর ফিরে-আসা অন্য দূতাবাসগুলির প্রতিনিধিদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে।

একটি লোক যে আমাকে অনুসরণ করেছিল সেকথা নেতাজীকে খুলে বললাম। আমি বললাম—কোনো এজেন্টের ব্যাপার যদি হয়ে থাকে তবে সে নিশ্চয়ই আমার পিছনে আসতো। তাঁকে অনুসরণ করার মতো তো কেউই ছিল না। আমার মনে হলো, নেতাজীর এই আশঙ্কা অমূলক।

ঘরের ভিতরে এসে নেতাজী তাঁর দূতাবাসের অভিজ্ঞতা বুঝিয়ে বললেন। একজন তরুণ জার্মান কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে—তাঁর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যটাও সেই কর্মচারীর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই জার্মানটি নেতাজীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বিভিন্ন কাগজে ও সাময়িকপত্রে তাঁর যেসব ছবি বেরিয়েছিল তা-ও নেতাজীকে দেখালেন। তিনি জার্মান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থাও করে দিলেন। নেতাজী জার্মান মন্ত্রীর কাছেও তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন—আফগানিস্তানের বাইরে পাঠাবার ব্যাপারে তাঁর সাহায্যও চাইলেন। শহরে থাকা তাঁর পক্ষে আর নিরাপদ নয়, তাই এখান থেকে বাইরে যাবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত দূতাবাসে আশ্রয়ও তিনি প্রার্থনা করলেন।

মন্ত্রী বললেন, এই ব্যপারে নেতাজী যে তাদের কাছে এসেছেন—এতে তিনি খুশী। তিনি আরও বললেন, তিনি তাঁকে জানতেন। যখন তিনি সেই সময়কার বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে দেখা করতে

গিয়েছিলেন তখন জার্মান বৈদেশিক অফিসে তাঁকে তিনি দেখেছিলেন। তিনি জানালেন—তিনি অবিলম্বে বার্লিনের নির্দেশ চেয়ে পাঠাচ্ছেন। বার্লিন থেকে সম্মতিসূচক সাড়া মিলবে—এটা তিনি আশা করেন, অবশ্য তিন দিনের মতো তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়টুকু নেতাজীকেও অপেক্ষা করতে হবে। কাবুল থেকে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেতাজীর নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নে মন্ত্রী বললেন— বহু সংখ্যক আফগান কর্মচারী দূতাবাসে কাজ করছেন—তাঁকে এখানে থাকতে দিলে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। মন্ত্রী তাঁকে নির্দেশ দিলেন, তিন দিন পর তাঁকে হের টমাস নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হের টমাস সিমেন্সের প্রতিনিধি—তাঁর অফিস রয়েছে কাবুল নদীর তীরে শুল্ক বিভাগীয় অফিসের কাছে। তিন দিনের মধ্যেই বার্লিন থেকে নির্দেশ এসে যাবে—এই আশা তিনি করছেন ; এলেই তা হের টমাসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে নেতাজীকে জানাবার জন্য।

সুতরাং কোনো সংবাদ পাবার পূর্বে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমাদের প্রতীক্ষা করতে হবে। দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের সমস্যার জটিলতা এই সময়টুকুর মধ্যে আরও বেড়ে যেতে লাগলো—আর আমাদের আশার সফলতা এক দূরবর্তী সম্ভাবনার স্তরে গিয়ে পৌঁছলো। ৩রা আর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমরা বাজারগুলিতে ঘুরলাম—অন্য সব জায়গাতেও গেলাম। ঘরে সব সময় বসে-থাকা নিরাপদ মনে হলো না—এতে প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু করবার মতো কাজ কিছু ছিল না। দিনের দ্বিতীয় ভাগ আর সন্ধ্যা আমরা কাটাতে লাগলাম সরাইতে আমাদের ঘরে। নেতাজী সেই সময়ে আমাকে বলতেন কংগ্রেসে তাঁর কর্মসূচী আর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কি অবস্থায় তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে এসে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করলেন তারও ইতিহাস। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা তারও নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন আমার কাছে।

কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায়—

ঘটনাটি আতঙ্কজনক—বিপদ্‌সঙ্কেত সূচক তো বটেই! সন্ধ্যায় সরাইখানার ঘরে আমরা বসে ছিলাম। আফগান পোশাক পরা একজন আফগান জাতীয় লোক আমাদের ঘরে ঢুকে হঠাৎ জেরা শুরু করে দিল। সে জানতে চাইল আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, এখানে আসবার উদ্দেশ্য কি। সে আমাদের জানালো- সে আফগান পুলিশ বিভাগের লোক!

আমি তাকে জানালাম – আমরা লালপুরার লোক। আফগানিস্তানের অন্তর্গত জালালাবাদ প্রদেশে কাবুল নদীর তীরে লালপুরা একটি বড় গ্রাম – গ্রামটি উপজাতীয় অঞ্চলের সীমান্তে। নেতাজীকে দেখিয়ে আগন্তুককে বললাম – উনি আমার কাকা, খুবই অসুস্থ, আমি তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছি ওঁর চিকিৎসার জন্য। হাসপাতাল বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থান মেলে নি বলেই আমরা সরাইখানাতে এসে রয়েছি।

লোকটা জানতে চাইল – আমার কাকার অসুখটা কি? আমি বললাম – আমার কাকা কালা, জিভটাও অসাড় – ফলে উনি কিছু শুনতে পান না, কথাও বলতে পারেন না।

মনে হলো, ওর বিশ্বাস হয় নি। বললো – সে আবার আসবে। এর পর সে চা চাইলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে চা'র জন্য লোক পাঠাতে চেষ্টা করলাম। সে বললো – ব্যস্ত হয়ে দরকার নেই, সে 'চা-খানা'তে গিয়েই চা খেয়ে নেবে। দুটি আফগান টাকা (চুয়াল্লিশ নয়া পয়সা) ওকে দিলাম – যাবার সময় ও বলে গেল আবার আসবে।

আগন্তুকের এই উপর-পড়া ভাবটি আমাদের ভালো লাগলো না। একটা অজানা আতঙ্কে আমাদের গা শির্ শির্ করে উঠলো—নেতাজীও বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

পরদিন, ৫ই ফেব্রুয়ারী, হের্ টমাসের সঙ্গে দেখা করার কথা – জার্মান দূতাবাসের মন্ত্রীর সঙ্গে সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। আমরা প্রাতরাশ শেষ করে সরাই থেকে বেরিয়ে পড়লাম – গুমরক অঞ্চলে অফিসটি খুঁজে বার করতে হবে। একটু সন্ধানের পর অফিসটির

অবস্থান দেখে নিলাম। কিন্তু খুব আগেই আমরা সেখানে পৌঁছেছিলাম। তাই ১১টা পর্যন্ত আমরা বাজারে ঘুরে বেড়ালাম—এগারোটাতেই অফিস খোলার কথা।

ভিতরে গিয়ে এক তরুণ জার্মানকে দেখতে পেলাম—পরে জেনেছিলাম, ইনি এক রেডিও ইঞ্জিনিয়ার। আরও কয়েকজন আফগান কর্মচারীকেও দেখলাম। আমরা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে হের টমাসের খোঁজ করলাম। তিনি ফারসী ভাষা বোঝেন বলে মনে হলো না—কেন না তিনি জার্মান ভাষাতেই কিছু বলছিলেন। তখন নেতাজী নীচু স্বরে তার সঙ্গে কথা বললেন জার্মান ভাষায়। সেই জার্মান ইঞ্জিনিয়ার নেতাজীকে জানালেন—আধ ঘণ্টার মধ্যেই হের টমাস এসে যাবেন—আমরা অফিসে বসে তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। আমরা ভাবলাম—চলে গিয়ে আবার সময়মত ফিরে আসাই ভালো। আমরা তাই করলাম—ফিরে আসার পর আমাদের হের টমাসের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

হের টমাস আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। নেতাজী নিজের পরিচয় দিলেন, আমাকেও পরিচিত করালেন। নেতাজী ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন—তাঁর জন্য কোনো সংবাদ আছে কি না। হের টমাস জানালেন—বার্লিন থেকে একটি বার্তা এসেছে; তারা নেতাজীর অন্তর্ধানের কথা জেনে আনন্দিত। তারা নেতাজীকে নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করছেন—এবং এই ব্যাপারে নেতাজীকে সব রকম সাহায্যই দেওয়া হবে।

হের টমাস নেতাজীকে বললেন, আবার তাঁর সঙ্গে তিন দিন পরে দেখা করতে—বার্লিন থেকে পরবর্তী সংবাদ ও নির্দেশ তখন পাওয়া যাবে।

বার্লিন যে নেতাজীকে নিরাপদে নিয়ে যাবার ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছে তাতে আমরা খুশীই হয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলার জন্য আমরা উদগ্রীব ছিলাম; নেতাজীও এই শহরে আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করছিলেন। তিনি হের টমাসের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করে

বললেন—শহরে দীর্ঘকাল থাকা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক, যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় রয়েছে। যতদিন যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন আমাদের রক্ষার একটা ব্যবস্থা করার জন্য তিনি অনুরোধ জানালেন।

কিন্তু হের টমাস বললেন, এই ধরনের কোনো ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না; তবে তিনি আমাদের বক্তব্য জার্মান দূতাবাসে পাঠাতে পারেন। অবশ্য, তিনি আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব করলেন—আমরা তাঁকে জানালাম, আমাদের অর্থের কোনো প্রয়োজন নেই।

হের টমাস আবার বললেন—নেতাজীর অন্তর্ধানের সংবাদে বার্লিন অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আমাদের আশ্বাস দিলেন। নেতাজীকে ওখানে নেওয়ার ব্যবস্থা যাতে ত্বরান্বিত হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন নির্দিষ্ট হলো। নেতাজী হের টমাসকে জানালেন—ব্যক্তিগতভাবে তিনি হয়তো না-ও আসতে পারেন—সেক্ষেত্রে রহমৎ আসবে পরবর্তী নির্দেশের জন্য।

এর পর আমরা চলে এলাম বাজারে—কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হয়েছিল। বাজারের একটা রেঁস্তোরায় আমরা খুশীমতো খেয়ে নিলাম—তারপর ফিরে এলাম সরাইখানায়—আমাদের ঘরে। বাজারে থাকতেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম অন্যান্য সাধারণ আফগানের মতো নেতাজীর পোশাক হয় নি। আমি ঠিক করেছিলাম নেতাজীর জন্যে একটা ওভারকোট কিনে দেব—ওভারকোটে পোশাকটা ঢাকা পড়বে। তুষারপাত ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে আত্মরক্ষার খাতিরে এবং দেহ উষ্ণ রাখার জন্য অন্যান্য কিছু পোশাকের প্রয়োজনও আমাদের ছিল।

নেতাজীকে ঘরে বসে একটু আরাম করার সুযোগ দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম—পোশাকের জন্য গেলাম একটা হিন্দু-আফগানী দোকানে। সেখানে নেতাজীর জন্য কিনলাম একটা পুরনো ওভারকোট আর আমাদের দু'জনের জন্য কিনলাম মোজা পায়জামা আর পুরনো জুতার তলি।

আট

উত্তমচাঁদের অতিথি

সেই আফগান গুপ্তচর একবার এসেছিল, বলে গেছে আবার আসবে।

সেই আশঙ্কায় আমি ভাবলাম, অন্য একটা নিরাপদ জায়গায় চলে যাব—কিন্তু অনেক ভেবেও যাওয়ার মতো জায়গা ঠিক করতে পারলাম না। এই সময়ে আমার মনে পড়লো উত্তমচাঁদ মালহোত্রার কথা।

উত্তমচাঁদ আমাদের গ্রামেরই একজন লোকের হিন্দু আত্মীয়। কোনো এক সময়ে ইনি ছিলেন 'নওজোয়ান ভারত-সভা'র একজন সক্রিয় সভ্য। ১৯৩০-এ পেশোয়ার জেলে আমরা একসঙ্গেই ছিলাম। তারপর সে কাবুলে চলে আসে; এইখানে সে ব্যবসার পত্তন করে—তারপর এখানেই বসবাস করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, বাজারগুলিতে ঘুরে বেড়াবার সময় আমি ওর দোকান কোথায় খুঁজেছিলাম এবং একবার একটা দোকানের সামনে সাইনবোর্ডও দেখেছিলাম তাতে নাম লেখা—এম. সি. উত্তমচাঁদ—কিন্তু মালিক সেই একই লোক কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। এখন আমরা খুবই সঙ্কটে পড়েছি; ভাবলাম সাহায্যের জন্য ওর সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

সেই হিন্দু পোশাক বিক্রেতার কাছে আমি জান্‌তে চাইলাম—সে উত্তমচাঁদ মালহোত্রাকে চেনে কিনা। সে আমাকে বললো—উত্তমচাঁদের দোকান আছে 'লবে দর্যা' বাজারে, তার একটি বাসনের কারবার আছে। সে একজন রেডিও ব্যবসায়ীও বটে। এম. সি. উত্তমচাঁদ—দোকানের সামনে একটি সাইনবোর্ডে ওর নাম লেখাও আছে। তখন কেনা জিনিসপত্র সব একত্র করে উত্তমচাঁদের দোকানের দিকে রওনা হলাম।

দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে—চলে এলাম দ্রুত সেই সরাইখানার ঘরে। এক ঘণ্টাও কাটেনি এমন সময় এলো সেই আফগান গুপ্তচর। এবার তার দ্বিতীয় আবির্ভাব!

সে আমাকে বললো তার সঙ্গে থানায় যেতে। আমি তাকে বললাম—থানায় যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। আমি আমার পুরনো কাহিনী আবার বললাম—আমাদের সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বললাম, কাকার জন্য হাসপাতালে 'সীট' সংগ্রহ করতে না পারাতেই যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের অনর্থক হয়রানি না করতে তাকে অনুরোধ করলাম।

কিন্তু আগন্তুকের ভাব দেখে মনে হলো সে একেবারে অনমনীয়।

সে বললো- আমাদের কথা সে থানায় জানিয়েছে।

আমি বললাম— বিনা কারণে শুধু আমাদের উত্যক্ত করার জন্যই এইসব সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। শহরে যারা নবাগত তাদের এত সমস্যা, তাদের জন্য আবার নূতন সমস্যার সৃষ্টি করা তার পক্ষে সঙ্গত নয়।

আমি তাকে আটটি আফগানী (দু' টাকা) দিলাম—দিয়ে বললাম, আমাদের নিয়ে আর টানাটানি করো না। সে চলে গেল— যাবার সময় বলে গেল, খুব তাড়াতাড়ি যেন একটা হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়, নইলে আর কেউ আবার পিছনে লাগতে পারে।

ওর কথা থেকে আমাদের মনে হলো ওর দৃঢ় বিশ্বাস—হয় আমরা চোরাচালানের কারবার করি, নয়তো অন্যায় ব্যবসায়ে লিপ্ত কোনো কুচক্রী লোক!

কিন্তু এই দ্বিতীয়বারের আবির্ভাবের পর আমাদের দৃঢ় ধারণা হলো অবিলম্বে এই সরাই ত্যাগ করাই ভালো। তক্ষুণি একটা বিকল্প-ব্যবস্থা করে ফেলবার জন্য নেতাজীও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অনেক চিন্তা করেও ঠিক করতে পারলাম না কাবুলে আর কোথায় গিয়ে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি। নেতাজী ও আমি বহুক্ষণ এই নিয়ে আলোচনা করলাম কিন্তু আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হলো না।

ঠিক এই অবস্থাতেই উত্তমচাঁদের নামটা আমার মনে এল, কিন্তু নেতাজীকে এই নিয়ে কিছু বললাম না, কেন না তার এখনকার চিন্তাধারা সম্পর্কে আমি সঠিক কিছুই জানি না। আমাদের শেষ দেখা হবার পর এগারো বছর কেটে গেছে। তার চিন্তা, দর্শন বা রুচিগত বহু পরিবর্তন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে হয়ে থাকতে পারে। প্রথমে তার সম্পর্কে খুব সতর্কভাবে সন্ধান নিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে পরে নেতাজীর কাছে তার নাম বললেই হবে। কোনো গ্রামের দিকে চলে গিয়ে কোনো মসজিদে দু' দিন কাটিয়ে দেওয়ার কথাটাও ভেবে দেখলাম। কিন্তু এটিও আমাদের যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। কারণ, সেক্ষেত্রে কাবুলে জার্মান যোগাযোগের ব্যাপারটা কঠিন হয়ে উঠবে। কাবুলেই অন্য একটি সরাইতে অবশ্য উঠে যাওয়া যায়; সেটিও খুব নিরাপদ প্রস্তাব নয়—তবু শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই নেওয়া স্থির করলাম। এর পর নৈশভোজন শেষ করে আমরা শুতে গেলাম।

আমরা স্থির করলাম ৬ই ফেব্রুয়ারী শহরে অন্য একটা উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমার মনে হলো এই ব্যাপারে নেতাজীর আসবার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি তাঁকে ঘরে বসেই বিশ্রাম নিতে বললাম—অন্য আশ্রয়ের খোঁজে আমি গেলাম বাইরে। যাবার আগে, যাতে কারও সন্দেহ না হয় এই জন্য বাইরে থেকে দরজায় তালাচাবি দিয়ে দিলাম, তারপর শুরু হলো শহরের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াবার কাজ।

কাবুল শহরে অনেক সরাই আছে যেখানে সাধারণত ছোট ছোট ব্যবসায়ী বা পাশের গ্রামাঞ্চল থেকে লোক এসে ভীড় করে। আমি বেশীর ভাগ সরাইতেই ঘুরে দেখলাম কিন্তু পছন্দমতো জায়গা পেলাম না। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়টুকু ছাড়া সন্ধ্যা পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে ঘুরে জায়গা খুঁজে বেড়ালাম। সন্ধ্যায় ফিরে এসে নেতাজীকে আমি আমার ব্যর্থতার ব্যাপারটা খুলে বললাম। তাঁকে একথাও জানালাম, আমার দেখার জায়গাগুলোর যে কোনো একটাতে সরে গেলেও আমরা খুব ভালো থাকবো না। তাছাড়া তাঁকে বোঝালাম ঐ গুপ্তচরটাকে আমাদের

খুব বেশী ভয় করবার কারণ নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ঘুষ আদায় করতে চায়—আমাদের পুলিশের হাতে তুলে দিলে তার ঘুষ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের শুধু প্রত্যেক বারই সে এলে পরে ঘুষ চালিয়ে যেতে হবে—হয়তো ঘুষের পরিমাণটা ক্রমশ বাড়তে পারে। নেতাজী আমার কথায় খুশী হলেন, মনে হলো একটু আশ্বস্তও হলেন।

সেদিন কিন্তু গুপ্তচর এসে অন্য কথা বললো। সে বললো—অর্থে তার কোনো স্পৃহা নেই! তবে আমাদের এই বন্ধুত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সে স্থায়ী ধরনের একটা কিছু চায়। আমি লক্ষ্য করলাম, আমি যে হাত ঘড়িটা পরেছিলাম—গুপ্তচর তার দিকেই তাকাচ্ছে। সে ঘড়িটাকে দেখিয়ে বললো—ঐটিই তার চাই।

এই ঘড়িটি আসলে নেতাজীর। উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আসবার সময় নেতাজী এটি আমাকে দিয়েছিলেন—একটি পুরু কাঁচের 'রোল্ডগোল্ড ওয়াচ'—লাল রঙে '১২' সংখ্যাটি খোদিত। খুবই দামী ঘড়ি সন্দেহ নেই, তাছাড়া নেতাজী আমাকে বলেছিলেন—এটি তাঁর পিতার উপহার। আমি জানতাম, এই ঘড়ি ছিল তাঁর গভীর আসক্তির আবেগ দিয়ে ঘেরা।

যখন সেই গুপ্তচর এই ঘড়িটিই দাবী করে বসলো, আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। যে কোনো মূল্যেই হোক, এই ঘড়িটি ছাড়তে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সেই গুপ্তচরকে বললাম, অন্তত আমার কাকাব চিকিৎসা শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঘড়িটি আমাদের খুব দরকার।

কিন্তু গুপ্তচর নাছোড়বান্দা—সে দৃঢ় কণ্ঠে বার বার তার দাবী জানাতে লাগলো। কিন্তু নেতাজী অবস্থা বুঝে আমাকে ইঙ্গিতে জানালেন—ঘড়িটি দেওয়াই দরকার।

অগত্যা ঘড়ি দিলাম। ঘড়ি হাতে পেয়ে সেই গুপ্তচর আমাদের ছেড়ে গেল—যাবার সময় বলে গেল, এখন থেকে সে আমাদের বন্ধু, প্রয়োজন হলে সে আমাদের সাহায্য করবে।

ঘড়ি বিসর্জন দিয়ে আমি খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু

নেতাজী আমাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, সান্ত্বনা দিলেন এই বলে, আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তাতে এ জাতীয় ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, আমি যা আগেই বলেছিলাম তাই সত্যি ; লোকটা ঘুষখোর, এখন আর আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। পরে নেতাজীকে বললাম -আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এখনই ঠিক করে ফেলা দরকার। বার্লিন থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কিনা জানবার জন্য পরদিন হের টমাসের সঙ্গে আমাদের দেখা করার কথা। যদি সেখান থেকে স্পষ্ট কোনো উত্তর বা সাহায্যের ভরসা না মেলে তবে যে কোনো একটি উপায় আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। সেই সম্ভাব্য উপায়গুলি হলো ঃ

১. সাহায্যের জন্য উত্তমচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এই প্রথমবার আমি নেতাজীর কাছে উত্তমচাঁদের নাম উল্লেখ করলাম। আমি ওর সম্পর্কে আমার পরিচয়ের ইতিহাস নেতাজীকে বললাম। ১৯৩০-এ পেশোয়ারে তার কর্মধারার বিবরণ দিলাম—কিভাবে নওজোয়ান ভারত সভার সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তা-ও জানালাম। আমি বললাম—তার পরবর্তী কর্মজীবনের ইতিহাস আমি জানি না; তবু আমরা খুব জটিল অবস্থায় পড়েছি বলেই অন্য বিকল্প পথের কথাও ভেবে রাখতে হবে।

২. আর একটি সরাইতে উঠে যাওয়া। এই সরাইতে একটি ঘরও আমি ভাড়া করে রেখেছি।

৩. নিজেদের চেষ্টাতেই আরও এগিয়ে যাওয়া—এবং তারপর রুশ-সীমান্ত পার হওয়া—ঠিক যেমনভাবে ভারত থেকে কাবুলে আসার পথে আমরা উপজাতীয় অঞ্চল পার হয়ে এসেছি।

এই তিনটি প্রস্তাব নিয়েই বহুক্ষণ আলোচনা চললো। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এই হলো, যদি জার্মান দূতাবাসের ব্যবস্থায় কোনো বিলম্ব থাকে তবে সাহায্যের জন্য উত্তমচাঁদের সন্ধান করতে হবে।

৮ই ফেব্রুয়ারী, আগের ব্যবস্থা মতোই আমি একাই সিমেন্স অ্যাণ্ড্

কোম্পানীর অফিসে হের টমাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—বার্লিন থেকে কোনো সংবাদ এসেছে কিনা তা জানার জন্য। তিনি জানালেন, সেইদিন ভোরেই মন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে, তিনি বলেছেন বার্লিন থেকে এখনও তিনি কোনো সংবাদ পান নি ; একথা ও বললেন, তিনি আমাদের যে কোনো উপায়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি তাকে আমাদের অবস্থার কথা জানালাম—সেই আফগান গুপ্তচর কিভাবে আমাদের পিছনে লেগেছে তাও বললাম। আমি তাকে বললাম, আফগানিস্তানে আর আমাদের থাকা মোটেই নিরাপদ নয়—আফগানিস্তান থেকে নিরাপদ যাত্রার একটা দ্রুত ব্যবস্থা না হলে আর চলছে না। হের টমাস বললেন, তিনি মন্ত্রীর কাছে এসব কথা বলবেন, আর আমাকে বললেন তিনদিন পর আবার তার সঙ্গে দেখা করতে।

আমি চলে এলাম। হের টমাসের সঙ্গে আমার কথাবার্তার সারমর্ম নেতাজীকে জানালাম। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে ঘরে ফিরে এলাম।

স্থির হলো এইবার আমি উত্তমচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করবো।

আমি সোজাসুজি চলে গেলাম তার দোকানে—দেখলাম সে একটা দৈনিক কাগজ পড়ছে। তার কাছে একটি অল্প বয়স্ক ছেলে ছিল, তাই আমি পোশ্‌তু ভাষায় কথা বলতে শুরু করলাম। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম তবুও একটু নিশ্চিন্ত হবার জন্য তাকে প্রশ্ন করলাম—সে পেশোয়ার থেকে এসেছে কিনা ?

সে উত্তরে বললো—হ্যাঁ। তারপরেই ওখানে যাবার কারণ জানতে চাইল।

আমি বললাম—পেশোয়ার থেকে আমি তার জন্য একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি ; এই বলে ছেলেটির দিকে তাকালাম। সে ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো, ছেলেটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল চা আনতে।

ছেলেটি চলে গেলে আমি তাকে বললাম, সে আমাকে চিনতে পারে নি—এই বলে আমি আমার পরিচয় দিলাম—আমি ঘাল্লা দেহর গ্রামের শহীদ হরিকিষণের ছোট ভাই, তার কাকা ঐ গ্রামেই বিয়ে

করেছেন। আমরা দু'জন ১৯৩০-এ একসঙ্গে পেশোয়ার জেলে কাটিয়েছি।

এইবার চিনতে পেরে লাফিয়ে উঠে সে প্রচণ্ডভাবে আমার সঙ্গে 'হ্যাণ্ড্‌সেক' করলো—আমাকে জড়িয়ে ধরলো। রীতিমত উত্তেজিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলো—আমি কি করে কাবুলে এলাম। আমি তাকে বললাম, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাকে কাবুলে আসতে হয়েছে—আমার সঙ্গে আছেন ভারতের একজন বিশিষ্ট নেতা।

কাবুলে থাকতে আমাদের কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সবই তাকে বুঝিয়ে বললাম—প্রশ্ন করলাম, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে কি না।

যখন সে জানতে চাইল, কি ধরনের সাহায্য আমাদের চাই তখন আমি সমস্ত কাহিনীটি খুলে বললাম, আর জানিয়ে দিলাম—আমার সঙ্গে যিনি আছেন তিনি স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। শোনামাত্র উত্তমচাঁদ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লো—আর আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইল।

আমি তাকে জানালাম—এখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন- কাবুলে একটি নিরাপদ আশ্রয়। অন্য সব যা জানবার সে পরে জানতে পারবে। সে বললো, কাবুলের পুরাতন বিপ্লবীদের সাহায্য আমরা পেতে পারি। কিন্তু আমি যখন বললাম—আমাদের সময় নেই, আমাদের সমস্যাটা এমনি যে এক্ষুণি কিছু না করলে চলবে না—তখন উত্তমচাঁদ নিজের গৃহেই আশ্রয় দিতে সম্মত হয়ে গেল। আমি জানতে চাইলাম তার বাড়ীটি কোথায়, সেখানে আশ্রয় নিলে সেটা নিরাপদ হবে কিনা—যে অঞ্চলে সে থাকে সেখানে তার রাজনৈতিক মতবাদ সকলের কাছে পরিচিত কি না—এমনি আরো সব কথা। সে আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললো—বেশ নিরাপদ অঞ্চলেই তার বাড়ী—আর সেই অঞ্চলে তার রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।

আমি তাকে বললাম—আমরা পরদিনই তার বাড়ীতে যাচ্ছি।

আমরা ওর দোকানে আসবো বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ—দোকান থেকেই সে আমাদের নিয়ে যাবে তার বাড়ীতে।

সরাইখানায় ফিরে উত্তমচাঁদঘটিত বিস্তৃত বিবরণ জানালাম নেতাজীকে। এই রকমের একটা ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে জেনে নেতাজী আশ্বস্ত হলেন; একথাও তিনি বললেন, এই ব্যবস্থা আরও আগেই করা উচিত ছিল—করা হলে সেই গুপ্তচরের আবির্ভাব জনিত জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। আমি বুঝিয়ে বললাম, উত্তমচাঁদের রাজনৈতিক কর্মধারা দশ বছর আগেকার—তার বর্তমান জীবন ও চিন্তা সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি নি।

সরাই থেকে উঠে যাবার আয়োজন চলতে লাগলো। আমরা স্থির করলাম—মালপত্র প্রথমে রেখে যাবো। ভাড়াবাবদ যা প্রাপ্য তা চৌকিদারকে দিয়ে দিলাম। ১৯৪১-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী বিকেল পৌনে পাঁচটায় আমরা সরাইখানা ত্যাগ করলাম। প্রথমে গেলেন নেতাজী—আমি ছাদ থেকে লক্ষ্য রাখলাম কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কি না। দেখলাম, কেউ তাকে অনুসরণ করছে না। তখন আমিও বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গ ধরলাম।

বন্দোবস্তটা এই রকম ছিল যে নেতাজী নদীর অন্য পারে থাকবেন, দোকানে আসবেন না। আমি উত্তমচাঁদের সঙ্গে 'পুলে-খিশ্‌তি' সেতুর দিকে এগিয়ে যাব—নেতাজী নদীর অন্য পার থেকে একই দিকে যেতে থাকবেন। আমি সেতুর কাছে নেতাজীর সঙ্গ নেব—তারপর দু'জনেই উত্তমচাঁদকে অনুসরণ করবো। নেতাজীকে পথে উত্তমচাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে না।

উত্তমচাঁদের দোকানে যখন পৌঁছুলাম তখন সে একাই ছিল—ভৃত্যটিকে সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল মাংস ও সব্‌জির জন্য, বলে দিয়েছিল দু'জন অতিথির জন্য নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা রাখবার জন্য। সবই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হলো। আমরা যখন উত্তমচাঁদের গৃহে পৌঁছুলাম তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

পৌঁছুবার পর আমাদের জন্য সাজানো ঘরটিতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমি উত্তমচাঁদকে নেতাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দিলাম। উত্তমচাঁদ তাঁকে নমস্কার করে আলিঙ্গন করলো। কিছুক্ষণ পরে উত্তমচাঁদের স্ত্রীকে নেতাজীর সঙ্গে পরিচিত করানো হলো।

মহল্লা 'হিন্দু গুজার'-এ একটি দোতলা বাড়ীর উপরতলায় উত্তমচাঁদের বাস। নীচেরতলায় থাকতেন রোশনাল—একজন পেশোয়ারের হিন্দু। উপরের তলায় তিনটি ঘর—এছাড়া স্নানের ঘর ও রান্না ঘর তো ছিলই। আমাদের দু'জনের জন্যে একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছিল—ঘরটি মধ্যএশীয় রীতিতে সাজানো। মেঝেয় সতরঞ্চি ও কার্পেট বিছানো; মধ্যস্থলে একটি টেবিল—টেবিলের নীচে ঘরটিকে গরম রাখবার জন্য চুল্লীর আয়োজন। টেবিলকে ঘিরে আছে তিনটি পুরু ও নীচু কুশনযুক্ত জাজিম; এইগুলি বসার জন্য ব্যবহার করা হতো, আর রাত্রিতে এইগুলিই হয়ে যেতো শয্যা। নেতাজী ও আমি দু'টি ব্যবহার করতাম—ঘরে কেউ এলে তার জন্যে প্রস্তুত থাকতো তৃতীয়টি।

আমরা এসে যাবার পরই আমাদের জন্য চা এলো। উত্তমচাঁদ রেডিও খুলে দিলো—ঠিক সময়েই একটা বাঙ্‌লা গান প্রচারিত হচ্ছিল। এখানকার একটি প্রথা এই যে প্রতিবেশী বা বন্ধুরাও অতিথিদের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তাঁদের সঙ্গে বসে। এই প্রথা অনুযায়ী রোশনলাল উপরতলায় এসে আমাদের ঘরে ঢুকলো। সে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো—বসবার জন্য অনুরোধ জানালো উত্তমচাঁদ—তবু সে দাঁড়িয়েই থাকলো; কিছুক্ষণ পরে সে নীচের তলায় চলে গেল।

আমরা যখন কাবুলে ছিলাম এমন কি তার আগে কাবুলে যাবার পথেও নেতাজী যে জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত তা তিনি পান নি। মাঝে মাঝে তিনি অভিযোগ করতেন—পেট ভার ভার বোধ হচ্ছে বা পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাদের এই অবস্থা ও সঙ্কটের মধ্যে কোনো চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না।

এই বাড়ীতে উঠে আসায় নেতাজী খুশী হয়েছিলেন এই ভেবে যে এখন তিনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারবেন। এ বাড়ীতে আসার পরদিন সকালে জানা গেল রোশনলাল সপরিবারে ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে। আমরা শুনলাম—রাধাকিষণ নামে কোনো এক বন্ধুর বাড়ীতে হঠাৎ ওদের চলে যেতে হয়েছে। তারিখটা ছিল ১৯৪১-এর ১০ই ফেব্রুয়ারী। হঠাৎ এ ঘটনায় আমাদের আতঙ্ক হলো। ব্যাপারটি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। উত্তমচাঁদকে বললাম—যেভাবেই হোক্, জানা দরকার রোশললাল হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে গেল কেন? উত্তমচাঁদও একটা অজানা বিপদের আভাস পেলো—শুধু ওর নয়, আমাদেরও! সে এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো যে শেষ পর্যন্ত তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বললো—বন্ধুটির নাম হাজি আবদুল শোভান।

হাজি আবদুল শোভান আগে ছিলেন ভারতের নাগরিক—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মর্দান জেলায় ছিল তাঁর বাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আগেই তিনি চলে গিয়ে ছিলেন আমেরিকায়। ওখানে থাকতে বহু ভারতীয় দেশপ্রেমিকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। 'গদর' দলের বিখ্যাত নেতা লালা হরদয়ালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল সান ফ্রান্সিস্কোতে। যুদ্ধ যখন বাধলো তখন তিনি তার কয়েকজন সতীর্থের সঙ্গে চলে এসেছিলেন আফগানিস্তানে—এখানে থেকে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কাজ করে যাবেন এই তাঁর সঙ্কল্প। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যায়ে তখন মাঞ্চুরিয়ায় গিয়েছিলেন—সেখান থেকে জার্মানীতে। ওখানে তিনি এক জার্মান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তারপর তিনি আফগানিস্তানে ফিরে এসেছিলেন রাজ-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের সুবাদ; আর এইখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন আফগান নাগরিক হিসেবে। তিনি একটা পশমের হোসিয়ারী কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বহুবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিনি বেশ দীর্ঘকাল জেলেই কাটিয়েছেন।

প্রায় দু'টোর সময় উত্তমচাঁদ যখন মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য দোকান

থেকে ঘরে ফিরে এলো তখন হাজি আবদুল শোভান তার সঙ্গেই ছিলেন। সে হাজি সাহেবকে নেতাজী ও আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই সেই বৃদ্ধ দেশপ্রেমিক আমাদের দু'জনকেই গাঢ় প্রীতিতে আলিঙ্গন করলেন—গভীর স্নেহে তাঁর দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। তিনি বললেন—তিনি ভাগ্যবান, তাই নেতাজীর সঙ্গে ঐ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আরও বললেন—নেতাজী যেপথ নিয়েছেন সেই পথেই ভারতের মুক্তির দিন নিকটতর হবে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এ জাতীয় প্রচেষ্টার আর দ্বিতীয় নজীর নেই।

প্রাথমিক অভ্যর্থনামূলক কথাবার্তার পর চা খেতে খেতে আমরা রোশনলালের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। ওরা দু'জনেই এই ঘটনায় বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। নেতাজী অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবেই ছিলেন—পরে তিনি এই ঘটনাটি সম্পর্কে আমার মত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, রোশনলাল খুব সম্ভবত ভয়ে ঘর ছেড়ে গেছে। যদি সে আমাদের ধরিয়ে দিতে কিংবা কোনো রকম ক্ষতি করতে চাইত—ঐ সময়ের মধ্যেই কোনো একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটতো। আমি একথাও বললাম—আর যা হোক, রোশনলাল একজন ভারতীয়, প্রত্যেক ভারতীয়ের নিকট ভারতের মুক্তিই জীবনের আদর্শ—তাছাড়া নেতাজীর প্রতি তাদের গভীরতম শ্রদ্ধা রয়েছে। রোশনলাল নেতাজীকে চিনতে পেরেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি এমন কে থাকতে পারে যে নেতাজীর মতো লোককে ধরিয়ে দিয়ে মুক্তি-সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করবে, আর নিজের জীবনে দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেবে? সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নেই—এই আমার দৃঢ় মত।

কিন্তু উত্তমচাঁদকে আমি বললাম, আমরা স্বার্থপর হতে চাই না; কোনো বিপদ সম্পর্কে যদি ওদের আতঙ্ক থেকে থাকে তবে আমরা অবিলম্বে অন্য কোথাও সরে যেতে প্রস্তুত।

এরপরে আমরা যা জেনেছিলাম তাতে আমার মতের সত্যতাই প্রমাণিত হয়েছিল। রোশনলাল তার বন্ধু রাধাকিষণের বাড়ীতে

উঠে যাবার আগে তাকে বলেছিল—তার কেমন যেন মনে হচ্ছিল যে বাড়ীতে অশরীরী ছায়া ঘুরছে, অর্থাৎ এটা নাকি ভূতের বাড়ী—এখানে তার ও তার পরিবারের পক্ষে থাকা অসম্ভব। বন্ধুর বাড়ীতে যাওয়াটাই তার উদ্দেশ্য ছিল, ভূতের গল্পটা তার বানিয়ে বলা, বাড়ী বদলের অজুহাত মাত্র। আমরা এটাও জানতে পেরেছিলাম, সে নেতাজীর বিষয়ে উত্তমচাঁদ বা অন্য কারও কাছে কিছু বলে নি, অর্থাৎ এই ঘটনার প্রসঙ্গ সে কোথাও তোলে নি।

যদিও নেতাজী আমার সঙ্গে একমত হলেন—দেখলাম উত্তমচাঁদ আর হাজি সাহেবের ঘাবড়ানো ভাবটা তখনো কাটে নি। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম, পরদিনই নতুন কোনো একটি জায়গায় চলে যাব। ঠিক হলো, উত্তমচাঁদ সকালে যথারীতি তার দোকানে যাবে, আর আমি বেরিয়ে যাব নতুন বাসস্থানের খোঁজে, তারপর নিজেরাই সেই বাসস্থানে চলে যাব।

স্মরণ থাকতে পারে যে একদিন আগে আমাদের মালপত্র আমরা রেখে এসেছিলাম লাহোরি গেটের সেই সরাইখানার ঘরে। বেশী দিন সেখানে জিনিসপত্র ফেলে রাখা সঙ্গত হবে না, তাছাড়া ঘর অনেকদিন তালাবন্ধ থাকলেও লোকের সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে। স্থির করলাম, অবিলম্বে আমাদের মালপত্র এনে ফেলবো।

উত্তমচাঁদের বালক-ভৃত্য অমরনাথকে নিয়ে সরাইখানার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম সন্ধ্যার অন্ধকারে। সব জিনিসপত্র তুলে দিলাম তার হাতে, উত্তমচাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দরজায় তালা না দিয়ে চলে এলাম সরাইওয়ালার কাছে। তার সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে ঘোরানো পথ দিয়ে চলে এলাম উত্তমচাঁদের বাড়ী। ওখানেই আমরা রাত কাটালাম। রাতের ঘুমটা বেশ ভালোই হয়েছিল।

১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে যথাসময়ে উত্তমচাঁদ চলে গেল তার দোকানে—যাবার আগে নেতাজীর জন্য দুদিনের ওষুধের ব্যবস্থা করে গেল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম—আশ্রয়ের সন্ধানে। ফলের বাজারে যে সরাইতে আমরা ছিলাম—সেদিকে আমি গেলাম না। সেখানে দু'দিনের ঘর ভাড়া আগাম দিয়ে এসেছিলাম, দুদিনের মধ্যে

একবারও সেখানে যাই নি—এখন সেখানে গেলে কারও সন্দেহ হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে শহরের প্রায় সমস্ত পথ ও সরাই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। একটি সরাই আমি বেছে নিলাম—সরাইটি পাঠান পরিচালিত, পাঠানেরাই এখানে আসতেন। এরা সাধারণত ট্রাকের মালিক, ট্রাকের চালক, যাত্রী এবং আফগানিস্তানের বিভিন্ন পাঠান উপজাতির লোক। এই সরাই-এর নাম ছিল 'সরাই-জাজিয়ান্'। 'জাজি' হলো একটি আফগান উপজাতির নাম। সরাইটি ছিল বাজার 'লবে দর্যার' চকে অবস্থিত। এটিও দোতলা বাড়ী—তবে লাহোরি গেটের সেই সরাই থেকে ভালো। দোতলায় একটি ঘর আমি ভাড়া করলাম—ছু'টো খাটের ব্যবস্থা হলো—আর সেই সঙ্গে ঘর গরম রাখবার জন্য কাঠ কয়লার ব্যবস্থা।

এই নতুন সরাইতে নেতাজী ও আমি চলে এলাম বিকেলে মালপত্র নিয়ে।

বার্লিন থেকে কোনো সংবাদ এলো কি না তা জানবার জন্য পরদিন, ১২ই ফেব্রুয়ারী, আমাদের হের টমাসের সঙ্গে দেখা করবার কথা। নেতাজীর শরীর ভালো যাচ্ছিল না—আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব তাঁর কাছাকাছি থাকা দরকার। লাহোরি গেটের সরাইতে সেই আফগান গুপ্তচরের আবির্ভাবের ফলে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা ভেবে নেতাজীর কাছে আমার উপস্থিতি আরও জরুরী মনে হলো। আমরা স্থির করলাম, উত্তমচাঁদই হের টমাস ও আমাদের মধ্যে দূতের কাজ করবে।

কিন্তু সিমেন্সের অফিস থেকে উত্তমচাঁদ ফিরে এসে জানালো—বার্লিন থেকে এখনও কোনো সংবাদ আসে নি।

এইবার এই দিক থেকে সকল আশাই আমরা ছেড়ে দিলাম। নেতাজীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করে আমরা স্থির করলাম, আমরাই চেষ্টা করে নিজেদের স্বাধীন ব্যবস্থা নিজেরাই করবো। নেতাজী আমাকে বললেন, বিষয়টা নিয়ে উত্তমচাঁদ ও হাজি সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করতে। আমরা সীমান্ত পার হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাব—এই অভিযানে সাহায্য করবার মতো তাদের কোনো

পরিচয়সূত্র জানা আছে কিনা, এইটি জেনে নেওয়াই আলোচনার উদ্দেশ্য।

নিজেদের চেষ্টায় রুশীয়-সীমান্ত পার হবার এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি উত্তমচাঁদ ও হাজি সাহেবের সঙ্গে ১৯৪১-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী আলোচনায় বসলাম। সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টায় সফল হতে হলে সীমান্ত অঞ্চলেই আমাদের পরিচিত যোগসূত্র থাকা দরকার। এরা পরবর্তী অভিযানেও সাহায্য করতে পারবে। এদের হতে হবে নির্ভরযোগ্য---বিভিন্ন পথ সম্পর্কেও এদের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন---এদের হতে হবে বাস্তব সাহায্য দানে সমর্থ।

উত্তমচঁাদ একজনের নাম করলো—তার নাম ইয়াকুব। ইয়াকুব ঐ সময়ে ছিল কাবুলেরই অধিবাসী—আসলে সে পেশোয়ারের লোক। প্রায় কুড়ি বছর আগে সে একটা খুন করে পালিয়ে আসে—তারপর কাবুলেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। এখন সে আফগানিস্তানের নাগরিক। খান:বাদ জেলার একটি গ্রামের এক পরিবারে সে বিয়ে করেছিল; এই খানাবাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে এক শিল্পনগরী। ইয়াকুবের শ্যালক থাকে সীমান্ত অঞ্চলের কাছেই—ডাকাতি আর চোরাই চালানই তার ব্যবসা। উত্তমচঁাদের সঙ্গে ইয়াকুবের সম্পর্ক ভালো—ঐ অঞ্চল সম্পর্কে সে বিশেষ অভিজ্ঞ—এই অভিযানে তার সাহায্য বিশেষ কার্যকরী হবে বলে তার ধারণা। উত্তমচঁাদ বললো, তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওর সাহায্য পেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী 'আমু' নদী (অকসাস) অতিক্রম করে সোভিয়েত অঞ্চলে অভিযান সফল হতে পারে।

এই আলোচনার কথা আমি নেতাজীকে জানালাম। তিনি সাধারণভাবে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন—তবে আমাকে বলে দিলেন খুব সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। দেখতে হবে, ইয়াকুব শেষ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে বিপত্তির কারণ না হয়ে ওঠে।

আমরা স্থির করলাম, উত্তমচঁাদই ইয়াকুবের সঙ্গে কথা বলবে; তাকে বলবে—তার এক ভারতীয় বন্ধু তাকে সংবাদ পাঠিয়েছেন---তিনি সীমান্ত পার হয়ে সোভিয়েত দেশে যেতে ইচ্ছুক; যদি

ইয়াকুব এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে—সে তার বন্ধুকে জানাবে। এই অভিযানে তার কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেলেই তিনি যাত্রা করবেন। উত্তমচাঁদ নেতাজী সম্পর্কে কিংবা কাবুলে আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছুই বলবে না।

আমি এই বার্তা নিয়ে গেলাম উত্তমচাঁদের কাছে; উত্তমচাঁদ ইয়াকুবের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। ইয়াকুব জানালো, এই জাতীয় অভিযানে সে সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত। ইয়াকুব তার শ্যালকের কথাও উল্লেখ করলো—জানালো, তার শ্যালককে তার ব্যবসার খাতিরে প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করতে হয়,—তার কাছে এ ব্যাপারটা কোনো সমস্যাই নয়।

সব রকমের সম্ভাবনা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রস্তাব আমরা খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, কেন না জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ফলে কোনো সাড়াই তখন পর্যন্ত আমরা পাই নি। এই উৎস থেকে সাড়া পাব এমন আশা তখনও সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে পারি নি, কারণ একটি সাক্ষাৎকারে হের টমাস আমাকে তার সরকারের একটি নির্দেশ জানিয়েছিলেন যে জার্মানী, ইতালী ও জাপানী এই তিন অক্ষশক্তি মিলিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুরোধ জানিয়েছেন—নেতাজীকে দেশের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য 'ভিসা'র অনুমোদন করা হোক্। এই সাক্ষাৎকারে আমি জার্মান মন্ত্রীর কাছে সুভাষচন্দ্রের লেখা একটি চিঠি হের টমাসের হাতে দিয়েছিলাম। চিঠিটি কাবুলস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের হাতে দেবার জন্য নেতাজী জার্মান মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। হের টমাস দু'টি চিঠিই রাষ্ট্রদূতের হাতে তুলে দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কাবুল-বাসের শেষ দিনটি পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের কাছে দেওয়া সেই চিঠির পরিণতি কি হলো তা জানা যায় নি।

এরই মধ্যে নেতাজীর পেটের পীড়ার অবনতি হলো, ক্রমে তা পরিণত হলো মারাত্মক আমাশায়। পেটের যন্ত্রণার কোনো উপশম হলো না। আর এই অবস্থায় সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত নেতাজীর পক্ষে কোনো ভ্রমণের ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হবে না।

উত্তমচাঁদের দোকানে গিয়ে আমি তাকে নেতাজীর অসুখের কথাটা জানালাম। তাকে বললাম কোনো ডাক্তারের কাছে অসুখের বিবরণ দিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করতে। উত্তমচাঁদ এক ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে ওষুধ সংগ্রহ করে নিয়ে এলো, আর যতদিন পর্যন্ত নেতাজী সুস্থ না হলেন ততদিন তার বাড়ী থেকে নেতাজীর জন্য প্রতিদিনই খিচুড়ি আর দই-এর ব্যবস্থা করে দিল। উত্তমচাঁদের জন্য প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের যে খাবার আসতো তার সঙ্গে সেই খিচুড়ি আর দই-ও আসতো তার দোকানে, আমি গিয়ে নিয়ে আসতাম।

আমাদের কাবুল ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বিলম্বিত হচ্ছিল, তাই আমাদের উদ্দেশ্য সফল করার নানা চেষ্টা ও বিভিন্ন উৎসের সন্ধান করে দেখার সময় পেয়েছিলাম। আমি উত্তমচাঁদকে নিয়ে একদিন হাজি সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তাদের দু'জনকেই বললাম—তারা অতীত যুগের দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী। তাদের দীর্ঘ দিনের প্রতিষ্ঠা, বহুকাল তাদের কাবুলে থাকার অভিজ্ঞতা—সুতরাং কাবুলের সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে তারা কি আমাদের কিছুমাত্র সাহায্যও করতে পারেন না? তাদের কি তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য পরিচয়-সূত্র নেই যার সাহায্যে এই দূতাবাসের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হতে পারে?

হাজি সাহেব বললেন—এমন কোনো পরিচয়ের কথা তার মনে পড়ে না—তবে কাবুলের সোভিয়েত দূতাবাসের কয়েকজন রুশীয় কর্মচারী তার কারখানায় পশমী পোশাক কিনতে আসেন, তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, কিংবা সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য কোনো বার্তাও তাদের হাতে দিতে পারেন।

নেতাজীকে সব কথা জানালাম—তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন। রুশীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে তিনি একটা চিঠি লিখলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই হাজি সাহেব দু'জন রুশীয় মহিলার হাত দিয়ে সেই চিঠি পাঠালেন রাষ্ট্রদূতের কাছে। এরা তার কারখানায় এসেছিলেন—হাজি সাহেব তাদের অনুরোধ করেছিলেন বার্তাটি যথাস্থানে পৌঁছে দিতে।

কিন্তু এই মহিলা ছু'টি আর কারখানায় এলেন না—আমরা যতদিন কাবুলে ছিলাম, রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকেও কোনো সংবাদ পাই নি। আমার মনে হোলো—কাবুলে আসার প্রথম দিকে বাজার 'লবে দর্যা'য় যে ছু'টি মহিলার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল, এরা তারাই।

১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে কয়েকটি দিন শুধু নেতাজীর স্বাস্থ্যের দিকেই নজর রাখতে হলো। ক্রমশ তাঁর স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাচ্ছিল একথা ঠিক, তবু কখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন এই নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা ছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী হের টমাসের কাছে যাবার কথা। উত্তমচাঁদকেই বললাম তার সঙ্গে দেখা করে এই কথা বলতে যে, আমরা এ পর্যন্ত কোনো সঠিক সংবাদ পাই নি, তার ফলে আমাদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। নেতাজী সুস্থ হয়ে উঠছেন—হের টমাস যদি এখনও বার্লিন থেকে কোনো উৎসাহজনক সাড়া না পান তবে আমাদের হয়তো নিজেদের উদ্যোগেই সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে যাত্রা করতে হতে পারে, ঠিক যেমন করে আমরা ভারত থেকে কাবুলে এসেছি। আমাদের এই মনোভাব হের টমাস যেন মন্ত্রীকেও জানিয়ে দেন—এই আমাদের ইচ্ছে।

উত্তমচাঁদ ফিরে এসে জানালো, মন্ত্রী এখনও কোনো সংবাদ পান নি। তবে হের টমাস এই কথা বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা নির্দেশ পাবার জন্য তারা খুবই চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কোনো জবাব না পাওয়াতেই ব্যবস্থায় দেরী হয়ে যাচ্ছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী রোশনলালের সেই ব্যাপারটা নিয়ে নেতাজীর সঙ্গে আমার কথা হলো। আমি বললাম, ঐ ঘটনায় আমরা অনর্থক ভয় পেয়েছিলাম। যদি আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করার ইচ্ছে থাকতো, এর মধ্যেই সে করতো। আমরা চারদিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম—বুঝতে পেরেছিলাম যে, কেউ বাড়ীটাকে নজরবন্দী রাখে নি—উত্তমচাঁদের দোকানেও কেউ হানা দেয় নি।

এদিকে নেতাজীর শরীর তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি ; সরাইখানায়

তাঁর উপযুক্ত পরিচর্যার অসুবিধা হচ্ছিল। উত্তমচাঁদের বাড়ীতে রোগীর খাদ্য, ওষুধ বা সেবার যে সুবিধে ছিল, সরাইখানায় তা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, আমাকে নেতাজীর কাছেই থাকতে হতো, তাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এদিকে ওদিকে যাওয়া-আসারও উপায় ছিল না। সুতরাং নেতাজীকে উত্তমচাঁদের বাড়ীতেই আবার নিয়ে যাবার প্রয়োজন দেখা দিল।

আমি নেতাজীকে কথাটা বললাম, কেন না তাঁর অনুমোদন পেলেই আমি উত্তমচাঁদের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবো।

নেতাজী সম্মতি দিলেন। তিনি দুর্বলবোধ করলেও যখন আরোগ্যলাভ করছেন—উত্তমচাঁদের ওখানে গেলে ভালোই হবে—কেননা সেখানে উপযুক্ত যত্ন আর বিশ্রামের অভাব হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্যন্ত আসন্ন ক্লান্তিকর যাত্রার আগে এই যত্ন আর বিশ্রাম তাঁর পক্ষে খুবই প্রয়োজন।

সরাই থেকে সোজা উত্তমচাঁদের দোকানে গিয়ে তার কাছে সব কথা খুলে বললাম; বিশেষ জোর দিয়েই বললাম, নেতাজীকে বাড়ীতে রাখলে কোনোদিক থেকেই কিছুমাত্র ভয়ের কোনো কারণ নেই! প্রকৃতপক্ষে ওঁকে সরাইখানায় নিয়ে তুলবার কোনো প্রয়োজনই ছিল না—শুধু আমরা স্বার্থপর হয়ে সমগ্র পরিবারকে কোনো বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাই নি বলেই ঐ রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি তাকে আরও বললাম—নেতাজীকে যদি তার বাড়ীতে না হয়ে সরাইখানাতেও গ্রেপ্তার হতে হয় তাহলেও উত্তমচাঁদকে জড়িয়ে পড়তে হবেই, এ থেকে তার মুক্তি নেই! আমি তাকে বললাম—আমরা দু'জনেই পাঠান, একই অঞ্চলের লোক, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুবার হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে গেছি। এটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে যদি নেতাজীর মতো একজন ব্যক্তিকে আমরা থাকতে এক সরাইখানার দুস্থ পরিবেশে দুঃখ ভোগ করে চলতে হয়, যদি আমরা কাল্পনিক ভয়ে ভীত হয়ে তাঁকে গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য বা উপযুক্ত খাদ্য দিতে না পারি।

উত্তমচাঁদ সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেল ; সে বললো, রোশনলালের কাছ থেকে আর কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই—এ মত সে নিজেও পোষণ করে। সে প্রস্তাব করলো—হাজি সাহেবের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

আমরা তাঁর বাড়ী গেলাম—বাড়ীটা ছিল দোকানটিরই ঠিক পিছনে। একটি আধুনিক প্যাটার্নের সুন্দর অট্টালিকা—ওঁর কারখানাও এরই মধ্যে। হাজি সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো ; তিনিও মত প্রকাশ করলেন নেতাজীকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়ার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নেই—তাছাড়া রোশনলালের বাড়ী ছেড়ে যাওয়াতে আমাদের যে আশঙ্কা তার কোনো দৃঢ় ভিত্তি কিছু ছিল না। স্থির হলো, সেইদিনই বিকেলে আমরা সরাইখানা ছেড়ে দিয়ে উত্তমচাঁদের বাড়ীতে উঠে আসবো। আমি উত্তমচাঁদকে বললাম—আমি সরাইে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে দেওয়া আর হিসেবপত্র চুকিয়ে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকবো—সে যেন অমরনাথকে একটা কুলি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়, তারা মালপত্র নিয়ে যাবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রায় পাঁচটায় আমরা সরাই ছেড়ে একটা টাঙ্গা ভাড়া করলাম। টাঙ্গায় বাজার ঘুরে 'মেজাং' পর্যন্ত এসে টাঙ্গা ছেড়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর আর একটি টাঙ্গা ভাড়া করে আমরা এলাম 'পুল্-ই-খিশ্তি' পর্যন্ত। তারপর পায়ে হেঁটে আমরা চলে এলাম উত্তমচাঁদের বাড়ী। তখন সন্ধ্যা প্রায় ৬টা। সেই সময়ের মধ্যে অমরনাথও মালপত্র নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলায় স্থির হলো উত্তমচাঁদ আমার ও ইয়াকুবের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেবে। আমি তার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করবো—তার সহায়-সম্বল কতটুকু আর আমাদের পরিকল্পনায় সাহায্য করতে পারলেও কতখানি পারবে। তাছাড়া, মানুষটিকেও যথাযথভাবে একটু যাচাই করে নেওয়া দরকার। সক্রিয় সাহায্য দেবার মতো শক্তি তার আছে কিনা তাও জেনে নিতে হবে। ঠিক হলো উত্তমচাঁদই তার সঙ্গে দেখা করে তাকে দুপুরের দিকে দোকানে যেতে বলবে—সেইখানেই সে

আমার সঙ্গে ইয়াকুবের পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার পরিচয় হবে, যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যাবেন, আমি তাঁরই বন্ধু।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে আমি উত্তমচাঁদের দোকানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম পেশোয়ারী পোশাকে একটি লোক উত্তমচাঁদের সঙ্গে বসে আছে। উত্তমচাঁদ তৎক্ষণাৎ উঠে লোকটির দিকে লক্ষ্য করে চোখের ইঙ্গিত করলো। ইঙ্গিতটা আমি বুঝলাম।

একজন সাধারণ খদ্দেরের মতোই এক ধরনের 'টি-পটে'র নাম করে আমি জানতে চাইলাম, ওটা পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তমচাঁদ বললো—'না'।

আমি সঙ্গে সঙ্গে দোকান ছেড়ে চলে এলাম। কিন্তু পরে যখন আমি বাজারের পথে ঘুরছিলাম—উত্তমচাঁদ আমার কাছে এসে বললো—লোকটার নাম 'জিয়নলাল'—ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে রজন ব্যবসায়ের এক দালাল, প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট কালের ব্যবসা নিয়ে পেশোয়ার থেকে একবার কাবুলে আসে। উত্তমচাঁদ বললো, আমি যেন নদীর ওপারে অপেক্ষা করি—ইয়াকুব এলেই তাকে নিয়ে সে আসবে।

আমি নদীর ধারের পথটিতে পায়চারি করতে লাগলাম—তারপর দেখলাম উত্তমচাঁদ আর একজনকে নিয়ে সেতুর দিকে আসছে। আমিও সেতুর দিকে এগিয়ে গেলাম। সে আমার সঙ্গে ইয়াকুবের পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর কিছুক্ষণ পরেই চলে গেল—যাবার আগে ইয়াকুবকে বলে গেল, আমি এক 'পুরাতন, নির্ভরযোগ্য বন্ধু'—সে যেন আমাকে যথাশক্তি সাহায্য করে।

আমি সব কথা ইয়াকুবকে বুঝিয়ে বললাম। বললাম—আমার বন্ধু এখনও ভারতেই আছেন; তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু বন্ধুজনের সাহায্য ছাড়া এ ব্যাপারে সফল হওয়া সম্ভব নয়। সেই বন্ধুও এমন হওয়া চাই যে এই অঞ্চল এবং সীমান্ত-ভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। সুতরাং সে যদি তার নিজের এবং তার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে তবেই যেন সে এগিয়ে আসে।

ইয়াকুব বললো—এই সব ক্ষেত্রে সাহায্য করবার শক্তি যে তার আছে এ বিষয়ে তার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ; তাছাড়া তার যে শ্যালক সীমান্তের অধিবাসী সে ঐ অঞ্চলকে খুব ভালোভাবেই জানে।

অনেক কথা হলো ইয়াকুবের সঙ্গে। পরদিন আর একবার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে আমি সন্ধ্যায় ফিরে এলাম উত্তমচাঁদের বাড়ীতে।

আমরা নেতাজীকে আমাদের সারাদিনের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলাম—জিয়নলালের কথাটিও বাদ দিলাম না। উত্তমচাঁদ বললো, জিয়নলাল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে তার দোকানে প্রায়ই আসে—তাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে না। সে একথাও বললো, সে ভালো লোক, নির্ভরযোগ্যও বটে, তাকে বিশ্বাস করলে কোনো ক্ষতি হবে না।

আমি বললাম, ওকে আপাতত এড়িয়ে যাওয়াই ভালো ; এটা সম্ভব এই জন্যে যে আমি তার দোকানে যাব না—আমি সোজা হের টমাসের কাছে যাব। তাছাড়া জিয়নলালও উত্তমচাঁদের দোকানেই যায়, তার বাড়ীতে আসে না। পরে যদি এমন হয় যে ওর সাহায্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে তখন ওকে দলে নেওয়া যাবে।

প্রসঙ্গটি তারপর পরিত্যক্ত হলো।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ইয়াকুবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলাম। বাজারের একটা নির্দিষ্ট স্থানে ওর সঙ্গে দেখা হলো, মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নেবার জন্য ওকে নিয়ে চলে গেলাম এক রেঁস্তোরায়।

একটি বিষয়ে আমি বিশেষ জোর দিলাম—তাকে বললাম, সফলতা সম্পর্কে যদি তার কোনোমাত্র সন্দেহ থাকে তবে তার পক্ষে এই দায়িত্ব-ভার নেওয়া উচিত হবে না। সে আমাকে আশ্বস্ত করলো। স্থির হলো, আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই যাত্রা করবো। যাত্রার আগে তার পরিবারের খাদ্যের জন্য তো অর্থ চাই, তাই আমি অর্থের প্রস্তাব করলাম। সে বললো, তার অর্থের দরকার নেই—তবু আমি তাকে ৩০০ 'আফগানি' দিলাম। আমি তাকে বললাম, যেহেতু তার শ্যালক

ওখানে থাকে সে ইচ্ছে করলে তার পরিবারকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে।

সে বললো, এই বিষয় নিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবে।

সে আমাকে তার বাড়ীটি দেখিয়ে দিল—যাতে ইচ্ছেমতো আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আমি কিছু টাকাও তাকে দিয়ে দিলাম তার শ্যালককে কোনো উপহার কিনে দেবার জন্য।

১৮ ই ফেব্রুয়ারী হের টমাসের কাছে গেলাম জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে লেখা নেতাজীর চিঠি নিয়ে। এই চিঠিতে নেতাজী জানিয়েছিলেন তার নিজের চেষ্টায় সীমান্তের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরিকল্পনার কথা। এই চিঠিতে তিনি বলেছিলেন—তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে জার্মান সরকারের তরফ থেকে কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমরা পাই নি ; এখন আর অধিককাল এখানে থাকা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাধ্য হয়েই এই পথ গ্রহণ করলাম। নেতাজী জানতে চেয়েছিলেন—এই সীমান্ত অভিযানে হের টমাস কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না। তিনি জানিয়েছিলেন, যদিও আমাদের কিছু অর্থ আছে, কিন্তু আরও অর্থের দরকার হতে পারে—ভবিষ্যতের অভাবনীয় অর্থব্যয়ের জন্য এই দুঃসাধ্য ও দীর্ঘপথের অভিযাত্রীদের তিনি কোনো সাহায্য করতে পারেন কি না।

আমি চিঠিটা হের টমাসের হাতে দিয়ে বুঝিয়ে বললাম—কি জটিল অবস্থার মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছি—যার ফলে আমরা এই সঙ্কটময় পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। মিঃ টমাস কথা দিলেন, তিনি চিঠিটি মন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন আর আমাকে বলে দিলেন ২২ শে ফেব্রুয়ারী এর জবাবের জন্য ওর কাছে যেতে হবে।

আমি ইয়াকুবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললাম এবং তার সঙ্গে আমাদের ব্যবস্থাটাও পাকা করে নিলাম। সে স্থির করেছিল, ১৯৪১ এর ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ভোরে বাসে যাত্রা করবে। তিনটি খানা-বাদের টিকিট কেনা হলো, আমাদের দু'জন ও ইয়াকুবের জন্য। সে

তার পরিবারের কাউকে সঙ্গে নিল না—তাতে ভ্রমণপথে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে—এই আশঙ্কায়।

২২ শে ফেব্রুয়ারী সকালে আমি ইয়াকুবের কাছে গেলাম। এক মাসের জন্য সে কাবুলে থাকবে না, সুতরাং সংসারের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও উপকরণ কিনে রেখে যাবার জন্য আমি তার হাতে কিছু টাকা দিলাম। ইয়াকুবের শ্যালকের জন্যও একটা লুঙি আর কয়েকটি উপহার দ্রব্য কেনা হলো। এই অভিযানের প্রথম থেকেই আমাদের কাছে একটি পথের মানচিত্র ছিল। কাবুলের দিকে আসবার পথে খুবই কাজে লেগেছিল এই ম্যাপটি। এতে পথ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া ছিল—আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ছবিও ছিল। এই মানচিত্রটি বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে আমরা আমাদের অভিযানের পুরোপুরি চেহারাটা ঠিক করে নিলাম।

উত্তমচাঁদও আফগানিস্তানের একটি 'গাইড্ বুক' কিনে নিয়ে এসেছিল—বইটি কাবুলের 'হবিবিয়া কলেজে'র একজন অধ্যাপকের লেখা। দরকারী পথের ম্যাপ এই বইটিতেও ছিল।

এই দিনেই আমি প্রায় দুপুরে হের টমাসের কাছে গেলাম—জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে নেতাজী যে চিঠি লিখেছিলেন তারই জবাব পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি অফিসে ছিলেন না। বিকেল প্রায় তিনটার সময় আবার ওর কাছে গেলাম—তখন দেখা হয়ে গেল। তিনি আমাকে বললেন, আমাদের বিষয়টি নিয়ে তারা ইতালীর মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন—সুতরাং তার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। আমি বললাম—তাঁর কাছে কোন্ পথে যেতে হবে আমি জানি না; শেষ পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছানো হয়তো সম্ভব না-ও হতে পারে। হের টমাস আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—ইতালীয় দূতাবাসে গেলেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার ঘটবে।

আমার নিস্পৃহ ভাবটা হয়তো তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন—তাই তিনি বললেন, আমি নিশ্চয়ই একটা সন্তোষজনক উত্তর পাব। এই সব দূতাবাস ও দূতবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্কে আসার পর থেকে আমাদের

যা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা নৈরাশ্যজনক ; তবু হের টমাসের আগ্রহে ইতালীয় দূতাবাসে যাওয়াই স্থির করলাম।

নেতাজীর সঙ্গে শহরের বহু স্থানেই টহল দিয়েছি—সেই সময়ে নিউ কাবুলের এক অন্ধ গলিতে ইতালীয় দূতাবাসের একটি সাইন বোর্ড দেখেছিলাম, মনে পড়লো। সেটা ছিল দূতাবাসের পিছন দিককার দরজা। এই দরজা দিয়ে ঢুকতেই কয়েকজন আফগান কর্মচারীকে দেখতে গেলাম। তারা আমার পরিচয় জানতে চাইল। আমি বললাম—আমি পাচক, হের টমাস আমাকে পাঠিয়েছেন—মন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে। তখন ভৃত্যদের মধ্যে একজন আমাকে মন্ত্রীর অফিসে নিয়ে গেল। মন্ত্রী তখন তার একজন আফগান কর্মচারীর সঙ্গে কি একটা বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। তিনি যখন প্রশ্ন করলেন—আমি কে? আমি জবাব দিলাম, হের টমাস আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি ভেবেছিলাম, তিনি বুঝতে পারবেন আর অন্য সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলবেন। কিন্তু কেন ?—এই বলে মন্ত্রী চীৎকারে ফেটে পড়লেন ;—আমি অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু প্রত্যয় ভরা দৃঢ় কণ্ঠেই আমি জবাব দিলাম—আমি জানি না, আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। আমার দৃঢ় কণ্ঠের জবাবে তার মনে এই ভাব হয়তো জেগেছিল, সাধারণ আফগান থেকে হয়তো আমি পৃথক, যদিও আমার পরনে সাধারণ আফগানের পোশাকই ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা তুলে নিয়ে হের টমাসের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর তিনি তার আফগান কর্মচারীটিকে যেতে বললেন। যে ভৃত্যটি আমার সঙ্গে এসেছিল সেও চলে গেল।

মন্ত্রী এবার দরজা বন্ধ করে এসে আমাকে বসতে বললেন এবং নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন—তিনি পিয়েত্রো কুয়ারোনি—ইতালীয় দূতাবাসের মন্ত্রী।

আমি তাকে বললাম—আমি রহমৎ খান্, আমি সুভাষচন্দ্র বসুকে সঙ্গে করে কাবুলে নিয়ে এসেছি—আমরা ২৭শে জানুয়ারী থেকে কাবুলেই আছি। কাবুলের জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমে আমরা

চেষ্টা করেছি সুভাষচন্দ্রকে নিরাপদে সীমান্ত পার করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য কিন্তু আজ পর্যন্ত সফল হতে পারি নি—যদিও খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা হবে বলে এরা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের ধারণা দীর্ঘকাল এ শহরে থাকা আমাদের পক্ষে নিরাপদ নয়—তাই আমরা স্থির করেছি নিজেদের চেষ্টাতেই আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে এগিয়ে যাব।

আমি একথাও বললাম—সুভাষচন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে লিখিত এক বার্তায় তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন—তাকে অনুরোধ করেছেন আমাদের এই পরিকল্পনায় ওরা সাহায্য করতে পারেন কি না তা জানাতে। এই পত্রেরও কোনো জবাব আমরা পাই নি।

ইতালীয় মন্ত্রী বললেন—জার্মান মন্ত্রী আমাদের এই নিজস্ব চেষ্টাতেই অগ্রসর হবার পরিকল্পনার কথা তাকে জানিয়েছেন। তিনি বললেন—এই জাতীয় অভিযান অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। আফগানিস্তানের মধ্য-সোভিয়েত অঞ্চল পর্যন্ত দীর্ঘপথে নানারকম বিপদের আশঙ্কা রয়েছে—সুতরাং এই রকম অভিযানে পদে পদে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তিনি বললেন—তিন অক্ষশক্তি মিলিতভাবে সোভিয়েত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে সুভাষচন্দ্র বসুকে একটি 'যাতায়াতের অনুমোদন-পত্র' দেওয়া হয় এবং যেহেতু ঐ দেশের সঙ্গে তাদের মৈত্রীর সম্পর্ক বর্তমান,—তারা ভাবছেন, খুব শীঘ্রই একটা আশাজনক উত্তর পাওয়া যাবে।

আমি বললাম, এই সংবাদ আমাদের অনেকদিন আগেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। তাছাড়া, এরকম 'ভিসা' পাওয়া যাবে কি না, সে বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। উত্তরে ইতালীয় মন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্কের উপরেই আবার জোর দিয়ে বললেন—ঐ সম্পর্কের জোরেই তারা আশান্বিত হয়েছেন। তিনি একথাও জানালেন যে, খুব শীগ্‌গিরই তাদের কূটনৈতিক দূতদের তিনি আশা করছেন, তারাও সেই পথে যাতে

নেতাজীর ভ্রমণ নিরাপদ হয় সেই ব্যবস্থা করতে পারেন। ইরান ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার ব্যবস্থার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না--- এই নিয়েও তারা ভাবছেন। ঐ দু'টি দেশে তাদের কূটনৈতিক দূতদের সঙ্গেও তারা যোগাযোগ করেছেন। এই সব দেশ থেকে নেতাজীকে রোম বা বার্লিনে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। আমি বিতর্ক তুললাম. এই সব পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে গিয়ে বেশ কিছুটা সময় লাগতে পারে---এদিকে আমরা কাবুলে আর অধিক কাল কাটাতে পারি না, যে কোনো দিন আমাদের ধরা পড়তে হতে পারে। আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে--- নিজেদের চেষ্টায় সামনের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন লক্ষ্য করে এগিয়ে যাওয়া।

আমি তাকে অনুরোধ করলাম. আমাদের এই অভিযানে সাহায্যের ব্যাপারটা নিয়ে বিবেচনা করতে—এই সাহায্যের প্রসঙ্গটি নেতাজী জার্মানীর মন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতেই তুলেছেন। আমি জোর দিয়ে বললাম, আমরা এই অভিযানের সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি—সেই ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলেই মনে হয়। তাছাড়া, ইতালীয় মন্ত্রীর যে কোনো প্রস্তাব কাজে পরিণত করতে যথেষ্ট সময় লাগার কথা। সুতরাং আমাদের পরিকল্পনাই বর্তমানে অনুসরণ যোগ্য।

শেষের দিকে মন্ত্রী অনুরোধ করলেন, তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর একটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা যেন আমি করে দিই। আমি তাকে বললাম—হের টমাসের অফিস থেকে আমি সোজা চলে এসেছি— মিঃ বসু এ সংবাদ জানেন না। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না উনি আসতে পারবেন কিনা। তবে আমি মন্ত্রীর অনুরোধের কথা তাঁকে জানাবো। আমি মন্ত্রীকে একথাও জানালাম, আমাদের বাসের টিকিট এরই মধ্যে কেনা হয়ে গেছে, আমরা পরদিন ভোরেই সীমান্ত পাড়ি দেব।

মন্ত্রী তার সেই ইচ্ছেই আবার ব্যক্ত করলেন—সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তিনি একবার কথা বলতে চান। স্থির হলো, সুভাষ বসু যদি

আসতে পারেন তবে তাঁকে আসতে হবে ২২শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যাতেই সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। মন্ত্রী আমার সঙ্গে তার সেক্রেটারী আন্‌জোলোত্তির পরিচয় করিয়ে দিলেন। আন্‌জোলোত্তি এই সময়ে প্রবেশপথে অপেক্ষা করবেন; দরজায় কড়া নাড়তেই উনি এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেবেন—প্রহরীকে প্রশ্ন করার সুযোগও দেওয়া হবে না।

সন্ধ্যা ছ'টায় আমি ফিরে গেলাম উত্তমচাঁদের বাড়ীতে। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছিল। উত্তমচাঁদ এর মধ্যেই দোকান থেকে ফিরে এসে নেতাজীকে জানিয়েছিল—জিয়নলাল ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে—ওকেও বিশ্বাস করে দলে টেনে নেওয়াই ভালো, নইলে সে না জেনে কোনো ক্ষতি করে ফেলতে পারে। নেতাজী সম্মত হয়েছিলেন—সেই অনুযায়ী জিয়নলালেরও সেই সন্ধ্যাতেই এসে নেতাজীর সঙ্গে দেখা করার কথা।

আমি আমার সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলাম—হের টমাসের সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছিল বা তারপরে ইতালীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যা হয়েছিল সব কিছুই বললাম। সবশেষে জানালাম, ইতালীয় মন্ত্রীর সঙ্গে নেতাজীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থার কথা। আমি বললাম, মন্ত্রীকে একথা বেশ স্পষ্টভাবেই জানানো হয়েছে যে, এই সাক্ষাৎকার আমাদের উপর বাধ্যতামূলক হবে না।

নেতাজী প্রথমে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন; পরে আমাকে বললেন, আমরা যখন নিজেদের চেষ্টাতেই অগ্রসর হবার জন্য ইতিমধ্যেই পাকা ব্যবস্থা করে ফেলেছি, তখন আর ইতালীয় দূতাবাসে আমার যাওয়া উচিত হয় নি। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, হের টমাসই আমাকে বলেছিলেন ইতালীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে, জার্মান মন্ত্রীর কাছে নেতাজীর লেখা চিঠির জবাব আনবার জন্য।

নেতাজী সমস্যাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন—সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ঠিকই থাকবে, আমরা যাব। তিনি বেশভূষা

একটু ঠিকঠাক করে নিলেন, দাড়ি আর গোঁফ একটু ছেঁটে নিলেন, শেষে উত্তমচাঁদের একটি ইয়োরোপীয় স্যুট পরলেন, মাথায় নিলেন একটি 'কারাকুলি' টুপি।

এরপর সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টায় ইতালীয় দূতাবাসের দিকে আমরা পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। আগেকার ব্যবস্থামতো আমরা সামনের দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল একজন আফগান। সেই আফগান প্রহরী কোনো প্রশ্ন করবার আগেই মিঃ আন্‌জোলোত্তি এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন; তিনি আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে তিনি সেই আফগানকে যেতে বলে দিলেন।

আমরা মন্ত্রীর ঘরে গেলাম—সেখানে তিনি ইতালীয় মন্ত্রীর সঙ্গে নেতাজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মন্ত্রী বললেন, তিনি ভারত থেকে তাঁর এই সফল অন্তর্ধানে খুবই আনন্দিত। এই কীর্তির জন্য তিনি নেতাজীকে অভিনন্দন জানালেন। উত্তরে নেতাজী জানালেন, তিনি যে ভারত থেকে কাবুলে চলে আসতে পেরেছেন এতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যের পূর্ণতা আসছে না। এখনও অনেক কিছু করণীয় আছে—আমাদের মন্ত্র সাধনের জন্য—যারা আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে আমরা তাদের সকলেরই সাহায্য চাই।

তারপর শুরু হলো ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার উপর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মত বিনিময়। ভারতে এবং উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা হলো। যখন আমি বুঝতে পারলাম, উপস্থিত জরুরী প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে আমরা একটা রাজনৈতিক বিতর্কের আবর্তে ভেসে যাচ্ছি তখন আমি নেতাজীর কাবুল থেকে নিরাপদ যাত্রার প্রসঙ্গটি তুললাম। বক্তব্যের শেষে আমি জানালাম, আমাদের অবিলম্বে ঠিক করে ফেলতে হবে আমাদের ফিরে যেতে হবে কি না, কিংবা এই দূতাবাসেই রাত কাটাতে পারবো, কারণ, কাবুলে অধিক রাতে চলাফেরা করা বিপজ্জনক।

মন্ত্রী প্রস্তাব করলেন, রাতটা আমরা দূতাবাসেই কাটাতে পারি, কেননা অনেক কিছুই আলোচনা করে নিতে হবে। আমি বললাম, আমাদের দুজনেরই এখানে রাত্রিবাস করা ঠিক হবে না, রাত্রিতে নেতাজীর সঙ্গে জিয়নলালের দেখা করতে আসার কথা; দুজনকেই গরহাজির দেখলে এমন সব সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে যা আমাদের পক্ষে ক্ষতিজনক এবং যা একেবারেই ঈপ্সিত নয়।

ঠিক হলো, আমিই উত্তমচাঁদের বাড়িতে ফিরে যাব। মন্ত্রী তার সেক্রেটারী মিঃ আন্‌জোলোত্তিকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেখানে যেতে চাই গাড়ীতে করে পৌঁছে দিতে। আমি প্রস্তাব করলাম, যাতে কারও কোনো সন্দেহ না হয় এই জন্য, নেতাজী ও আমি দুজনেই মন্ত্রীর বাড়ী থেকে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবো। গাড়ীটা কোনো এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে আমাদের তুলে নেবে। তারপর আমাকে বাড়ীতে রেখে নেতাজীকে নিয়ে গাড়ী ফিরে আসবে।

এই প্রস্তাবে সবাই রাজী হলেন। আমরা ঠিক করে নিলাম, পরদিন সকালে কোথায় ও কখন নেতাজীকে পৌঁছে দেওয়া হবে। স্থির হলো 'দারুল আমন' আর সময় ২৩শে ফেব্রুয়ারী, বেলা দুটো। স্থানটি নিউ কাবুল থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। আমরা বাসের টিকিট কিনে ফেলেছিলাম, পরদিন ভোরেই আমরা খানাবাদ যাত্রা করবো—এই ব্যবস্থাই পাকা হয়েছিল। আমি যখন নেতাজীকে প্রশ্ন করলাম, এই সব ব্যবস্থার কি হবে, তখন নেতাজী নীরব রইলেন। অবশ্য, বুঝতে বাকী রইলো না—নিজস্ব চেষ্টায় বাসে যাত্রার কল্পনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হবে।

উত্তমচাঁদের বাড়ীতে যখন ফিরে গেলাম তখন দেখলাম, উত্তমচাঁদ আর জিয়নলাল দুজনেই বসে আছে। আমাকে সেখানে দেখে জিয়নলাল অবাক হয়ে গেল। সে বললো, আমাকে সে ভেবেছিল কুচরিত্রের লোক—আমাকে বিভিন্ন সময়ে ইয়াকুবের সঙ্গে দেখে তার ঐরকম ধারণাই হয়েছিল। আমি তাদের জানালাম, নেতাজী পরদিন ফিরবেন, তখন জিয়নলাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে। আমার কেমন যেন মনে হয়েছিল উত্তমচাঁদই জিয়নলালকে পরিচিত করানোর

জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল—সে নিজেই হয়তো উচ্ছ্বাসের বশে তার কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিল—নেতাজীর মতো একজন লোককে সে আশ্রয় দিয়েছে—এবং সে নেতাজীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবে। কিন্তু কেন যে এর এত দরকার হয়ে পড়লো তা আমি বুঝতে পারি নি। জিয়নলাল নেতাজীর জন্য মিষ্টি ও ফল নিয়ে এসেছিল—সে সেই সন্ধ্যায় নেতাজীর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে বেশ একটু হতাশই হলো।

২৩শে ফেব্রুয়ারী নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমি ইয়াকুবের বাড়ীতে গেলাম; তাকে বললাম, আপাতত আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হচ্ছে। টিকিটগুলিও ফেরত দিতে হচ্ছে, কেননা যাঁর আসবার কথা ছিল—ওদিক থেকে কোনো অসুবিধের জন্যই হয়তো তিনি এসে পৌঁছুতে পারেন নি। আমি তাকে বললাম, বাসের টিকিট ফেরত দিয়ে যে টাকাটা পাওয়া যাবে তা সে নিজেই খরচ করতে পারে।

আমি একটা রেঁস্তোরাতে দুপুর বেলার আহার সেরে নিলাম, তারপর চার মাইল পথ হেঁটে চলে গেলাম 'দারুল আমনে' (এখন বলা হয় 'দারুল ফানুন') পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে নেতাজীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লার রাজত্বকালে এইটি নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি বিরাট এবং সুন্দর প্রাসাদ—চারদিক সুন্দর অঙ্গন ও বাগানে ঘেরা। এখনও এটি সযত্নে সুরক্ষিত—প্রাসাদটি সেই আমলের কারুকলার এক সার্থক নিদর্শন। যে পথটি এই প্রাসাদের দিকে চলে গেছে সে পথে মোটরে যেতে চমৎকার লাগে—পথের দু'পাশে দীর্ঘ পপলার গাছ।

নেতাজী এলেন নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে। গাড়ীর চালক ছিলেন দূতাবাসের দ্বিতীয় ইতালীয় সেক্রেটারি মিঃ ক্রেশ্‌নিনি। তিনি ছিলেন সরকার পক্ষের একজন বিশ্বস্ত লোক, ছিলেন মুসোলিনীর দলে। মিঃ ক্রেশ্‌নিনি কানে একটু কম শোনেন। ইতালিতে যেসব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মুসোলিনী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন—মিঃ ক্রেশ্‌নিনির ভূমিকা তাতে ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নেতাজীকে তার

বিগত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী শুনিয়েছিলেন—আমি নেতাজীর মুখে শুনেছিলাম।

মিঃ ক্রিশ্‌নিনি চলে যাবার পর আমরা পায়ে হেঁটে কাবুলে ফিরে এলাম। উত্তমচাঁদের বাড়ীতে যখন এলাম তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাড়ীতে পৌঁছুবার কিছুক্ষণ পর উত্তমচাঁদ ও জিয়নলালও এলো। জিয়নলালকে নেতাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। নৈশভোজনের পরে জিয়নলাল চলে গেল।

এরপর নেতাজী দূতাবাসে যেসব কথা হয়েছিল—সব বললেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতালীয় মন্ত্রী আমার কাছে ২২ শে ফেব্রুয়ারী যে তিনটি প্রস্তাব করেছিলেন সেই তিনটিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছেন, তাদের দু'জন কূটনৈতিক দূতের আগমন প্রতিদিনই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন এইখানেই থেকে যাবেন—তার পাসপোর্ট ও ভিসা নেতাজী ব্যবহার করবেন, শুধু পাসপোর্টের ফটোটা খুলে নেতাজীর ফটো ভরে রাখলেই চলবে। মন্ত্রী বলেছেন যে, তারা তিনটি প্রস্তাব সম্পর্কেই কাজ করে চলেছেন—যেটি আগে সফল হবে, সে পথেই নেতাজীকে নিয়ে যাওয়া হবে। মন্ত্রী নেতাজীকে বোঝাতে পেরেছেন যে আমাদের নিজেদের চেষ্টায় যাওয়া ঠিক হবে না। প্রথমত, সোভিয়েত সীমান্ত পার হবার পথে কতকগুলো বিশেষ বাধা আছে। দ্বিতীয়ত, ঐ বাধা পার হতে কৃতকার্য হলেও সীমান্তের ওপারে কতকগুলো বিশেষ বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। সোভিয়েত প্রহরীদল আমাদের না-ও বুঝতে পারে—আমাদের আইনভঙ্গকারী, দস্যু বা চোরাচালানদার ভেবে ক্ষতি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত নেতাজী নিজেদের চেষ্টায় যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করেন।

আমরা কিন্তু ইয়াকুবের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললাম—তাকে বললাম, বিশেষ কারণে আমাদের লোক এখনও পৌঁছুতে পারেন নি—পরে আসতে পারেন।

এখন থেকে আর হের টমাস বা জার্মান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কোনো প্রয়োজন রইল না। ইতালীয় দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গেল। এখন থেকে

ঔঁার দেখা করতে যাবার আগে ব্যবস্থা করে নেবার দরকার হতো না। ওরাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন উত্তমচাঁদের দোকানে খদ্দের হয়ে এসে। যখন আমাদের দিক থেকে কোনো সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন হতো আমি যেতাম নিউ কাবুলে মিঃ ক্রিশ্‌নিনির গৃহে। তাদের তরফ থেকে মন্ত্রীর স্ত্রী মিসেস অ্যালবার্টো পিয়েট্রো কোয়ারোনি চলে আসতেন উত্তমচাঁদের দোকানে, সেখানেই কোনো খবর দেবার থাকলে দিয়ে যেতেন। কোনো বার্তা না থাকলেও তিনদিন কি চারদিন পর পর আমাদের যেতে হতো সর্বশেষ পরিস্থিতি জানবার জন্য। এখন থেকে আর আমাদের করবার কিছুই রইল না---শুধু শেষ সংবাদটি ওদের কাছে শোনা ছাড়া—সেই সংবাদ এই— 'ব্যবস্থা সম্পূর্ণ, নেতাজী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হোন।'

নয়

যাবার পথের পথিক

আফগানিস্তান ছেড়ে নেতাজীকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা যেসব কাজ করে যাচ্ছিলাম তার চাপ অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়েছিল।

হাতে প্রচুর সময়—মাথায় দুর্বহ চিন্তার বোঝাও নেই, কাজেই আমরা দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়ে যেতে লাগলাম।

আধুনিক আফগান ফ্যাশানে নেতাজীর দাড়ি সুন্দর করে ছাঁটা, দেহে ইয়োরোপীয় পোশাক মাথায় 'কারাকুলি' টুপি। এই বেশে নেতাজী ইতালীয় দূতাবাসে যেতেন; নেতাজী ও আমি শহরেই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। আমরা এখন আশান্বিত হতে পেরেছিলাম যে আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হবে—তবে একটু সময় লাগতে পারে, এই পর্যন্ত।

এখন আমাদের যথেষ্ট অবসরও ছিল। তাই, হাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কিছু ব্রিটিশ-বিরোধী ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন কি না—তারা এমন লোক হবেন যারা অতীতে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

হাজি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে গেলেন।

এদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত 'বান্নু' থেকে আসা একটি দল ছিল—এরা ব্রিটিশের আতঙ্কে কাবুলে এসে বসবাস করছে। শের আফজল খান ছিলেন এদেরই একজন; তাঁকে নেতাজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। পরে আফগান পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল—উপজাতীয় অঞ্চলে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচারের কাজ শেষ করে যখন সহকর্মীদের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন সেই সময়ে। এঁর দুই ভাই আফগান সৈন্য বিভাগে কাজ করতো



গ্রন্থকার ভগতরাম তলোয়ার ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী রামকাউর



হিটলার কল্পিত ভারত আক্রমণের পথ

—তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কাবুলের এই 'বাম্ন্'দলের আরও অনেক আত্মীয়-পরিজন সবাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এদেরই মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াকুব খান—তিনি ছিলেন লালকুর্তা আন্দোলনে একজন সেনাপতি। ১৯৩১-এ হরিপুর জেলে ইনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন।

এই প্রতীক্ষার দিনগুলিতে নেতাজী প্রায়ই বেড়াবার উদ্দেশ্যে বাইরে যেতেন। পরনে থাকতো ইয়োরোপীয় পোশাক আর উত্তমচাঁদের কাছে ধার-করা একজোড়া জুতো। এই জুতো জোড়া নেতাজীর পায়ে একটু আঁটসাঁট হয়েছিল, পায়ে সামান্য লাগতো। তাই তিনি স্থির করলেন নিজের জন্য একজোড়া জুতো কিনে নেবেন।

একদিন আমরা একটা জুতোর দোকানে গেলাম। নেতাজী নিজেই জুতো চাইলেন; এতে সম্ভবত আমাদের দিক থেকে অসতর্কতার পরিচয়ই দেওয়া হলো; কিন্তু আমরা তখন যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করেছিলাম, আত্মবিশ্বাসও ফিরে পেয়েছিলাম। তার কারণ, আমরা দেখেছিলাম বহু ভারতীয় কাবুলের অধিবাসী।

কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ালো অন্য রকম। দোকানী নিজেও ছিল ভারতীয়—নেতাজীর কথা শুনে সে অনুমান করলো, আমরাও ভারতীয়। তার ঔৎসুক্য জেগে উঠলো—শুরু হলো প্রশ্নের পর প্রশ্ন। নেতাজী তাকে বললেন—তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশের অধিবাসী, কাবুলের হবিবিয়া কলেজে এক অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এসেছেন। দোকানী বললো, সে তো ঐ কলেজের ভারতীয় অধ্যাপকদের সবাইকেই চেনে, কই তাকে তো কখনও দেখে নি। নেতাজী বললেন, ভাষা-সমস্যার জন্যই তিনি বাইরে বড় একটা বেরুতেন না—তাছাড়া, খুব অল্প দিন হলো তিনি এখানে এসেছেন। দেখা গেল, দোকানী জুতো বিক্রী করার চেয়ে নেতাজীর সঙ্গে পরিচিত হতেই বেশী উৎসুক—সে নেতাজীকে চা খেতে বললো। আমরা অবশ্য তাকে এড়িয়ে গেলাম। বললাম, আমাদের এখন বড় তাড়াতাড়ি, অন্য সময়ে এসে তার সঙ্গে কথা

বলবো। আমরা জুতো কিনে নিয়ে চটপট দোকান থেকে সরে পড়লাম।

নেতাজীর কাবুল ত্যাগের প্রায় সপ্তাহখানেক আগের কথা।

একদিন মিসেস কুয়ারোনি খবর নিয়ে এলেন উত্তমচাঁদের দোকানে। খবর এই—নেতাজীর পাসপোর্টে ব্যবহার করার জন্য ফটোর ব্যবস্থা করতে হবে, তাছাড়া যাত্রার সময়ে এবং তার পরবর্তী কালে নেতাজীর ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত পোশাকও চাই।

ফটো নেবার জন্য কথা হলো পরদিন বেলা একটা নাগাদ আমাদের 'দারুল আমনে' হাজির থাকতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্রিশ্‌নিনি গাড়ী নিয়ে এলেন, নেতাজীর তিনটি ফটো তুলে নিলেন। তিনি তাঁর গাড়ীতেই আমাদের নিয়ে এসে নামিয়ে দিলেন 'মাজাং'-এ। রওনা হবার আগেই আমরা উত্তমচাঁদকে বলে এসেছিলাম, হাজি সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে নেতাজীর পোশাকের ব্যবস্থা করতে। ফিরবার পথে নেতাজী ও আমি এলাম হাজি সাহেবের বাড়ীতে। হাজি সাহেব একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন দোকান থেকে নেতাজীর জন্য কিছু স্যুট ও শার্টিং-এর কাপড় আনবার জন্য; নেতাজী পছন্দ করে দিলে অর্ডার দেওয়া হবে। তোয়ালে, রাত্রির পোশাক, টয়লেট, কামাবার উপকরণ—এমনি আরও সব দরকারী জিনিস আগেই কিনে স্যুটকেশে ভরে দেওয়া হয়েছিল। স্যুটের জন্য যে কাপড় নেতাজী পছন্দ করে দিলেন —তা হাজি সাহেবেরই দরজির কাছে, দরজি কথা দিয়ে গেল তিনচার দিনের মধ্যেই সেলাই-এর কাজ শেষ হয়ে যাবে।

১৯৪১-এর পয়লা ফেব্রুয়ারী জার্মান দূতাবাসে যাবার আগে নেতাজী আমাকে একটি প্রবন্ধ আর দুটি চিঠি দিয়েছিলেন; ওঁর নির্দেশ ছিল—জিনিসগুলো ওঁর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসুর হাতে পৌঁছে দিতে হবে। দূতাবাস থেকে ফিরে আসার পর তারই নির্দেশমতো ঐসব দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। আমাদের হাতে তখন সময় ছিল না; তাই নেতাজী ঐগুলো খুব তাড়াতাড়ি লিখেছিলেন। এখন সময়ের কোনো অভাব ছিল না, নেতাজী সময় নিয়ে এক দীর্ঘ

প্রবন্ধ রচনা করলেন—'ফরোয়ার্ড ব্লক: এর যৌক্তিকতা', 'দেশবাসীর প্রতি আমার বাণী'। প্রথমটি পেন্সিলে লেখা, দ্বিতীয়টি কালিতে; অনেক সময় নিয়ে এবং প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি তাঁর প্রবন্ধ আর বাণীপত্রটি রচনা করলেন। রচনার পর বার বার তা পড়ে দেখলেন। তিনি ছ'টো চিঠিও লিখলেন—একটি বাঙলায় শরৎচন্দ্র বসুর কাছে, আর একটি ইংরেজীতে ফরোয়ার্ড ব্লকের তখনকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবীশরের কাছে। এই সময়ে তিনি স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ-কল্পনায় যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন। সেই পতাকা হবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেরও পতাকা। তিনি নানা ধরনের নক্সা আঁকলেন—শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন সরল ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাই উপযুক্ত হবে।

নেতাজী এই সব প্রবন্ধ ও চিঠি ১৯৪১-এর ১৬ই মার্চ আমার কাছে দিয়ে বললেন, এইগুলো কলকাতায় হাতে হাতে দিতে হবে, বিস্তৃত নির্দেশও আগেকার মতোই দিয়ে রাখলেন। তিনি আমাকে বললেন—তিনি চলে আসার সময় শার্দুল সিং কবীশর তাঁর কাছে শপথ করেছিলেন, উপযুক্ত সময়ে এই সংগ্রামের সফলতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। নেতাজী আমাকে বললেন—ফরোয়ার্ড ব্লকের কাজ সম্পর্কে তার মত ও পথের কথা যেন আমি মুখে কবীশরকে বুঝিয়ে বলি। নেতাজীর কাছেই আমি জানতে পেরেছিলাম—তাঁর ভাই শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁর ভাইপো শিশির বসুর পরে তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা হলেন সত্যরঞ্জন বক্‌সি, লীলা রায় ও অনিল রায়। তাঁরা সবাই কলকাতায় আছেন। তিনি আমাকে বলে দিলেন ভারতে ফিরে গিয়ে যেন আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করি।

১৪ই মার্চ হাজি সাহেব ও তাঁর স্ত্রী তাঁদের বাড়ীতে পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজন ও চা-এর জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। ১৫ই মার্চ ভোরে চা-পর্ব শেষ করে আমরা উত্তমচাঁদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম; তারপর কাবুলের শহরগুলিতে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি

করে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে হাজি সাহেবের বাড়ীতে এলাম। বিকেলটাও সেইখানেই কাটলো।

চা-পানের সময় প্রায় চারটা নাগাদ উত্তমচাঁদ এলো সেই শেষ সংবাদ নিয়ে যার জন্য গত সপ্তাহগুলো কত উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটিয়েছি। ইতালীয় দূতাবাস থেকে যে সংবাদ এসেছে তা এই : নেতাজীর জিনিসপত্র যেন দোকানে রাখা হয়; সেখান থেকে ১৬ই মার্চ বেলা ছ'টায় দূতাবাসের কর্মচারীরা তা তুলে নেবে। সংবাদের অবশিষ্ট অংশ এই—আমরা যেন ১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় ক্রিশ্ নিনি-র গৃহে উপস্থিত থাকি; নেতাজীর কাবুল ত্যাগের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে ১৮ই মার্চ ভোরে।

১৬ই মার্চ নেতাজীর জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হলো দোকানে। ঐ দিনই নেতাজীর জন্য উত্তমচাঁদ একটা ভালো ফেল্ট টুপি কিনে রাখলো। নেতাজী আর আমি শহরের বিভিন্ন বাজারে ও পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম।

ব্যবস্থা মতো ১৭ই মার্চ কাবুলে, আমাদের শেষ দিন। আমাদের গৃহকর্ত্রী আমাদের জন্যে এক বিশেষ ধরনের প্রাতরাশ প্রস্তুত করলেন। পরম তৃপ্তিতে তা গ্রহণ করলেন নেতাজী; তিনি বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করলেন, হাসি-তামাশায় মত্ত হয়ে উঠলেন। আমাদের অবস্থানকালে আমরা যে ব্যবহার ওদের কাছে পেয়েছি তার জন্য গৃহকর্ত্রীকে উচ্ছ্বসিত ধন্যবাদ জানালেন।

দিনের কিছুটা সময় দৃশ্য দেখে কাটলো। আমরা তারপর হাজি সাহেবের বাড়ীতে গেলাম—নেতাজী তাঁদের বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। শের আফ্ জল খানও সেখানে ছিলেন।

ক্রিশ্ নিনির বাড়ীতে পৌঁছুলাম সন্ধ্যা প্রায় সাতটায়। উত্তমচাঁদও সঙ্গে ছিল—নৈশ ভোজনের শেষে সে ফিরে এলো। অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে নেতাজী আর আমি রাত্রি কাটালাম; দু'জনের মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো।

ক্রিশ্ নিনি ও উপস্থিত অন্য আর একজন ইতালীয় ভদ্রলোককে নেতাজী জানালেন, আমিই হবো ভারত ও কাবুলের মধ্যে সংযোগ-

সূত্র ; সুতরাং আমারও কাবুলের মধ্যে যাতে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থা তাদের করতে হবে। তিনি তাদের একথাও জানালেন, উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে আমার উপযোগী যোগাযোগসূত্র রয়েছে এবং আমার কাজ হবে প্রধানত উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতেই।

ক্রিশ্‌নিনির বাড়ীতে অতিথি-কক্ষে নেতাজী ও আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৯৪১-এর ১৮ই মার্চ ভোরে একটা বড় গাড়ী এসে ক্রিশনিনির বাড়ীর সামনে থামলো। তখনও অন্ধকার ছিল।

গাড়ীতে ছিলেন জার্মানীর ডক্টর ওয়েঞ্জার, জার্মান দূতাবাসের আর একজন ভদ্রলোক, একজন ইতালীয় দূত এবং একজন ইয়োরোপীয় চালক। গাড়ীটা যখন বেরিয়ে গেল নেতাজীকে নিয়ে তখনও অন্ধকার ছিল।

যাবার আগে নেতাজী আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন—পরম স্নেহে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, ক্রিশ্‌নিনির সামনেই আমাকে বললেন—'সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে তোমাকে অন্য আর এক কমরেড্‌কে নিযুক্ত করতে হবে।' তিনি আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন—বিদায় মুহূর্তে আর কিছু তিনি বলতেই পারলেন না।

নেতাজীকে বিদায় দিয়ে, ক্রিশ্‌নিনি-র কাছ থেকেও বিদায় নিয়ে আমি ফিরে গেলাম উত্তমচাঁদের বাড়ীতে। ওদের কাছে নেতাজীর যাত্রার কাহিনী বললাম।

তারপর বেশ কিছুদিনের পর খুব আরাম করে স্নান করে নিলাম। আমার উপরে যে কর্তব্যভার ন্যস্ত হয়েছিল তার এই সার্থক সমাপ্তিতে আমি গভীর স্বস্তিবোধ করলাম।

নেতাজীর দৈহিক গঠন ও হাবভাব অনেকটা সিসিলিয়ানদের মতো—তাই ইতালীয় পাসপোর্টে তার একটি সিসিলীয় নাম দেওয়া হয়েছিল—'অরল্যাণ্ডো মাজোত্তা', সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন তাদের ভিসার সাহায্যে।

জিয়নলাল সম্পর্কে গোড়ার দিকে আমাদের আশঙ্কা বা সমস্যা-দেখা দিলেও, এ কথা আমাকে বলতেই হবে—ঐ অবস্থায় ওর কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। তারপর যখন সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল—সে তার যথাসাধ্য সাহায্য করেছে।

এই বিস্ময়কর নাটকের অভিনয়ে উত্তমচাঁদের স্ত্রী রামো দেবীর ভূমিকা অত্যন্ত মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। কাবুলে আমাদের সমস্যা-সঙ্কুল দিনগুলিতে তিনি আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য তিনি অসামান্য কৌশল ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব যে, তাঁদের বাড়ীতে এই দীর্ঘকাল থাকার সময়ে প্রতিবেশী বা অভ্যাগতদের মধ্যে কেউ কখনও আমাদের সম্পর্কে সন্ধিহান হয়ে ওঠে নি। তাঁর বাড়ীতে নেতাজীর সাচ্ছন্দ্য বিধানে তিনি কোনো ত্রুটি রাখেন নি। তিনি নেতাজীর জন্য সুখাদ্য যুগিয়েছেন, নিজে তাঁর যত্ন করেছেন। নেতাজী যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখনও তাঁর সেবা ও যত্নের বিন্দুমাত্র শিথিলতা ছিল না। তাছাড়া, তিনি ছেলেমেয়েদের এমন সুন্দর ভাবে আগলে রেখেছিলেন যে তারা যে কথাবার্তা বলছে তা-ও আমরা বুঝতে পারি নি। তাঁর তদারকিতে বাড়ীর ভৃত্যও আমাদের কাছে উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এত বড় ব্যক্তিত্বের আশ্রয় ও নিরাপত্তার ব্যাপারে তার স্বামী যে গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার একটি প্রধান অংশ তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন—যাঁকে আশ্রয় দিচ্ছেন তিনি বিখ্যাত এবং পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা জেনেও।

উত্তমচাঁদ প্রশংসার অতীত। সাধারণ মানুষ যেখানে দ্বিধা করতো—সেইখানে সে এগিয়ে এসে সাহায্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। তার সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে আমাদের যে কি ঘটতো তা আমি ভাবতেও পারি না।

দশ

আমার কথা

আমি এবার কাবুল ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

কাবুল ছোট শহর—এখানে গোপনে চলাফেরার সুযোগ অল্প। বাহান্ন দিন নিশ্চয়ই সময়ের বিচারে 'অল্পকাল' নয়; এই দীর্ঘকাল বিভিন্ন জায়গায় স্থান পরিবর্তন করে, পুলিশের নজর এড়িয়ে আমরা কাবুলে ছিলাম। যদি ব্রিটিশ পুলিশ উত্তর-পশ্চিম ভারতের পরবর্তী অঞ্চলে আমাদের গতিবিধির বিন্দুমাত্র আভাসও পেত তাহলে এই শহরে আমাদের আশ্রয়ের সন্ধান পেয়ে আমাদের বিপন্ন করে তোলা তাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হতো না। নেতাজীকে কাবুল পর্যন্ত নিয়ে আসার আমাদের যে আয়োজন তা এমন নিখুঁত ছিল যে কোনো কথাই বাইরে প্রকাশিত হয়ে যায় নি—এমন কি ব্রিটিশ সি. আই. ডি বিভাগের প্রবলতম বাহিনীও আমাদের গতিবিধির আভাস মাত্র পান নি। তারা গুজব শুনেছিলেন যে, নেতাজী সাধু হয়ে গেছেন—তাই তারা দক্ষিণ ভারতে এবং পণ্ডিচেরীতে সাধুদের পিছনে লেগেছিলেন। এই জাতীয় গুজবের ভিত্তিতেই তারা জাপান, বার্মা এমন কি চীনের দিকে যাওয়া বিমান ও জাহাজগুলির পেছনেও ধাওয়া করেছিলেন। আমার বিষয়ে বলতে পারি, ভারতে ফিরে যাওয়ার সময় পর্যন্ত পুলিশ কখনও সন্দেহ করতে পারে নি যে আমিই নেতাজীকে কাবুল পর্যন্ত নিয়ে গেছি। এই জাতীয় গুজব কিছু কিছু ছড়ানো হয়েছিল আমাদেরই যোগাযোগ কেন্দ্রগুলি থেকে, পুলিশের মনোযোগ উত্তর থেকে দক্ষিণে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

১৯৪১-এর ১৯শে মার্চ উত্তমচাঁদ ও তার স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে, সকলের কাছেই বিদায় নিয়ে আমি কাবুল ছেড়ে জালালাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। বুদখক পর্যন্ত টাঙ্গায় গিয়ে

যাত্রী হিসেবে যাবার জন্য একটা ট্রাকের খোঁজ করলাম। বিকেল প্রায় পাঁচটায় একজন ট্রাকচালক জালালাবাদ পর্যন্ত যাত্রী হিসেবে আমাকে নিতে রাজী হয়ে গেল। ২০শে মার্চ ভোর প্রায় সাতটায় আমি জালালাবাদে পৌঁছুলাম। প্রাতরাশ শেষ করে হাজি মোহম্মদ আমিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পায়ে হেঁটে লালমনের দিকে যাত্রা করলাম। তিনি বাড়ীতেই ছিলেন; তিনি বললেন—এই কাজে আমি বড় বেশী সময় নিয়েছি। আমি তাঁকে বললাম, আগে থেকে আমাদের কোনো যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থির করা ছিল না, তাই আমাদের বহু রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন আমি তাঁকে বললাম—আমার সঙ্গী ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তখন তিনি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন; আমাকে তিরস্কারের সুরে বললেন, আমি অত্যন্ত অসৎ প্রকৃতির লোক, যেহেতু আগের বারে দেখা করার সময় এসব কথা তার কাছে খুলে বলি নি।

আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হলো। আমি তাকে বললাম—এইবার সময় এসেছে যখন আমাদের শক্তিগুলি নতুন করে বিন্যাস করা দরকার হবে, তৈরী থাকতে হবে দেশের মুক্তির জন্য ব্রিটিশদের উপর শেষ আঘাত হানবার। আমি তাকে বললাম, আমাদের শক্তির কেন্দ্রগুলি ও তাদের বাহিনীকে শেষ সংগ্রামের জন্য এবার প্রস্তুত হতে হবে—সেইজন্য তাদের যে ভাবে তিনি চান সেই ভাবেই সংগঠিত করুন।

তিনি বললেন—তিনি কাজে নামবেন, শপথ করলেন তার সমস্ত প্রভাব তিনি প্রয়োগ করবেন শিন্‌ওয়ারি আর মোহামন্দ্‌ উপজাতির উপর—ওদের সাহায্যেই তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলবেন। প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই এই সব অঞ্চলে গিয়ে আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারিত করবেন। আমি যোগাযোগসূত্র-গুলি স্থির করে ফেললাম—হাজি মোহম্মদ আমিন ও আমার মধ্যে, হাজি সাহেব ও সানোবর হুসেনের মধ্যে। ঐ সময়ে সানোবর হুসেন বাস করছিলেন বজাউর উপজাতির সঙ্গে; তিনি ছিলেন শোয়াল কিল্লার বান্দাগাই গ্রামে।

আসবার আগে আমি হাজি মোহম্মদ আমিন সাহেবের কাছে একজন নির্ভরযোগ্য 'গাইড' চাইলাম। আমি যে ভ্রমণসূচী স্থির করেছি তা তাকে জানালাম—কাবুল নদী পার হয়ে, দেহ্ হয়ে আরখি গ্রাম পর্যন্ত। আরখির পর কুদাখেল, গণ্ডব উপত্যকা, শবকদর—সেখান থেকে পেশোয়ার সোজা পথে বাসে যাবার আমার উপায় ছিল না; কেননা, আমার পাসপোর্ট ছিল না; তাছাড়া পেশোয়ার অঞ্চলের লোকেরা এইসব বাসে প্রায়ই চলাফেরা করে; তারা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। বিশেষত সেই সময়ে পুলিশ আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমি তাঁকে বললাম—আমার জন্য একজন সঙ্গী প্রয়োজন। আরখির পর থেকে আমার সঙ্গী হতে পারে এমন একজন লোকের ব্যবস্থাও তাকে করতে বললাম। তিনি একজন আফগানকে ঠিক করে দিলেন। সে নির্ভরযোগ্য আর সেই অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ।

২১ তারিখ ভোরে লালমন্ ছেড়ে চলে এলাম। পায়ে হেঁটে আরখিতে পৌঁছলাম সন্ধ্যায়; রাত্রিটা কাটালাম একটা মসজিদে। সকালবেলায় জানা গেল একদল ডোঙ্কিওয়ালা শবকদরের দিকে যাচ্ছে—এরা ছোট ব্যবসায়ী। আমার গাইড আমাকে বললো—গণ্ডব পর্যন্ত এদের সঙ্গী হয়ে যাওয়া যেতে পারে। পথে কুদাখেল-এ এক মোহামন্দের সঙ্গে রাত্রি কাটালাম। ২৩শে মার্চ খুব ভোরে আবার যাত্রা করলাম—প্রায় পাঁচ ঘণ্টার কঠিন পথ অতিক্রম করে পৌঁছুলাম গণ্ডবে। ব্যবসায়ীরা শবকদরের দিকে চলে গেল, আমি বাসে গণ্ডব থেকে এলাম শবকদরে—আমরা দুপুরের কিছু আগে শহরে পৌঁছুলাম। শবকদর পেশোয়ার জেলার একটি ভারতীয় অঞ্চল। এখানে বহু লোকেই আমাকে জানে—এদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার সঙ্গে জেলে কাটিয়েছে। সুতরাং ভাবলাম, শবকদর যত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাওয়া যায় ততই মঙ্গল। এখান থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যাত্রায় বাসের জন্য অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। এদিকে অন্ধকার ঘিরে আসবার আগে পেশোয়ারে পৌঁছুবার ইচ্ছেও আমার ছিল না; আবার এ ভয়টাও

ছিল বাসে কেউ আমাকে চিনে ফেলতে পারে। তাই টাঙ্গা ভাড়া করে রওনা হলাম।

২৩শে মার্চ বিকেল তিনটে নাগাদ পেশোয়ারের সীমান্তে পৌঁছুলাম। বালাসরের কাছে এসে আমি টাঙ্গা ছেড়ে দিলাম। অন্ধকার হবার আগে একটা আশ্রয়ের জন্যও আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। বাজার অন্দর শোহর অঞ্চলের এক দরজী—নাম অর্জন দাস, তার সঙ্গে আমার একটু সম্পর্ক ছিল। আমি তার দোকানে ঢুকে এক কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে যখন অর্জন দাসকে ঘুম থেকে ঠেলে তুললাম, সে বললো, কুচার এক বদমাস সি. আই. ডি সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর এসে আমার খোঁজ করছিল—আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি জানতাম, কুচার এই সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারী বিদ্যায় ওস্তাদ। অর্জন একথাও আমাকে জানালো—গত কিছুদিনের মধ্যে বার কয়েক এসে আমার সন্ধান করে গেছে, কারণ সে জানতো, অর্জন আমার আত্মীয়। আমি খুব আল্‌তোভাবেই মন্তব্য করলাম—পুলিশ আমাকে কিছুদিন না দেখলেই অকারণে অস্থির হয়ে ওঠে—তারপর আমার বন্ধু ও আত্মীয়দের জেরায় জেরবার করে তোলে।

পেশোয়ার থেকে আমার লাহোরে যাবার কথা; তারপর আরো এগিয়ে কলকাতায় গিয়ে আমাকে নেতাজীর বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। পেশোয়ারে আমি বিশেষভাবে পরিচিত, তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় এখানে থাকা একেবারেই নিরাপদ মনে করলাম না। এতকাল আমার ছিল আফগান পোশাক—আমি জানতাম, পেশোয়ারে ঢুকেই আমার স্বাভাবিক পোশাকেই আবার ফিরে আসা দরকার। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাছে এমন পোশাক ছিল না। কাবুলে আমি দাড়ি রাখছিলাম, জালালাবাদ থেকে ফিরতি যাত্রায় সেই দাড়ি কিছু কিছু করে ছেটে দিচ্ছিলাম। পেশোয়ারে আমি পরিষ্কার করে কামিয়ে নিলাম।

লাহোরে যাবো, তার উপযুক্ত পোশাক আমার দরকার। ২৩শে মার্চ তারিখেই রাত্রির অন্ধকারে, ঘোরানো পথ ধরে চলে গেলাম

আবাদ্‌খানের বাড়ী। সে বাড়ীতেই ছিল—তার সঙ্গে পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে তৈরী ইয়োরোপীয় পোশাক আমার জন্যে কিনে নিলাম। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে আমরা গেলাম 'নওশেরা'র কাছে 'বদরশি'তে—উদ্দেশ্য মিঞাঁ আকবর শাহের সঙ্গে দেখা করা। আকবর শাহ্‌ বেরিয়ে এসে আমাদের একটা পাশের ঘরে নিয়ে গেল। আবাদখান ফিরে গেল। সেই রাতে নেতাজী ও আমি ২১শে জানুয়ারী কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা করার পর যা যা ঘটেছিল সবই আকবর শাহকে জানালাম। আমি ওকে বললাম, ওর সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু যোগাযোগ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন—সুতরাং আমাদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। সে আশ্বাস দিল, প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই করবে এবং লাহোরে আমাকে সংবাদ পাঠাবে।

পরদিন, ২৪ শে মার্চ, ভোরে আকবর শাহের এক ভাইপো এলো টাঙ্গা নিয়ে। সেই টাঙ্গায় চেপে আমরা অকোরার দিকে এগিয়ে গেলাম—অকোরা বড় রাস্তার উপরেই। একটা ছোট জায়গায় এসে টাঙ্গা ছেড়ে দিয়ে আমরা পেশোয়ার-চম্বলপুর বাসে উঠে পড়লাম। চম্বলপুর থেকে আর একটি বাসে রাওলপিণ্ডি। রাওলপিণ্ডি থেকে রাতে ট্রেনে চাপলাম—২৫ শে মার্চ ভোরে পৌঁছুলাম লাহোরে। পেশোয়ার থেকে রাওলপিণ্ডি পর্যন্ত আমার সব সময়েই একটা ভয় ছিল, কারণ আমি এই অঞ্চলে অনেকেরই পরিচিত, এই অঞ্চলের পুলিশও আমাকে চিনে ফেল্‌তে পারে। তাদের নজর এড়াবার জন্য আমাকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হয়েছিল।

লাহোরে একটা হোটেলে থাকবার জায়গা ঠিক করে নিলাম। তারপর আমি গেলাম কৃষ্ণ নগরে 'পণ্ডিত বলভদর'-এর কাছে। তাকে বললাম, আমি গুর চরণ সিং সৈঁঞ্র ওরফে হিদায়েত খানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলভদর হিন্দী 'মিলাপ' কাগজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, অন্যান্য কম্‌রেডের সঙ্গে ইনিই ছিলেন যোগসূত্র; আর সৈঁঞ্র ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং যে সামান্য সংখ্যক বিশিষ্ট কমরেড তখন জেলের বাইরে ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি সাহিত্য

বিষয়ে গোপনে কাজ করছিলেন। বলভদর আমাকে বললেন, তিনি আমার সম্পর্কে সৈঁশ্রকে জানাবেন—পরদিন কাছাকাছি একটা পার্কে এলেই তার সঙ্গে দেখা হবে।

পরদিন অর্থাৎ ২৬ শে মার্চ ভোরে—৬-৩০ টায় আমি এলাম পার্কে, দেখলাম সৈঁশ্র আগেই এসে বসে আছেন। তিনি বললেন, যেখানে আমরা কথাবার্তা বা আলোচনা প্রভৃতি করতে পারি সেখানে যাওয়াই নিরাপদ। তখন আমি যেখানে ছিলাম সেই হোটেলে তাকে নিয়ে এলাম। সেখানকার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে সৈঁশ্র'র বাড়ীতে গেলাম। খুব বড় বাড়ী—শুনেছিলাম মালিক নাকি দলের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বাড়ীর কিছু অংশ দলকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল—পার্টির গোপন অফিস তখন ওখানেই ছিল। কয়েকজন কমরেডও সেখানে ছিলেন—কাবুলে আমাদের এত বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল জেনে আর রুশীয় দূতাবাসের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারি নি শুনে তারা খুব দুঃখিত হলেন। তারা বললেন—স্থায়ী যোগাযোগ যাতে স্থাপিত হয় তার একটা ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা দরকার। সে রকম ব্যবস্থা থাকলে ভবিষ্যতে আমাদের কমরেডরা আর এমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন না। আমি তাদের বললাম, কলকাতায় আমাকে যেতে হচ্ছে নেতাজীর বার্তা পৌঁছে দিতে, আমার সঙ্গে একজন কমরেড থাকলে ভালো হয়। তারা রাজী হয়ে একজন বিশ্বস্ত কমরেডকে আমার সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমি সৈঁশ্রকে জানালাম, আমাকে শার্দুল সিং কবীশরের সঙ্গে দেখা করতে হবে—নেতাজীর বার্তাসহ একটি চিঠি তাকে দিতে হবে। সৈঁশ্র আর কবীশর পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা দুজনে কবীশরের বাড়ীতে গেলাম। কবিশর সেই সময়ে ফরোয়ার্ড ব্লকের অস্থায়ী সভাপতি ছিলেন, তাছাড়া, আমার যতদূর মনে পড়ে, একটা জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানেরও তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান।

সৈংশ্র আমার পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি নেতাজীকে কাবুলে নিয়ে গেছি আর তাঁর কাছে এক বার্তা নিয়ে এসেছি। আমি নেতাজীর চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম, নেতাজী আমাকে মুখে যা বলতে বলেছিলেন তাও বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম।

আমি অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়লাম এই দেখে যে, সব-কিছু শোনার পর তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বার বার তিনি জানালার বাইরে তাকাতে লাগলেন। নেতাজীর চিঠিটা পেয়েই তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। কিছু পরেই ফিরে এসে বললেন, চিঠির লেখার সঙ্গে তিনি নেতাজীর লেখা অন্য যেসব দলিলপত্র রয়েছে—তা মিলিয়ে দেখেছেন—দেখে তাঁর মনে হয়েছে আমি যে চিঠিটা দিয়েছি তা আসল নয়। তাঁর ভীতিগ্রস্ত ভাব দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ ছিলনা যে ত্রাসে তাঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে—তাই এসব ব্যাপারে যাতে জড়িয়ে না পড়েন সেই চেষ্টাই করছেন। তিনি একবারও নেতাজীর নাম উল্লেখ করলেন না।

আমি অত্যন্ত আহত হলাম এই সত্যটুকু আবিষ্কার করে যে, আমাদের নেতাদের মধ্যেও কেউ কেউ তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এত কাপুরুষ হতে পারেন। যখন তিনি বার বার বলতে লাগলেন, চিঠিটা জাল তখন মনে হল তিনি এই ইঙ্গিতই করছেন যে আমাদের চলে যাওয়া উচিত। আমি তাঁকে বললাম, চিঠিটার সম্পর্কে তিনি যা ভাবছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার—আমি শুধু বলতে পারি চিঠিটা স্বয়ং নেতাজীর লেখা। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম—কারো কাছে যেন তিনি প্রকাশ না করেন যে নেতাজীর চিঠি তাঁর কাছে এনে দেওয়া হয়েছে।

আমরা চলে এলাম। অবশ্য আমাদের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, তিনি এত ভয় পেয়েছেন যে একথা কিছুতেই কারো কাছে প্রকাশ করতে পারেন না।

কিন্তু আমরা ভাবলাম, নেতাজী অকূলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কবীশরের মতো লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেই; ভারতের মুক্তি-সাধনার অশেষ দুঃখবরণের নিঃসঙ্গতায় তারা তাঁকে ঠেলে দিয়ে নিজেরা

নিরাপদ ও আরামের গৃহজীবন ভোগ করছেন! একটি প্রবাদ বাক্যের কথা আমার মনে পড়ে গেল—'চড়্ যা বেটা শূলি, রাম ভালি করে গা!' যাও বৎস, শূলে আরোহণ কর, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন!

মিঞাঁ মীর ক্যান্টনমেন্ট লাহোর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা ছোট স্টেশন; এখান থেকেই ২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় আমি কলকাতার ট্রেনে উঠলাম—সঙ্গে সোধি হারমিন্দর সিং। ৩০শে মার্চ ভোরে আমরা নেমে পড়লাম বর্ধমান স্টেশনে। স্টেশনেই স্নান শেষ করে প্রাতরাশের পরে আমরা একটা লোক্যাল ট্রেন ধরলাম।

কলকাতায় এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে আমরা এসে উঠলাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে সেন্ট্রাল হোটেলে। কেননা, অন্যান্য বারে এসে হারমিন্দর সিং এই হোটেলেই উঠেছে। সন্ধ্যায় আমরা ১নং উডবার্ন পার্কে গিয়ে শরৎবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য একটা স্লিপ পাঠালাম। ভৃত্য স্লিপটা নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শিশিরবাবু নীচে নেমে এলেন এবং একতলাতেই আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। নেতাজী আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শরৎবাবু বাড়ীতে না থাকলেও আমি যেন শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করি, কেননা নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে সব কথাই তাঁর জানা। আমি তাঁর হাতে নেতাজীর লেখা দুটো প্রবন্ধ, নেতাজীর চিঠি তুলে দিলাম, আর সেই সঙ্গে কাবুল থেকে নেতাজীর নিরাপদ যাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ দিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি উপরে উঠে গেলেন—যাবার আগে আমাদের বললেন, আরও একটু অপেক্ষা করতে। আমরা ওঁর পিতা শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো এইটেই উনি চেয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পর শরৎবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উনি এলেন। আমি তাঁর কাছে নেতাজীর কাবুল থেকে যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলাম। দুজনেই গভীর আগ্রহ নিয়ে সব কথা শুনলেন এবং উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠে নেতাজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। শরৎবাবু তাঁর বাড়ীর চারধারে পুলিশের কড়া

নজর সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিলেন, আর বলে দিলেন এর পর আর এ বাড়ীতে এসে দেখা করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। তিনি আমাদের বললেন, সাধারণত সকাল বেলায় তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেনে বেড়াতে যান—আমরা যেন তাঁর সঙ্গে পরদিন ভোরে সেখানে দেখা করি।

পরদিন, অর্থাৎ ৩১শে মার্চ, খুব ভোরে সেই গার্ডেনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাদের কাছে ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ শুনতে চাইলেন, আমাদের কাবুল-বাসের ইতিহাস জানতে চাইলেন—কাবুল ছেড়ে বাইরে যাবার ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও অনেক প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে সমস্ত কাহিনীটিই আনুপূর্বিক বুঝিয়ে বললাম—পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত নেতাজীর দুঃসাধ্য অভিযানের বর্ণনা—তারপর কাবুল ছাড়িয়ে তাঁর যাত্রার ইতিহাস—আগে যেমন বলেছিলাম মোটামুটি সেই ভাবেই বলে গেলাম।

আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎকারের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট হলো প্রিন্সেপঘাট, পরদিন ভোরে। সেইদিন—অর্থাৎ ১লা এপ্রিল প্রথমে আমরা দেখা করবো ঘাটে শরৎবাবুর সঙ্গে, তারপর প্রতীক্ষা করবো সত্যরঞ্জন বক্‌সির জন্য—শরৎবাবু এই ব্যবস্থাই করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সত্যবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো না, কেননা কেউ কাউকে আমরা চিনতে পারি নি, যদিও চেনবার কয়েকটি সঙ্কেত আমাদের দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাদের কোনো আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। তিনি একথাও জানালেন, নেতাজীর চিঠিতে অবশ্য এ বিষয়টির কোনো ইঙ্গিত তিনি পান নি, তবু তাঁর স্ত্রী বলেছেন, বাঙলায় লেখা ওঁর চিঠির কোথাও নাকি তিনি তার আভাস পেয়েছেন। এই কথায় আমার মনে পড়ে গেল শরৎবাবুর স্ত্রীর সম্পর্কে নেতাজীর সশ্রদ্ধ উক্তিগুলি: একটা বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিচারের ক্ষমতা, কোনো বিষয়ের তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষমতা, কোনো বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হতে গিয়ে কেমন সুকৌশলে তিনি মানিয়ে নিতে পারেন—নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে

পারেন ইত্যাদি কথাগুলি! এই গুণের জন্যই নেতাজী সারাজীবন তাঁর কাছে প্রভূত সাহায্য পেয়ে এসেছেন।

শরৎবাবুকে আমি সরলভাবেই জানালাম—ফিরে যাবার সময়ে আমার ৬শো টাকার দরকার হতে পারে।

শরৎবাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রিন্সেপঘাট থেকে ফিরে বেলা সাড়ে দশটায় হাইকোর্টের সামনে তাঁর চেম্বারে গেলাম। এরই মধ্যে তিনি সত্যরঞ্জন বক্সিকে জানিয়ে রেখেছিলেন—চেম্বারে এসে সাক্ষাৎকারের এই ব্যবস্থার কথা। সত্যবাবুকে তিনি ঐখানেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, কেননা অন্যত্র সাক্ষাৎ হলে আমরা একে অন্যকে চিনতে পারতাম না। এই সাক্ষাৎকারের খুবই প্রয়োজন ছিল। কারণ, আমি শরৎবাবুকে বলেছিলাম, আমরা দুজন কমরেডের সহযোগিতা ও সাহায্য চাই। এদের কাবুলে নিয়ে যাওয়া হবে ইতালী ও জার্মানীর অন্তর্ঘাতমূলক কাজে শিক্ষা গ্রহণের জন্য। একজন যাবে পাঞ্জাব থেকে আর একজনকে পাঠাতে হবে বাঙলা থেকে। শরৎবাবু আমাকে বলেছিলেন এ বিষয়ে তিনি সত্যরঞ্জন বক্সির সঙ্গে কথা বলবেন, কেননা এজাতীয় কাজের ভার তার উপরেই আছে। তিনি আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন একথাও জানিয়েছিলেন।

চেম্বারে শরৎবাবুর নিজের আসবার কথা ছিল না। একজন গোঁফওয়ালা মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে আমরা সেখানে দেখতে পেলাম। তার কাছে শরৎবাবুর নাম উল্লেখ করা মাত্র তিনি আমাকে নগদ দুশো টাকা হাতে দিলেন। সত্যরঞ্জনও সেই চেম্বারে ছিলেন—তিনি আমাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তাঁর সঙ্গে অল্পক্ষণ কথা হলো—শরৎবাবুর সঙ্গে যে দুজন কমরেডের ইতালীয় শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কথা হয়েছিল—সেই প্রসঙ্গ সত্যবাবুর কাছে তুললাম। তাঁকে বললাম, ঐ প্রস্তাব আমার সামনেই ইতালীয় পক্ষ থেকে নেতাজীর কাছে উত্থাপিত হয়েছিলো। সত্যবাবু এই কাজের জন্য একজন কমরেডকে পাঠাতে সম্মত হলেন। লাহোরে যোগাযোগ করবার

ঠিকানা দিয়ে কিভাবে সেখানে পৌঁছে জায়গাটিকে খুঁজে বার করবেন তা বুঝিয়ে দিলাম। তাঁকে বললাম ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে তাঁকে সেখানে যেতে হবে—গিয়ে তিনি ঐ ঠিকানায় হিদায়েত খানের খোঁজ করবেন। 'হিদায়েত খান' সৈঁশ্র-র ছদ্মনাম।

ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকারের সময় শরৎবাবু আমাকে বলেছিলেন যে আমার বেঁটে গঠন আর রোগা চেহারা দেখে আমার সম্পর্কে তাঁর প্রথম ধারণা খুব ভালো হয় নি। আমি তাঁকে বললাম, পেশোয়ারে প্রথম আমাকে দেখে নেতাজীরও এই রকম ধারণাই হয়েছিল। তিনি এই ভেবেই অবাক হয়েছিলেন যে, আমি কেমন করে তাঁকে কাবুলে নিয়ে যাবার মতো এমন একটি শ্রমসাধ্য এবং বিপজ্জনক কাজে সফল হতে পারবো। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ও বিষয়ে তাঁর আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আমার রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস, আর বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মধারায় আমাদের বংশের ঐতিহ্য—এই ছুটোই আমার যোগ্যতার উপযুক্ত জামিন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি শরৎবাবুর কাছে ফাঁসির মঞ্চে আমার ভাই হরিকিষণের আত্মদানের কথা উল্লেখ করেছিলাম। শরৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন, আমার কাজ ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস, নেতাজীকে যে বিস্ময়কর সাহায্য আমি করেছি—এসব কিছুই তিনি তাঁর কাছে লেখা নেতাজীর চিঠি পড়েই জেনেছেন; আমার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধাই নেই—তবে আমার দৈহিক গঠনটা আমার বিরোধী। আমি জবাবে বলেছিলাম—এই গঠনই আমার কাছে সম্পদ, কেন না এর জন্যেই আমি কারো মনোযোগ আকর্ষণ করি না।

শার্দুল সিং সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা আমি শরৎবাবুকে বলেছিলাম। কবীশরের মনোভাবের কথা জেনে তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলে—তার বিষয়ে কিছু নিন্দাত্মক মন্তব্যও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এদের মতো লোকেরা দায়িত্বজ্ঞানহীন—এরা নির্ভর-যোগ্যও নয়। নেতাজীর সঙ্গে তার দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও যে তিনি এই ব্যবহার করেছেন এটা খুবই দুঃখের কথা।

শরৎবাবু আমাকে বলে দিলেন, আমি যেন আর ওর কাছে না যাই—এই জাতীয় লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অনর্থক যেন বিপদের ঝুঁকি না নিই।

স্বভাবতই আমি একটু ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করছিলাম, ইচ্ছে হলো কলকাতায় দু-একটা দিন হাত-পা ছেড়ে কিছুটা বিশ্রাম করে যাই। কলকাতায় এটি আমার প্রথম পদার্পণ, তাই আমরা কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থানও দেখে বেড়ালাম।

আমরা কলকাতা ছাড়লাম ১৯৪১-এর ৪ঠা এপ্রিল। ৬ই এপ্রিল লাহোরে পৌঁছুলাম—সেখানে আমি ছিলাম গুরচরণ সিং সৈন্ত্র, হরবনস্ সিং কারনানা এবং চৈন সিং চৈন-এর সঙ্গে; আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হলো।

এই আলোচনার ফলে স্থির হলো, কমরেড সোদি হারমিন্দর সিং প্রশিক্ষণের জন্য যাবে কাবুলে; সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার একটি অতিরিক্ত দায়িত্বের ভারও তাকে দেওয়া হলো। কাবুলে সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের অভাব দেখে আমাদের কমরেডরা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। লাহোর ছাড়বার আগে আমি সোদি হারমিন্দর সিংকে বুঝিয়ে দিলাম পেশোয়ারে যোগাযোগের সূত্র--আবাদ খান। বাঙলা থেকে যে কমরেড আসবে তার জন্যেও নির্দেশ রেখে এসেছিলাম—আকবর শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় লাহোর থেকে রওনা হলাম; পরদিন খুব ভোরে বেদরশিতে আকবর শা'র বাড়ীতে পৌঁছুলাম। কলকাতা থেকে যে কমরেড আসবে, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে—তাছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানে এই যোগসূত্রগুলি নির্দিষ্ট করে ফেলার জন্য একটা বিস্তৃত পরিকল্পনাও তৈরী করে ফেলতে হবে—এই সব কাজের জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, যেখান থেকে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারি।

আমি স্থির করলাম, সেইদিনই ঘাল্লা দেহরে আমার নিজের

বাড়ীতে চলে যাব। আকবর শাহ সম্মত হলো—এবং মর্দানে আমার ছোট ভাই কিশোরীলালকে সংবাদ পাঠালো। কিশোরীলাল এসে রাত্রে গাড়ীতে করে আমাকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে গেল। শেষ দুই মাইল পথ আমরা হেঁটে গিয়েছিলাম। ১৩ই এপ্রিল রাত প্রায় ন'টায় আমরা গ্রামে পৌঁছুলাম।

আকবর শাহ-র কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে, যে কর্মপন্থা নিয়ে আমরা অগ্রসর হব তা তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম; তাকে জানিয়েছিলাম, একদল কমরেডকে শিক্ষিত করে প্রস্তুত রাখতে হবে আমাদের ব্রিটিশ-বিরোধী কর্মধারা চালিয়ে যাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করাই হবে তাদের লক্ষ্য। আমি আকবর শাহকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, আমার পক্ষে ওর বাড়ীতে আসা কিংবা আমাদের গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া নিরাপদ নয়, সুতরাং এমন একটি স্থানের ব্যবস্থা আগে করে রাখতে হবে যা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ আর যেখানে আমি নির্ভয়ে কাজ করে যেতে পারি।

পরদিন আমার বড় ভাই যমুনাদাস এলো বাড়ীতে; সে আমাকে বললো, আকবর শাহ-র কাছে যাওয়া বা গ্রামের বাড়ীতে থাকা—কোনোটাই আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। সে বললো, যদিও পুলিশ জানে না আমি নেতাজীকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি তবু তারা আমার সন্ধান করছে—তারা বারবার গ্রামে আসছে, আমার বন্ধু ও আত্মীয়-পরিজনের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। সুতরাং আমাকেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি তাঁকে জানালাম—আকবর শাহকে বলে এসেছি আমার জন্য একটা নিরাপদ স্থান ঠিক করে রাখবার জন্য। আমার ভাই চলে গেল আকবর শাহ-র কাছ। সেখানে তাদের মধ্যে আমার জন্য একটা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক কথা হলো—শেষে স্থান, সময় ও তারিখ এবং যেখান থেকে যে-সময়ে ও যেদিন আমাকে তুলে নেওয়া হবে তা ঠিক হলো। আকবর শাহ্ আবাদ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করলো—আবাদ খান পেশোয়ারের কিস্সা খোওয়ানি বাজারে একটা বাড়ী ঠিক করে

দিল—বাড়ীর মালিক মিঞা ফিরোজ শাহ। তিনি এক বিরাট জমিদার এবং জিয়ারত্ কাকা-খেল-এর ঠিকাদার।

১৬ই এপ্রিল অন্ধকারের আড়ালে আমার বড় ভাই-এর সঙ্গে গ্রাম থেকে দু' মাইল পথ হেঁটে চলে গেলাম। পাকা রাস্তার এক জায়গায় আবাদ খান আগেই এসে অপেক্ষা করছিল--সেই আমাকে গাড়ীতে করে পেশোয়ার নিয়ে যাবে।

সোদি হারমিন্দর আসবে, কলকাতা থেকে একজন কমরেড আসবে, তাই পেশোয়ারে প্রতীক্ষা করতে হলো। সোদি এলো ১৭ই এপ্রিল তারিখে। আমরা পেশোয়ারে কয়েকটি কেন্দ্র সংগঠিত করলাম—বান্দাগাই (সওয়াল কিল্লা), বরঙ্গ্ (বজাউর), সফি আর কুদা খেল: এই কেন্দ্রগুলির উপর ভার থাকবে, পেশোয়ার ও কাবুলের মধ্যে আরও কতকগুলো কেন্দ্র গড়ে তুলবার জন্য। শুধু গড়ে তোলা নয়, এগুলোর বিকাশ সাধনেও এদের লক্ষ্য থাকবে। একদল বিশ্বস্ত কমরেডকে সব কথা খুলে বলা হলো--এদের প্রত্যেকেরই পেছনে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে বহু বৎসরের সংগ্রামী জীবনের প্রশংসনীয় ইতিহাস রয়েছে। এই কমরেড দল তাদের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ কর্মের গৌরবে বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতেও এরা বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম—আকবর শাহ্, সানোবর হুসেন, মোহম্মদ শাহ্, কুশল খান খাটক, আবদুল রেজাক, সৈয়দ মূর্তজা, উমর খান্, মোহম্মদ কামিল, আবদুল লতিফ আফন্দি এবং মিরন জান্। এই কমরেডদের প্রত্যেককেই তার নিজের নিজের অঞ্চলে এক একটি কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হলো—আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী পালনের জন্য সেইভাবেই তার কেন্দ্রকে গড়ে তোলার দায়িত্বও অর্পিত হলো।

১৮ই এপ্রিল কলকাতা থেকে একজন কমরেড এলেন—শান্তিময় গাঙ্গুলি। আমরা তখন সংগঠনের কাজেই ব্যস্ত ছিলাম, ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য গোপন সংগঠন যন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়াও আমাদের লক্ষ্য ছিল

—তাই আরও অধিক সংখ্যক কমরেডকেই আমরা কাজে লাগাতে চেয়েছিলাম। এই ধরনের নতুন কমরেডদের মধ্যে একজন ছিলেন মীর গজন খান্—গ্রাম মানেরি, তহসীল সওয়াবি, জেলা মর্দান। এইবার আমাদের ইচ্ছে হলো আরও দীর্ঘ পথ ধরে যাবো—যাতে আরও অধিক সংখ্যক উপজাতীয়দের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ঘটে; আমরাও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবো; এই ভাবেই ধীরে ধীরে ভবিষ্যতে একটা ব্যাপক সংগ্রামের ভিত্তিভূমি রচিত হতে পারবে। যে পথ আমরা স্থির করলাম তা হবে পেশোয়ায়, মর্দান. লালজান কোরুণা, বরঙ্গ্, সওয়াল কিল্লা (বান্দাগাই), সফি, মোহামন্দ্, কুদাখেল, আরখি প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আরও দূরে।

পেশোয়ার থেকে আমরা যাত্রা শুরু করলাম ১৯৪১-এর ২০শে এপ্রিল। যাত্রার আগে আমরা একটি বিষয় স্থির করে নিয়েছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ যদি ধরা পড়ে সে সুভাষ বসু সম্বন্ধে কিছু বলবে না কিংবা তাঁর কাজের সঙ্গে কোনো রকমে আমরা জড়িয়ে আছি একথা কবুল করবে না। আমরা অনেক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম, তার মধ্যে এটি একটি।

সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা পৌঁছুলাম একটি গ্রামে—মালাকান্দ্ উপত্যকার নিকটবর্তী এই গ্রামের নাম লালজান কোরুণা। এইখানে সমুন্দর খান এবং জিয়ারত গুলের সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। এই যোগাযোগ আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছিল মীর ঘজন। সমুন্দর খান একজন কংগ্রেসসেবী ছিলেন। তিনি ছিলেন খান আবদুল গফ্ফর খানের ঘনিষ্ঠ সহচর। তাঁর ভাইপো জিয়ারত আলি ছিলেন বাম চরমপন্থী এবং কংগ্রেস-বিরোধী। জিয়ারত গুল সেখানে ছিলেন বলেই মনে হলো আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে আছি। রাত্রিটা আমরা তাদের সঙ্গেই কাটালাম। বজাউর উপজাতীয় অঞ্চলে বান্দাগাই পর্যন্ত মীর গজন আমাদের সঙ্গে থাকবে, এই রকম কথা ছিল।

পরদিন ২৭শে এপ্রিল ভোরে আমরা টাঙ্গায় যাত্রা করলাম। টাঙ্গা চালাচ্ছিলেন জিয়ারত গুল। এই যাত্রায় তারা আমাদের একজন গাইডও দিয়েছিলেন। ভোর প্রায় সাড়ে সাতটায় এমন একটি

জায়গায় এলাম যেটি উপজাতীয় অঞ্চলের কাছাকাছি। এখান থেকে জিয়ারত টাঙ্গা নিয়ে ফিরে গেলেন—আমরা পায়ে হেঁটে চললাম পাহাড়ী সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে, বেলা প্রায় একটায় গিয়ে হাজির হলাম 'দির' নদীর তীরে। নদী পার হবার জন্য একটা দড়ি আর ঝুড়ি ছিল। আমরা একের পর একজন করে পার হয়ে গেলাম।

শান্তিবাবু গরমে কিছু অস্বস্তি বোধ করছিলেন—তিনি ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঠাণ্ডায় তিনি যেন একেবারে জমে গেলেন। এরপর পায়ে হেঁটে আবার আমাদের দুঃসাধ্য যাত্রা শুরু হলো।

এবার আমরা যাবো 'বরঙ্গ্', বজাউর উপজাতীয় অঞ্চলে—কিন্তু পথে আমাদের থামতে হলো। একটা কুটিরে আমরা রাত কাটালাম পাহাড়ী লোকদের সঙ্গে। ওরা আমাদের চা দিল, খাদ্যও দিল। পরদিন ২২শে এপ্রিল ভোরে আবার পায়ে হেঁটেই যাত্রা করলাম। 'বরঙ্গ্' পৌঁছুলাম দুপুর বেলায়।

এখানে রাত কাটলো আবদুল লতিফ আফন্দীর সঙ্গে। ওর সঙ্গে আলোচনাটা খুবই কাজের হয়েছিল। আমরা আমাদের প্ল্যান তাকে জানালাম। আগামী সংগ্রামে আমরা তার কাছে কি আশা করি তাও তাকে বললাম। এই ধরনের সংগ্রামে সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে—এই বলে সে তার আগ্রহ জানালো। আফন্দী তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশও ঘুরে এসেছে: ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সে ছিল লালকুর্তা আন্দোলনের পুরোভাগে প্রধান নেতাদের মধ্যে একজন। সে ছিল একেবারে ষোল-আনা জঙ্গী কর্মনীতিরই পক্ষপাতী—আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সে বেশ খুশীই হলো। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য সে যথাসাধ্য করলো।

২৩শে এপ্রিল খুব ভোরেই আমরা 'চিনগাই' যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম—সেখানে চা আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন ঘুলামুল রেহ্‌মান। ইনি ছিলেন সানোবর হুসেনের প্রধান সহকারী—আফন্দীর সঙ্গেও পরিচিত।

তারপর আবার যাত্রা শুরু করে বিকেলে পেঁৗছুলাম সংল

কিল্লায়। এখানে দেখা হলো সানোবর হুসেন, গুলাম মূর্তজা আর উমর খানের সঙ্গে। আবদুল লতিফ আফন্দী আর মৌলানা গুলামুল রেহমানও এই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। এখানে আমরা ২৫শে এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত ছিলাম—সব কমরেড্ মিলে অনেক জরুরী বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। প্রধানত আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েই এইসব আলোচনা—সবাই এই সিদ্ধান্তে একমত হলেন যে, ব্রিটিশ যখন যুদ্ধে রত তখনই তাদের চরম আঘাত করার উপযুক্ত সময় এবং এই সুযোগ কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। মীর ঘজনও এতদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই এসেছিলেন, তাকে কমরেডদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো তারপর তাকে পাঠানো হলো নিজের আস্তানায় 'দির' রাজ্য হয়ে। সানোবর হুসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো—প্রয়োজন হলে কিছু ভালো কর্মী তিনি কাবুলে পাঠাবেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভারও তিনি নিলেন, সেটি হলো বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে যেসব কেন্দ্র রয়েছে সেখানকার সংগঠনমূলক কাজ। তিনি শপথ করলেন, আন্দোলনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য তিনি যথাশক্তি চেষ্টা করে যাবেন। সানোবর হুসেন এক সময়ে সীমান্ত প্রদেশের 'নওজোয়ান ভারত-সভা'র সভাপতি ছিলেন। ইনি ছিলেন বয়সে অত্যন্ত প্রবীণ, প্রয়োজনের দিক থেকে অপরিহার্য এবং আমাদের সংগঠনের এক প্রধান যোগসূত্র। তাকে বিশ্বাস করেই নেতাজীর নিরাপদ অন্তর্ধানের কাহিনী আমি বলেছিলাম।

২৬শে এপ্রিল ভোরে আবার যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম 'সফি' উপজাতীয়দের অঞ্চলে। সেখানে আমরা মোহম্মদ কামিলের বাড়ীতে অতিথি হলাম। ইনি সানোবর হুসেন ও আফন্দীর সমর্থক এবং তাদের বিশ্বাসভাজন। ঐ একই উপজাতির লোক আবদুল রেজাকের কাছেও আমরা গেলাম—ইনি এক অস্ত্রের কারখানার মালিক। ২৮শে এপ্রিল বেলা এগারোটায় আমরা যেখানে পৌঁছুলাম তার নাম 'কুদাখেল'—সঙ্গে ছিলেন আবদুল রেজাক।

এখানে আমাদের দেখা হলো মিরন জানের সঙ্গে—ইনি উপজাতীয়দের প্রধান—ব্রিটিশ-বিরোধী এবং বিপুল শক্তির এক অফুরন্ত উৎস। পর্যাপ্ত শিক্ষার অধিকারী তিনি ছিলেন—নিজের অঞ্চলে তার প্রভূত প্রভাব। তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তার পিতৃ পিতামহদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন, অনেক আত্মীয়-বন্ধুকেই তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে হারিয়েছেন। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তিনি আমাদের সংবর্ধনা জানালেন এবং ওখানে যে দিনটা ছিলাম—আমাদের আদর আপ্যায়ন করলেন। আফন্দী, আবদুল রেজাক আর গুলাম মর্তজা রয়ে গেলেন—তারা এইবার যার যেখানে স্থান ফিরে যাবেন।

আমরা তিনজন এগিয়ে চললাম মিরন জান একটি 'গাইড'ও সঙ্গে দিলেন। ৩০শে এপ্রিল রাত ন'টায় কুদাখেল ছেড়ে সারারাত হেঁটে কাবুল নদীর তীরে 'আরখি'তে উপস্থিত হলাম—১লা মে, প্রায় দুপুরের দিকে।

আমরা গ্রামের ভিতরে গেলাম না।

নদী পার হবার আয়োজন করতেই আমাদের কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। গাইডকে গ্রামে পাঠাতে হলো সাহায্যের জন্য—আমরা নদী পার হলাম 'জল্লা'র (ফোলানো পশুর চামড়া) সাহায্যে। পার হতে বিকেল প্রায় পাঁচটা হয়ে গেল।

পেশোয়ারে থাকতেই আমাদের ব্যবহারের জন্য ছদ্মনাম ঠিক করে নিয়েছিলাম—শান্তিময় গাঙ্গুলি—আবদুল রেহ্‌মান; সোদি হারমিন্দর সিং—শাহ্ জামান; আমার ছদ্মনাম আগের মতোই—রহমৎ খান্।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। কাবুলে আমার এই দ্বিতীয় প্রবেশের সময় আমার সঙ্গে আছেন দু'জন—শান্তিময় গাঙ্গুলি আর সোদি হারমিন্দর সিং, তারা কাবুল অঞ্চল বা আফগানিস্তানের ভাষা জানতেন না। তার অর্থ এই—এবার দু'জন সঙ্গী নিয়ে কাবুলে যাচ্ছি, দু'জনই কালা এবং বোবা। একবার সফল হলেও, বাস্তবতার বিচারে একে হয়তো সমর্থন করা চলে না। কিন্তু আমার উপায় ছিল না।

নদী বরাবর আমরা যেতে লাগলাম—গাইডকে বললাম, আমাদের এমন একটি জায়গায় নিয়ে যেতে যেখানে বিশ্রাম আর কিছু খাদ্য মিলতে পারে; কারণ এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এ দু'টোর কোনোটাই আমাদের মেলে নি।

গাইড আমাদের একটি গ্রামে নিয়ে এলো—সেখানে একটি যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যুবক মিরন জানের পরিচিত। সেইখানে অতিথি হলাম। নৈশভোজনের পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েই উঠে পড়লাম। তারপর আবার সামনের দিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল। সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবসর আমাদের ছিল না।

যার অতিথি হয়েছিলাম তার কাছ থেকেই শান্তিবাবুর জন্য একটা গাধা ভাড়া করে নিয়েছিলাম। পাহাড়ের নীচু দিয়ে বেশ ভালো পথ ধরেই আমরা কয়েক ঘণ্টা মাত্র গিয়েছি, এমন সময় শান্তিবাবুর গাধা আরও কতকগুলো গাধাকে দেখতে পেলো; গাধাগুলি এক যাত্রীদলের তাঁবুতে বাঁধা ছিলো। কিন্তু ঐ গাধাগুলোকে দেখেই শান্তিবাবুর গাধা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে শান্তিবাবুকে পিঠে নিয়েই সাংঘাতিক গতিতে ছুটে চললো। আমরাও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে শান্তিবাবুকে বাঁচাবার জন্য গাধাটার পিছনে ছুটলাম। যখন গাধাটাকে ধরলাম—দেখলাম শান্তিবাবু দুই বাহু দিয়ে গাধাটার গলা জড়িয়ে রয়েছেন! খুব ভয় পেয়েছিলেন, বলাই বাহুল্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তার চেয়েও বেশী ভয় পেয়েছিলাম, কারণ পথের একদিকে কাবুল নদী, অন্যদিকে পাহাড়ের প্রাচীর—পথ অত্যন্ত বন্ধুর এবং প্রস্তরময়—শান্তিবাবুর পক্ষে যে-কোনো কিছুই ঘটতে পারতো।

সুতরাং গাধাটাকে বিদায় দিলাম। গাধাওয়ালা বললো, সামনে একটু এগিয়ে গেলেই পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে, সে আমাদের সেইখানে যাবার পথটি দেখিয়ে দেবে।

ঐ পথে যখন উঠলাম তখনও অন্ধকার ছিল—আমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত—যদিও সেখান থেকে জালালাবাদের দূরত্ব চার মাইলও হবে না। আমরা একটা সেতুর নীচে এলাম, আমাদের জন্য একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে সেইখানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে যখন উঠলাম তখন আটটা বেজে গেছে। কাছের নুল্লায় হাতমুখ ধুয়ে নিলাম, তারপর জালালাবাদের দিকে যাত্রা করলাম—পৌঁছুলাম প্রায় দশটায়।

এর আগে কাবুল থেকে ফিরবার পথে হাজি মহম্মদ আমিনের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, এখন আর তার সঙ্গে দেখা করার কোনো প্রয়োজন নেই। খুব ক্লান্ত ছিলাম বলেই জালালাবাদে আমরা একটা ঘর ভাড়া করলাম। সেই ঘরে আমরা সারাদিন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটালাম, সন্ধ্যায় সমস্ত শহরটা একবার ঘুরে এলাম। আমি আমার কমরেডদের সেই হোটেলটি দেখিয়ে দিলাম যেখানে কাবুলে যাবার পথে নেতাজী ও আমি তুইরাত্রি কাটিয়েছিলাম। ভরা মে পেটভরে প্রাতরাশ খেয়ে নিয়ে আমরা টাঙ্গায় গেলাম সুলতানপুর—জালালাবাদ থেকে ট্রাকে যাত্রা করা আমাদের কাছে ভালো মনে হয় নি। এবার ভাষা-না-জানা তু'জন সঙ্গী আমার সঙ্গে। কিন্তু সেবার নেতাজীকে নিয়ে যেতে হয়েছিল—তার তুলনায় এবার যেন অনেকটা হালকা বোধ করলাম।

সুলতানপুর থেকে আমরা হেঁটে গেলাম ফতেহবাদ। এখানে একটা চা-খানায় গিয়ে আমরা চা চাইলাম। ওখানকার লোকেরা সাধারণত তুধ ছাড়া সবুজ চা খায়। প্রথম চায়ের কাপেই এরা চিনি নিয়ে থাকে, পরবর্তী কাপগুলোতে চিনিও থাকে না। সোদি মহীন্দর সিং (শাহ্ জামান) চায়ের কাপে আরও চিনি চাইতে লাগলেন। আমি তাকে বললাম যাতে কারও মনে সন্দেহ না হয় এই জন্যে আফগানদের প্রচলিত রীতির বাইরে পৃথক কিছু আমাদের করা উচিত নয়। আমার উপদেশ তার ভালো লাগলো না, তিনি মনে করলেন আমি তার পছন্দ মতো চা বা খাবার খেতে বাধা দিচ্ছি। এমনি ভাবেই যখন আমরা সওল কিল্লাতে খাবার খাচ্ছিলাম, আমি লক্ষ্য করলাম শান্তিবাবু (আবতুল রেহ্মান) বাঙালী প্রথায় ভাতের গোল্লা পাকিয়ে পাকিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছেন। আমি তাকে পরে বলেছিলাম, আফগানদের লক্ষ্য করুন, তাদের রীতি অনুসরণ করতে

চেষ্টা করুন—যাতে কেউ সন্দেহ না করে। এই প্রশ্নটি নিয়ে পরে আমি শাহ্ জামানের সঙ্গেও বেশ খোলাখুলি আলোচনা করেছিলাম কিন্তু নিজের মত তিনি ছাড়েন নি। তিনি বললেন, খাওয়ার ব্যাপারে সবাই এক রকম আচরণ করবে এমন আশা করা অন্যায়।

দুপুরবেলা ফতেহবাদ থেকে ট্রাকে চেপে আমরা বুদখাকে যখন পেঁাছুলাম তখন মধ্যরাত্রি। এইটেই সীমান্ত পার হয়ে যাবার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এইখানে নানান ধরনের প্রশ্ন করা হয়। প্রত্যেক যাত্রীকে এক রেজিস্টারী খাতায় নাম ও ঠিকানা লিখতে হয় —এই উদ্দেশ্যেই একটা খাতা সেখানে রাখা আছে।

এবারেও আমরা নাম-ঠিকানা না লিখেই গেট পার হয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারতাম, কারণ অধিকাংশ কর্মচারীই তখন ঘুমিয়ে ছিলেন।

অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে আমরাও একটা চা-খানায় গিয়ে ঘুমিয়ে রইলাম।

৪ঠা মে সকাল দশটায় আমরা টাঙ্গায় করে কাবুলে পেঁাছুলাম। পেঁাছেই সোজা চলে গেলাম সরাই জাজিয়ান্-এ, যেখানে নেতাজী ও আমি ছিলাম। এবার উপরের তলার একই সারিতে শেষ ঘরটি আমরা ঠিক করলাম।

প্রায় একটার সময় উত্তমচাঁদের দোকানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম, তাকে আমার সঙ্গী দু'জন কমরেডের কথাও বললাম। সে কৌতুকের সুরে প্রশ্ন করলো —ওরাও কি বোবা ও কালা?

ঐ দিনই সন্ধ্যায় আমি ক্রিশ্ নিনির সঙ্গে তার বাড়ীতে গিয়ে দেখা করলাম; তাকে বললাম, নেতাজীর সঙ্গে তার যেমন কথা হয়েছিল সেই অনুযায়ী আমি আমাদের দু'জন কমরেডকে এনেছি—প্রশিক্ষণের জন্য। তিনি আমাকে বললেন, পরদিন তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে একটা কর্মসূচী ঠিক করে নেবেন—আমি যেন ৫ই মে সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করি।

পরদিন সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন—৬ই মে বেলা ২টা নাগাদ

আমাদের 'পাঘমান' যেতে হবে। যে বাড়ীতে যেতে হবে তার একটা বর্ণনা আমাকে দিলেন, আর একথাও জানালেন যে দূতাবাস থেকে একটা দল একই সময়ে সেখানে উপস্থিত হবে।

প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে এই পাঘমান। আমরা তিনজন বাসে চড়ে গেলাম—নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে পৌঁছে বাড়ীটাও ঠিক করে নিলাম। দলটিও একই সময়ে এলো—আমরা তাদের সঙ্গে ঐ বাড়ীতে গেলাম। দলে ছিলেন ইতালীয় মন্ত্রী মিঃ কুয়ারোনি, তাঁর স্ত্রী—আনজালোত্তি এবং কাবুলে নবাগত একজন জার্মান। (পরে পরিচয় হয়েছিল, নাম রাস্‌মাস্‌)। তিনি আমাদের বললেন—ব্যবসা-সূত্রে তিনি ভারতবর্ষে, বিশেষত কলকাতায় দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, ভাঙ্গা বাঙ্‌লায় কথাও বলতে পারেন। তিনি জানালেন, আমাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেবার জন্যই তাকে জার্মানী থেকে আসতে হয়েছে।

আমি আমার দু'জন কমরেড—সোধি ও শান্তিবাবুকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম; তাদের বললাম, পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দুই কমরেড এখানে এসেছেন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবার জন্য—প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আপনারাই করবেন। তারা কথা দিলেন 'ট্রেনিং' এর কাজ দ্রুত শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল তাদের এই পরিকল্পনা কোনো-দিনই কার্যে পরিণত হয় নি। কাবুলে আসবার পথে যেসব উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে সেখানকার অভিজ্ঞতার কথা তাকে সংক্ষেপে বললাম—অনুরোধ করলাম সুভাষবাবুর কাছে আমাদের কাজের একটা বিবরণ পাঠাতে। তিনি জানালেন, নেতাজীর ভ্রমণ খুবই স্বচ্ছন্দ হয়েছে। সোভিয়েত-সীমান্ত থেকে তিনি ট্রেনে গিয়েছিলেন, মস্কোতে ছিলেন দুদিন। সেখান থেকে বার্লিনে গিয়ে জার্মান নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এইভাবে তাদের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে কাবুলে আমাদের সরাইতে আবার বাসে চলে এলাম। আসবার আগে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের সময় ও স্থান ঠিক করে নিয়েছিলাম।

কাবুলের কাছে পাঘমান একটি সুন্দর পার্বত্য আশ্রয়। দূতাবাসের কর্মচারিগণ, আফগান সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ সপ্তাহ শেষে বা ছুটিতে, বিশেষত গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে আসতেন।

এই একই দলের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক হয়েছিল ৭ই মে। পাঘমানে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, একথা ওদের জানিয়েছিলাম বলেই এবার ওরা আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল এবং আসবার সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এনে নামিয়েও দিয়েছিল! এই সাক্ষাৎকারেও কোনো সুফল ফলেনি। এটি হলো প্রথম সাক্ষাৎকারের যে আলোচনা হয়েছিল মোটামুটি তারই পুনরাবৃত্তি। যেহেতু কাবুলে এখন আমাদের দীর্ঘ সময় থাকতে হবে এবং যেহেতু অনির্দিষ্ট কালের জন্য সরাইতে বাস করা নিরাপদ বা স্বাচ্ছন্দ্যজনক কোনোটাই নয়—সেইহেতু আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, থাকার উপযুক্ত কোনো স্থানের ব্যবস্থায় তারা সাহায্য করতে পারেন কি না। তারা জবাবে জানিয়েছিলেন—পারবেন না।

এরই মধ্যে উত্তমচাঁদ তার ব্যবসাটিকে পাইকারী কারবারে পরিণত করবার ইচ্ছায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলো। সে যখন প্রস্তাব করলো, আমরা আপাতত এটিকে ব্যবহার করতে পারি, তখন আমরা এই ফ্ল্যাটের একটি ঘরে চলে এলাম। এই ঘরেই আমরা প্রায় একমাস ছিলাম।

কাবুলে যখন ছিলাম, তখন প্রায়ই হাজি সাহেব ও শের আফজল খানের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তাদের সঙ্গে আলোচনার বিষয় থাকতো—'বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আমাদের ভূমিকা'। ইতালীয় দল প্রশ্ন করেছিল তাদের কাছে কি ধরনের সাহায্য আমরা আশা করি। জবাবে আমি বলেছিলাম—সেটা নির্ভর করবে ইয়োরোপে নেতাজী বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলবেন—তার উপর। তারা ইয়োরোপের যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল—তারা জানতো

খুব বেশী রকমের বাস্তব সাহায্য—অর্থই হোক বা অস্ত্রই হোক—তাদের পক্ষে দেওয়া কঠিন। তারা বলেছিল, কিছু অর্থ সাহায্য তারা করতে পারে। কিন্তু আমরা জানিয়েছিলাম নেতাজীর কাছ থেকে কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্কে আমরা জড়িয়ে পড়তে পারি না—সুতরাং তাদের সরকার মারফৎ নেতাজীর কাছ থেকে নির্দেশ আনবার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে না।

আরও কিছুকাল আমরা কাবুলে কাটালাম; কিন্তু নেতাজীর কাছ থেকে কোনো সংবাদ এলো না। সুতরাং আমরা ঠিক করলাম উপজাতীয় অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত: ঐখানে হবে আমাদের যথার্থ কর্মক্ষেত্র।

এখন কাবুলে আর আমাদের কোনো কাজ ছিল না। ইতালীয় দূতাবাসে একথা জানাতেই তারা বললো—এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরে দেখা করতে, 'পরে' কথার অর্থ একমাস বা একমাসের বেশীও হতে পারে—ঐ সময়ের মধ্যে তারা নেতাজীর কাছ থেকে নির্দেশ পাবার আশা করে। কিন্তু যার জন্যে আমাদের কমরেড দু'জন সুদীর্ঘ পথ পার হয়ে কাবুলে এলো সেই প্রশিক্ষণক্ষেত্র স্থাপনের দিকে তাদেব কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না।

তখন আমরা স্থির করলাম সোদি কাবুলেই থাকবে; তার কাজ হবে সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। পার্টি তাকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছে তাদের মধ্যে এটিও একটি; তাছাড়া নেতাজীর ইচ্ছাও তাই ছিল। আমি শান্তিবাবুকে নিয়ে ভারতে ফিরে এসে পার্টির কাছে আর শরৎচন্দ্র বসুর কাছে বিবরণ পেশ করবো।

আমি ১৯৪১-এর ১লা জুন বিকেলে শান্তিবাবুকে নিয়ে কাবুল ত্যাগ করলাম—বুদখকে পৌঁছুলাম সন্ধ্যার মধ্যে। এখান থেকে ট্রাকে চেপে আমরা এলাম জালালাবাদে, ২রা জুন ভোরে। সেখান থেকে গেলাম লালমনে হাজি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন দীর্ঘকালের জন্য বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর জামাতার

কাছে একজন গাইড চাইলাম—আমাদের 'আরখি' পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য।

আমরা পায়ে হেঁটে আরখিতে পৌঁছুলাম সন্ধ্যার আগেই; সেখানে কাবুল নদী পার হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু হেঁটেই চলে গেলাম। কয়েকটি কুটির, একটি ছোট মসজিদ আর একটি কুয়ো আমাদের চোখে পড়লো। এইখানেই আমরা হাত-পা ধুয়ে খাবার খেয়ে নিলাম, রাত্রিটাও এখানেই কাটালাম। ৩রা জুন খুব ভোরে রওনা হয়ে প্রায় দুপুর নাগাদ আমরা 'কুদাখেল'-এ পৌঁছুলাম।

'আরখি' থেকেই আমরা গাইডকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মিরন জান আমাদের নিরাপদে ফিরতে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠলো। তারপর আবার যাত্রা শুরু।

এবার গন্দব। এখানে পৌঁছে আমরা বাস নিলাম না। তারপর শব্‌কদর; পায়ে হেঁটে এখানে আসতে বিকেল পাঁচটা হয়ে গেল। ওখান থেকে একটা টাঙ্গা নিয়ে গেলাম চরসদ্দা। তারপর টাঙ্গা-বদল; নতুন টাঙ্গায় এলাম মর্দানে, ৪ঠা জুন রাত প্রায় ন'টায়। অন্ধকারের আড়ালে মর্দানে পৌঁছুবার জন্যে আমরা পায়ে-হাঁটা পথে দীর্ঘ আঠারো মাইল চলে এসেছিলাম—গন্দব থেকে শবকদর। বাসে ভ্রমণের মধ্যে খানিকটা ঝুঁকি আছেই—হঠাৎ কারো সাথে কোনো চেনা লোকের দেখা হয়ে যেতে পারে!

মর্দানে আমার বাড়ীতে আমরা গোপনে গিয়ে উঠলাম। রাতটা সেখানেই কাটলো। ৫ই জুন ভোরে উঠে শান্তিবাবু দাড়ি কামিয়ে নিয়ে তার অভ্যস্ত সাধারণ পোশাক পরে নিলেন—তারপর কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। আমি ওখানেই কয়েকটা দিন থেকে গেলাম—তারপর লাহোর রওনা হলাম। লাহোরে পৌঁছুলাম ১৩ই জুন।

এখানে পার্টির কমরেডদের কাছে আমাদের অভিযানের এক বিস্তৃত বিবরণ পেশ করলাম। তারপর লাহোরেই ক'টা দিন কাটলো।

কয়েকদিনের মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাঁধলো—

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাবনা ও পরিকল্পনার মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সুদীর্ঘ ও গভীর আলোচনা শুরু হয়ে গেল আমাদের মধ্যে; বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিবর্তিত রূপ অনুযায়ী আমাদের কর্মনীতিরও রূপান্তর ঘটলো।

কয়েকদিন পরেই আমি কলকাতা রওনা হলাম এবং সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর অফিসে গিয়ে দেখা করলাম। তাঁর কাছে আমাদের অভিজ্ঞতার একটি বিবরণও দিলাম। তিনি বললেন—নেতাজীর নির্দেশের জন্য আমার আবার কাবুলে চলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আগের মতোই আমি হোটেলে একটা ঘর ভাড়া করেছিলাম, কিন্তু শরৎবাবুর উপদেশে আমি এক পরিচিত ব্যক্তির গৃহে উঠে গেলাম; শান্তিবাবুই এই ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু-এ অবস্থিত সেন্ট্রাল হোটেলে আর একজন কমরেডকে নিয়ে এলেন—তারপর নতুন বাসস্থানে চলে গেলাম। শান্তিবাবুও সেইখানেই ছিলেন। আমি সেই আশ্রয়ে দু'তিন দিন থেকে লাহোরে চলে এলাম।

লাহোরে কমরেডদের সঙ্গে সপ্তাহখানেক কাটলো। বিশ্ব-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের মতামত ও ভাবনা আমি জেনে নিলাম। এই পরিবর্তিত অবস্থায় পার্টির কি ভূমিকা—তা ও তাদের কাছ থেকে বুঝে নিলাম। আমার অভিমত এই ছিল যে, ব্রিটিশ-বিরোধী কর্মনীতিই আমি আগের মতো চালিয়ে যাব, কেননা, আমার অঞ্চল ঐ ধরনের কাজের পক্ষেই উপযুক্ত। অধিকাংশ কমরেডই তখন এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। তারপর আমি পেশোয়ারে গিয়ে দু'দিন রইলাম, শেষে পুনর্বার কাবুলের উদ্দেশে যাত্রা।

১৯৪১-এর ৭ই জুলাই, কাবুলে আমার তৃতীয় আবির্ভাব। সরাইতে এক রাত্রি থেকে উত্তমচাঁদের ভাড়া করা ফ্ল্যাটের যে ঘরটিতে সোদি ছিল—সেইখানে চলে এলাম। আমি সোদিকে প্রশ্ন করলাম—সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েছে। সে বললে।—অল্প ক'দিন আগেই সে গেটের মধ্য দিয়ে

জোর করে সোভিয়েত দূতাবাসে ঢুকে পড়েছিল। এখন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে—সে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে। এদিকে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ বেশ খানিকটা এগিয়েছে—সুতরাং এখন সমস্ত ব্যাপারটিই একটি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়েছে; প্রধান সমস্যা সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে কিভাবে সংবাদ পৌঁছানো যায়। এটা তো স্পষ্ট যে জার্মান বা ইতালীয় দূতাবাসের মারফত এটা করা চলবে না।

আমি ক্রিশনিনির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম; তিনি বললেন, আমার আসার কথা তিনি মন্ত্রীকে জানাবেন, পরদিন তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। মন্ত্রী তাকে জানিয়েছেন, তিনি নেতাজীর কাছ থেকে একটি বার্তা পেয়েছেন। যে কোনো দিন বিকেলে পাঘমানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সোধি হারমিন্দর সিং আর আমি মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি নেতাজীর একটি লিখিত বার্তা আমাদের দেখালেন—আমার ভারতে ফিরে যাওয়া এবং কঠিন ও জটিল অবস্থার মধ্যে কাবুলে ফিরে আসার জন্য তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বার্তাটি বেতারে প্রেরিত; এতে আরও বলা হয়েছে, বার্লিনে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। সেটা এই যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহায্য দেওয়া-নেওয়া হবে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে এবং তাদের কাছ থেকে যে কোনো সাহায্য যে কোনো রূপেই গ্রহণ করি না কেন তা পারস্পরিক ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে—আর আমরা যে পথই নিই, তা হবে শুধুই দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে। এই বার্তায় আরও বলা হয়েছিল—প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য আমি যেন উপজাতীয় অঞ্চলে কাজ করে যাই।

মন্ত্রীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা হলো। দরকার মতো উপজাতীয় অঞ্চলে কিভাবে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে সেই ব্যবস্থাও ওর সঙ্গে পাকা করে নিলাম। মন্ত্রী আমাকে বলে দিলেন, আমি সোজাসুজি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি কিংবা আগের মতো ক্রিশনিনির সাহায্যও নিতে পারি।

এর পর সোধি হারমিন্দর সিং আর আমি কাবুলে ফিরে এলাম। তারপর ফিরে যাবার ব্যবস্থা নিয়েও আমাদের দুজনের মধ্যে কথা হলো। কিন্তু এমন একটা ঘটনা এরই মধ্যে ঘটে গেল যে, আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো।

জার্মান দূতাবাস চেয়েছিলেন তাদের কয়েকজন লোককে ইপ্‌পির ফকিরের কাছে পাঠাবেন। ইপ্‌পি ওয়াজিরিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চলে অবস্থিত। জার্মান এবং ইতালীয়—দুই পক্ষ থেকেই কোহাট ও বান্নু জেলার কাছাকাছি অঞ্চলে নিজেদের লোক পাঠাবার সমস্যা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। কোহাট ও বান্নু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত—এখন পাকিস্তানে। আমি সম্মত হয়েছিলাম, ইপ্‌পির ফকিরের সঙ্গে যোগাযোগ করবো—কোহাট ও বান্নু থেকে ওয়াজিরিস্তানে তাদের লোক পাঠাবার সম্ভাব্যতা কতটুকু তারও সন্ধান নেব। খুশল খান খাটক—একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী, ইতিমধ্যেই ইপ্‌পির ফকিরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন—আমার সঙ্গেও তার পরিচয় ছিল। আমাদের কর্মপদ্ধতি সবই তার জানা।

আমার এই প্রস্তাব সরল ও অকপট। তারা আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে এই ভিত্তিতেই কাজ করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার সামনে এক রকম বলা—আর আমার পিছনে এমন কি ইতালীয়দের পেছনেও জার্মান দূতাবাস অগ্রসর হয়েছেন নিজেদের প্ল্যান নিয়ে—শের আফজল খানের সঙ্গে। এই শের আফজল খান আবার আমাদেরই লোক। খুব সম্ভবত আমার অজ্ঞাতে জার্মান দূতাবাস থেকে তাকে বলা হয়েছে যে, তারা সব ব্যাপারটা নিয়েই রহমৎ খানের (অর্থাৎ আমার) সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

কিন্তু আফগান সরকার এ-সব কথা জানলেন কেমন করে? জার্মান দূতাবাস এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অপরাধী করেছিল ইতালীয় দূতাবাসকে—পরে আমি জার্মান দূতাবাস থেকে এই কথা জানতে পেরেছিলাম।

আফজল খান একদল জার্মানকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন,

পথে এই দলের সঙ্গে আফগান পুলিশের বিরোধ বাধলো। সংঘর্ষের ফলে একজন জার্মান নিহত হলো, একজন আহত হলো; এই ঘটনার ফলে পুলিশ সতর্ক হলো এবং কাবুল শহরের মধ্যে ও বাইরে চলাচল কঠোর আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলো। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করা হোলো 'বুদখক'-এ।

এই বিপজ্জনক অবস্থায় আমরা ঠিক করলাম, কয়েকটি দিন চুপ করে থেকে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যাবো। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আমরা ঠিক করলাম পুলিশকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কিছু পথ হেঁটে যাবো—এই ভাবে 'বুদখক' প্রহরার স্থলটি অতিক্রম করবো। এই প্ল্যানই কাজে পরিণত হলো ; আমরা বুদখক ছাড়িয়ে সাত-আট মাইল দূরে এসে ট্রাক ধরলাম। সেই ট্রাকে এলাম জালালাবাদে। সেখান থেকে সোজা চলে গেলাম মোহামন্দ উপজাতীয় অঞ্চলে। ওখানে ছিলেন মিরন জান। সংবাদ নিয়ে হারমিন্দর সিং কলকাতায় ফিরে যাবে এই রকম ব্যবস্থা ছিল—সে চলে গেল ভারতে। আমি উপজাতীয় অঞ্চলে কাজ করার জন্য ঐখানেই থেকে গেলাম।

এগারো

পরবর্তী পর্যায় [১৯৪১-১৯৪২]

এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলে আমি কিছু সংখ্যক নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম। সেইসব স্থানে আমরা উপকেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম এবং প্রত্যেক কমরেডের উপরই বিশেষ বিশেষ কাজের ভার দিয়েছিলাম।

আমাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল 'কুদাখেল'-এ; এখানে উত্তরের মোহামন্দ্ উপজাতির বাস। এই কেন্দ্রের নেতা ছিলেন মিরন জান সিয়ল আর তার ভাই। বংশগতভাবে যে-পরিবার ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী সেই পরিবারই এই উপজাতির নেতা। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করেন। এমন কি স্বাধীনতা এবং ভারত বিভাগের পরেও মিরন জান সিয়লের ছোট ভাই মুল্লা জান পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। সম্ভবত মুল্লা জান-ই পাখতুনিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম বলি: 'পাখতুনিস্তান' হচ্ছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী উপজাতীয় অঞ্চল।

আমাদের আর একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বান্দাগাই গ্রামের সওয়াল কিল্লা। এই কেন্দ্রের নেতা ছিলেন সানোবর হুসেন। নানা ব্যাপারে কমরেডরা সানোবর হুসেনের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। অতীতে যারা আফগানিস্তান বা সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে চাইতেন তারা প্রথমে এখানেই আসতেন। সওয়াল কিল্লা যে শুধু দ্বিতীয় প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল তা নয়—এটি ছিল সানোবরের রাজনৈতিক পরিচালনায় গঠিত এক মিলনতীর্থ। সানোবর হুসেনের উপস্থিতিই আমরা পরম সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করতাম—ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে তা ছিল বিশেষভাবে সহায়ক।

এরপর আমি ভারতে রওনা হলাম। লাহোরে এলাম জুলাই মাসের শেষের দিকে। সোধি হারমিন্দর সিং ইতিমধ্যেই কমরেডদের কাছে সব বিবরণই পেশ করেছিল। সে কলকাতায়ও গিয়েছিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কারুর সঙ্গেই দেখা করতে পারে নি কিংবা কলকাতার অবস্থা সম্পর্কেও সে কোনো স্পষ্ট বিবরণ দিতে পারে নি। এই অবস্থায় আমি কলকাতায় যাওয়ার কল্পনা ত্যাগ করলাম। ফলত, আমি উপজাতীয় অঞ্চলেই ফিরে গেলাম এবং সেই অঞ্চল আর কাবুলের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগলাম। ভারত-ভ্রমণ যতদিন না নিরাপদ হয় ততদিন এই ভাবেই কাজ চললো।

১৯৪১-এর ৪ঠা আগস্ট আমি পেশোয়ার রওনা হলাম। আমি আগেই আবাদ খানকে জানিয়ে রেখেছিলাম যে, আমি সেখানে পৌঁছবার পর সে যেন মীর ঘজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে রাখে। ট্রেনে-বাসে কোহাট হয়ে ৫ই আগস্ট সন্ধ্যায় সেখানে হাজির হলাম। তারপর গেলাম আমাদের আত্মগোপন কেন্দ্রে। মীর ঘজন সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে জানালাম যে, আগামী সফরে আমি মানেরি গ্রামের সুলতান মোহ্‌দকে সঙ্গে নিতে চাই। সুলতান মোহ্‌দ আমার সঙ্গে দু'বার কারাবাসে ছিল—বেশ ভালো এবং সচেতন কমরেড। প্রসঙ্গক্রমে এ-কথাও বলা দরকার যে, হাজি আবদুল সোভানও এই গ্রামেরই অধিবাসী; প্রকৃতপক্ষে তার স্ত্রী এখনও মানেরি গ্রামে বাস করছে।

১৯৪১-এর ১০ই আগস্ট সুলতান মোহদকে নিয়ে বেলা প্রায় দশটায় আমি কাবুলে পৌঁছুলাম। সেই একই সরাই জাজিয়ান-এ আমরা একটা ঘর নিলাম। তারপর বেশ পরিবর্তন করে আমি ওখানকার অবস্থা জানবার জন্য উত্তমচাঁদের কাছে গেলাম। হাজি আবদুল সোভানের বাড়ী গিয়ে তাকে বললাম, তারই গ্রামের একজন অধিবাসীকে নিয়ে কাবুলে এসেছি। এই কথা শুনে সে খুব খুশী হয়ে বললো—আমি যেন তাকে তার বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিই।

১১ই আগস্ট আমি স্বাস্থ্যনিবাস পাঘমানে গিয়ে জার্মান ও

ইতালীয়—উভয় পক্ষের মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাদের কথা-বার্তা শুরু হলো—ভারতবাসীর উপর রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কিরূপ, কিংবা এ সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোভাবই বা কি, তাই নিয়ে। আমি খুব স্পষ্টভাবেই তাদের বললাম—এই অভিনব পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। এর আগে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের নিজস্ব ধরনে তাদের সকলেরই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর জার্মানীর আক্রমণ—যারা সমাজতন্ত্রবাদের স্বপক্ষে কাজ করে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করেছে। কারণ এটা সত্য যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয় গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। তাদের কাছে এই আক্রমণ অস্বাভাবিক।*

জওহরলাল নেহরুর মতো কংগ্রেসের নেতৃবর্গও ফ্যাসিবাদের তীব্র

---

* জার্মান সাহায্যের জন্য চেষ্টা করায় সুভাষচন্দ্রের কোনো দ্বিধা ছিল না। বিশেষত যুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ জাতীয় বিপ্লবী যে চিরাচরিত নীতি অনুসরণ করেছিলেন—তিনিও সেই নীতি দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই নীতি হলো—'শত্রুর শত্রু—আমাদের বন্ধু'। কিন্তু যুদ্ধ-সংকট সম্পর্কে আমাদের পার্টির চিন্তা সেরকম ছিল না, বিশেষত বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবের পরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আকস্মিক নাৎসী-আক্রমণে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। কারণ সি. পি. আই বিনাশর্তে ফ্যাসি-বিরোধী মোর্চায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; এই দলের বিশ্বাস ছিল, ফ্যাসিবাদ পরাজিত হলেই ভারত স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে সুভাষকে সাহায্য করে যাওয়ার প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল এই যুক্তিতে যে, সতর্কভাবে এগিয়ে গেলে সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও রণকৌশলগত সবদিক দিয়েই যুদ্ধের পরবর্তী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের অনিবার্য অভ্যুত্থানকে সাহায্য করবে।

এইভাবে দেখতে গেলে ভগতরামকে সেদিন খুবই জটিল ও বিপজ্জনক ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর বলা এই কাহিনীই প্রমাণ করবে—এই ভূমিকায় সে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

—সম্পাদক

বিরোধী ছিলেন ; তাঁরা এটাই বুঝেছিলেন, কেবলমাত্র দেশে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁরা ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে সফল হতে পারবেন। কিন্তু ব্রিটিশরা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিমুখ। তাই আমি তাদের বললাম—মনে হয় ব্রিটিশের সঙ্গে কংগ্রেসের এই প্রশ্ন নিয়েই একটা সংগ্রাম অনিবার্য, যদি সেই সংগ্রাম কখনও বাধে, তাহলে তাদের অনেকটা সাহায্য হবে।

এরপর আমি তাদের কাছে বুঝিয়ে বললাম উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের সংগঠনগুলির ও কর্মনীতির কথা। ওয়াজিরিস্তান উপজাতীয় অঞ্চলে ইপ্‌পির ফকিরের কাছে আমাদের অগোচরে তারা নিজেদের লোক পাঠিয়েছেন বলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে তা-ও তাদের কাছে তুলে ধরলাম। আমি একথাও বললাম—উপজাতীয় অঞ্চল কারও সংরক্ষিত অঞ্চল নয় ; ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবীরা যদি সেখানে যেতে পারে, ব্রিটিশের দালাল বা গুপ্তচরেরাও তবে তাই করতে পারে। সুতরাং ওখানে সামান্য ভুল হলেই সঙ্কট দেখা দেবে।

ওরা স্বীকার করলেন, আমার বক্তব্য খুবই বাস্তব, ইপ্‌পির ফকিরের কাছে নিজেদের লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ করাটা অন্যায় হয়েছে—একথাও মেনে নিলেন।

ঐ সভাতেই মিঃ রাসমাস নিভৃতে আমাকে বললেন, তিনি পৃথক ভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। আমি সম্মত হলাম।

একটি জার্মান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ভাড়া করা একটি ফ্ল্যাটে পরদিন আমাদের দেখা হলো। মিঃ রাসমাস প্রথমেই আসল কথাটি তুললেন এবং বেশ দৃঢ় কণ্ঠে আমাকে জানালেন—ইতালীয়দের সঙ্গে আমাকে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে ; এটা যদি না করতে চাই, আমার সঙ্গে জার্মানদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমার দুর্বলতা সে জানতো—সুভাষচন্দ্র এখন জার্মানীতেই আছেন এবং তাদের অনুমতি ছাড়া তিনি জার্মানী ত্যাগ করতে পারবেন না।

আমি অবাক হলাম ; একটু কৌতুকও বোধ করলাম এই দেখে যে যদিও জার্মানী, ইতালী ও জাপান অক্ষশক্তিরূপে মিলিত হয়ে মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মিত্রশক্তিগুলির বিরুদ্ধে

দাঁড়িয়েছে—তবু এরা একে অন্যকে সন্দেহ করে। যাই হোক্ সেই আলোচনার পর আমি আর ইতালীয়দের সঙ্গে দেখা করি নি।

মিঃ রাসমাস সেই সাক্ষাৎকারেই আমাকে বলেছিলেন যে সুভাষ বসু ও জার্মান সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের জন্য একটা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। অবশ্য ইতালীয়দের সম্পর্কেও একই চুক্তি প্রযোজ্য।

আমি তাকে বললাম, এখন তাদের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে; এখন তারা বাস্তব আকারে এবং ব্যাপকভাবে আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে—অস্ত্র সংগ্রহ ও অস্ত্র সঞ্চয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করে। আমাদের সহায় সম্বল খুবই সামান্য—ভারতে কাজ চালাবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। যদি তারা আমাদের অস্ত্র দিতে পারে, তাহলে খুবই ভালো হয়—তা না হলে উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে আমরা অন্যত্র তা কিনে নিতে পারি। অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ ছাড়াও প্রায় একশো জনের স্থায়ীভাবে ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত খাদ্যেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার—খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সঞ্চয়ও রাখতে হবে। এসব প্রস্তুতি সেই জরুরী অবস্থার জন্য যখন সুভাষ বসু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য আহ্বান জানাবেন।

তিনি স্বীকার করলেন এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক ধরনের—তবে সেই মুহূর্তে এই সব ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে অক্ষম—সুতরাং ১৬ই আগস্ট তারিখটি নির্দিষ্ট হলো—আর একটি আলোচনার জন্য।

১৬ই আগস্ট আবার আমাদের মধ্যে পূর্বালোচিত বিষয়গুলি নিয়েই কথা হলো। তিনি আমাকে বললেন, তারা সে সময়ে অল্প পরিমাণে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারবেন—তবে তুরস্ক ও ইরানের মধ্য দিয়ে আরও কিছু অস্ত্রের ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু ঐ পথে আনা অস্ত্রের পরিমাণও খুব বেশী হবে না। বেশীর ভাগ অস্ত্রই আমাদের কিনে নিতে হবে, তবে এর জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকার মুদ্রায় উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা তারা করবেন।

এতে অবশ্য আমরা সন্তুষ্ট হতে পারি নি ; কেন না, যে কাজের ভার আমরা নিয়েছিলাম—তাতে আরও অধিক অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু আসলে আমরা একটা উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলাম—ব্যাপারটা এই :

১. সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানীতে আছেন ; কেবলমাত্র জার্মান দূতাবাসের মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব। কিন্তু এই দূতাবাসের মারফৎ যেসব বার্তা আসছিল তা খাঁটি কিনা এই নিয়ে কমরেডদের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন জার্মানরা হয়তো সাধু আচরণ করছেন না।

২. জার্মানরা আমাদের অস্ত্র সরবরাহ করতে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদ ক্রয়ের জন্য অর্থ দিতে অক্ষমতা জানিয়েছে, কিন্তু অর্থ সাহায্য করলেও অস্ত্র ক্রয় একটা কঠিন সমস্যা।

৩. এর আগে সুভাষচন্দ্র বসুর সাক্ষাতে জার্মান এবং ইতালীয় পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, আমি দু'জন লোক কাবুলে নিয়ে যাবো—অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, অস্ত্রের ব্যবহার ও বেতার ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে। এখন জানা গেছে, ভারত থেকে কাবুলে দু'জন লোক পার করা কত কঠিন। কিন্তু আমি কোনো রকমে শান্তিময় গাঙ্গুলি ও সোধি হারমিন্দর সিংকে আমার সঙ্গে কাবুলে নিয়ে গিয়েছিলাম ; প্রশিক্ষণের আশায় তাঁরা দু'জনেই দীর্ঘ-কাল কাবুলে ছিলেন—কিন্তু কোনো ফল হয় নি, নিরাশ হয়ে তাদের ফিরে আসতে হয়েছিল। এটা খুবই স্পষ্ট যে, তারা এই ব্যাপারে আন্তরিক নন এবং তারা এই বিশেষ প্রশিক্ষণের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থাই করেন নি।

আমার মনোভাব আমি মিঃ রাসমাসের কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে আমাকে আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যতে তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে কোনোরকম অভিযোগের আর সুযোগ না থাকে।

১৯৪১-এর ১৮ই আগস্ট আমরা উপজাতীয় অঞ্চলের উদ্দেশে

যাত্রা করলাম। ২০শে আগস্ট লালপুরা হয়ে কুদাখেল-এ (মিরন জানের বাসভূমি) উপস্থিত হলাম।

গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশ্নে আমি মিরন জানকে বিশ্বাস করে সব কিছু বলতাম। এবার আমি তার সঙ্গে বর্তমান সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম; তাকে বললাম, আমি আমার কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করতে ভারতে যাচ্ছি—আলোচনা করবো এখনও যারা জেলের বাইরে আছেন সেই সব কমরেডের সঙ্গে। তাকে বললাম—সানোবর হুসেনের সঙ্গে আলোচনা করে ছয়জন কমরেডের একটা সভার ব্যবস্থা করে রাখতে—আমি ভারত থেকে ফিরে এসে সেই সভায় যোগদান করবো।

আমি কমরেডদের কাছে কলকাতার পরিস্থিতি কি তা জানতে চাইলাম। সেখানে কোনো যোগাযোগ করতে পারবো কিনা তা জানাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। জানতে পারলাম, ওখানে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে—আমার পক্ষে কলকাতায় যাওয়া নিরাপদ হবে না। তারা বললো—অন্য পথে তারা যোগাযোগ করে কাবুল ও উপজাতীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি জানাতে চেষ্টা করবে। তাদের পরামর্শ—আমি যেন লাহোরেও না যাই—পুলিশ অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। আমার সঙ্গে তারা যোগাযোগ করবে মীর গজন খানের মাধ্যমে।

কুদাখেল-এর কাছেই এক গ্রামে সভার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল ১০ই সেপ্টেম্বর—পাঁচ-ছয় জন কমরেড সেখানে পৌঁছে ছিল ৯ই সেপ্টেম্বর।

সভার আগে সানোবর হুসেনের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললাম—যাতে পরিস্থিতির গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। তিনিও বললেন, যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি—তাতে আমাদের আরও অনেক সাহায্যের দরকার হবে, জার্মানরা যে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে তা তার তুলনায় অনেক কম। যাই হোক, আমাদের সম্বলটুকুই একটু আঁটসাঁট করে চলতে হবে—বৈপ্লবিক ব্যাপারে আমাদের বিপ্লবী মনের প্রেরণাকেই কাজে লাগাতে হবে। তিনি

আমার কথাটা বুঝতে পারলেন, পরামর্শ দিলেন—কাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যেন প্রবীণ কমরেডদেরই দলে টেনে নেওয়া হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের সভা শুরু হলো। স্পষ্ট ভাষায় খোলাখুলি ভাবে আমি বিষয়টি তাদের কাছে তুলে ধরলাম। সভায় স্থির হলো, আমাদের আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু সঙ্গতি আছে, যে সম্বল আছে তারই সাহায্যে যোদ্ধৃবাহিনী গঠন করতে হবে। হতে পারে, ভারত থেকে পার্টির কিছু সাহায্য এসে পৌঁছুবে—কিন্তু মিথ্যে আশা পোষণ করা উচিত হবে না। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সবাই একমত হলেন।

আমি লালপুরা হয়ে কাবুল যাত্রা করলাম ১১ই সেপ্টেম্বর—'লালমন'-এ পৌঁছুলাম (হাজি মহম্মদ আমিনের গ্রাম) ১২ তারিখে সকালে। হাজি সাহেব অত্যন্ত উৎকণ্ঠ হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর সকালে তাঁকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলাম। ঘটনার অগ্রগতির কথা জেনে তিনি খুব খুশীই হলেন। উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে তিনি সফর করবেন—এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

বিকেলে আমি জালালাবাদের পথে পায়ে হেঁটে যাত্রা করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি জালালাবাদে উপস্থিত হলাম। সেখান থেকে ট্রাকে চেপে কাবুল পৌঁছুলাম ১৪ই সেপ্টেম্বর, সকাল আটটায়। তারপর সরাইতে একটি ঘর ভাড়া করে নিউ কাবুলে উত্তমচাঁদের নতুন বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। তার সঙ্গে খুব অল্পই কথা হলো। সেই দিনই সন্ধ্যায় আমি মিঃ রাসমাস-এর সঙ্গে দেখা করে ভারতে, বিশেষ করে উপজাতীয় অঞ্চলে, আমাদের কাজের বিবরণ দিলাম।

ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সামরিক অবস্থা নিয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো। তিনি আমাকে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানদের সাফল্যের কথা বললেন। আমি বললাম—ঐ সংবাদ রেডিও এবং সংবাদপত্র মারফৎ আগেই জেনেছি। তবে জার্মানরা যদি পূব দিকে আরো এগিয়ে আসে তবে তাদের রুশীয় সেনাবাহিনীর কাছে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে; তাছাড়া সৈন্যবাহিনী

এগিয়ে আসবার সঙ্গে খাদ্যের সরবরাহের লাইনটাও ছড়িয়ে দিতে হবে—শত্রু সৈন্যের পক্ষে সেটি ভেদ করা সহজ হবে।

আমি যতদূর বুঝতে পেরেছিলাম তা হলো এই যে, জার্মানরা রাশিয়ার মধ্যভাগে কোনো রুশ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। আমার এটাও মনে হয়েছিল যে, আফগানিস্তানের দূতাবাসও এই ধরনের কোনো আন্দোলন রুশ-সীমান্তে অথবা রাশিয়ার অন্তর্গত মধ্য এশিয়ায় গড়ে তুলতে পারে নি ; ঐ অংশে প্রধানত মুসলমানেরই বাস।

পরবর্তী সাক্ষাৎকারগুলির একটিতে আমি আগে যে বিবরণ দিয়েছিলাম তার ভিত্তিতেই আবার আলোচনা হয়েছিল। তাতে বুঝতে পেরেছিলাম উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের কাজের পরিচয় পেয়ে তারা খুশী কিন্তু ভারতে যা কাজ হয়েছে তাতে তারা অপ্রসন্ন। আমি এই কথাই তাদের বুঝিয়ে বললাম—জার্মান সরকারের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সঠিক বোঝাপড়া কি ধরনের হয়েছে তা না জানা পর্যন্ত এখানে এগোনো যাবে না। তারা প্রতিশ্রুতি দিলেন—এ ব্যাপারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিক পরিস্থিতির একটা স্পষ্ট ব্যাখা তারা দিবেন। আমার কাছে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে তারা কৌশলের খেলা খেলছে—তাই তাদের উত্তরে খুশী হই নি।

১৯৪১-এর ১৮ই অক্টোবর সন্ধ্যায় আমি একা কাবুল ছেড়ে চলে এলাম। টাঙ্গায় চেপে বুদখকে যখন পৌঁছুলাম তখন রীতিমত অন্ধকার হয়ে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক পেয়ে গেলাম ; কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু একা ছিলাম বলে পার হয়ে এলাম। সেখান থেকে ১৯ শে অক্টোবর জালালাবাদ, জালালাবাদ থেকে 'লালমন' গ্রামে হাজি সাহেবের বাড়ী। রাত্রিটা সেখানেই কাটালাম—সমস্ত ব্যাপারটাই বুঝিয়ে বললাম তাকে। খুব ভোরে যখন কুদাখেল-এ হাজির হলাম তখনও মিরন জান ও তার ভাই ঘুমিয়ে ছিল।

আমি ওখানে দু'দিন ছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের মহান লক্ষ্য সাধনের সকল দিক নিয়েই আলোচনা করেছিলাম। উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের কাজের উপরে বিশেষ গুরুত্ব এই আলোচনায়

আরোপিত হয়েছিল। জার্মানরা উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজকে তারিফ করেছে শুনে তিনি খুশি হয়েছিলেন।

আরো আলোচনার পর স্থির হলো--খাইবার গিরি উপত্যকা পর্যন্ত আমাদের কর্মভূমি প্রসারিত করতে হবে। হাজি সাহেব নিজে একজন 'শিনওয়ারি'; আমি তাই প্রস্তাব করলাম, হাজি সাহেবকে নিয়ে 'শিনওয়ারি' উপজাতীয় অঞ্চলেও একবার যাওয়া দরকার। অন্য কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তির সহযোগিতায় আমরা অফ্রিদি উপজাতীয় অঞ্চল, এমন কি সম্ভব হলে আরও দূরের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপকতর অংশে আমাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারি। খুশল খান খাটকের সক্রিয় সাহায্যে আমরা ওয়াজিরিস্তান অঞ্চলকেও কাজের আওতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি। মোটকথা, উপজাতীয় অঞ্চলকে সংগঠিত করা সম্পর্কে সমগ্র পরিকল্পনাটা আমরা সবাই সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করলাম।

মিরন জানের কাছে ওখানকার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের যে বিবরণ পেলাম তা খুবই সন্তোষজনক। আমি আগে ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম সানোবর হুসেন ও অন্যান্য কমরেডদের সঙ্গে সওয়াল কিল্লাতে দেখা করবো—মিরন জানকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম। কিন্তু বিশেষ কারণে এটাই ঠিক হলো যে, ঐসব কমরেডরা কুদাখেল-এ যাবেন। আমি একাই ২৪শে অক্টোবর সওয়াল কিল্লায় যাত্রা করলাম—পৌঁছুলাম ২৬ শে অক্টোবর সন্ধ্যায়।

সেখানে পাঁচ-ছয় জন কমরেড জমায়েত হয়েছিল। তাদের কাছে আমি একটা সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলাম—তাদের কথাও শুনলাম। সবাই এক সঙ্গে বসে তাদের কর্মের সীমা আরও প্রসারিত করার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হলো। দির ও সওয়াট রাজ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কেও আলোচনা করা হলো। স্থির হলো, আমি লাহোর হয়ে কলকাতায় যাব, সেখানে কাজের রিপোর্ট দিয়ে আবার ফিরে আসবো। এদিকে উপজাতীয় অঞ্চলের এক নেতৃ-সম্মেলন যাতে নভেম্বরের শেষের দিকে

ইত হয় তার আয়োজন করে রাখতে হবে—মিরন জান তার সুবিধে অনুযায়ী সম্মেলনের স্থান নির্দিষ্ট করে দেবেন।

এবার দির রাজ্যের তামালগরহ হয়ে ভারত যাত্রা, ১৯৪১-এর ২৯শে অক্টোবর সওয়াল কিল্লা থেকে। সঙ্গে রইলেন গোলাম উলরেহ্‌মান। আমি মহম্মদ উমর খানের মাধ্যমে আমার ছোট ভাই আনন্দরামকে খবর পাঠিয়েছিলাম যে সন্ধ্যার সময় সে যেন 'তাখত-ভাই'তে একটি টাঙ্গা নিয়ে হাজির থাকে—টাঙ্গা যাবে মর্দানে কিংবা আমাদের গ্রামে। ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় 'তাখত্-ভাইতে' পৌঁছে গেলাম—কিছুটা পথ হেঁটে, তারপর বাসে ও টাঙ্গায়। একটু খোঁজ করার পরই দেখতে পেলাম ওয়ারিস্ খান আর অনন্তরামকে—ওয়ারিস আমার এক বিশ্বস্ত এবং কর্মদক্ষ কমরেড্। ওয়ারিস্ আমাদের গাঁয়েরই লোক, সে খোঁড়া, কিন্তু সে যে কোনো কাজই করতে পারতো, এমনকি টাঙ্গা চালাবার দক্ষতাও তার ছিল।

আমার পোশাক পরিবর্তনের জন্য তারা আমাকে একটা গাছপালা ঘেরা জায়গায় নিয়ে গেল। তারা সঙ্গে মেয়ের পোশাক এনেছিল, তাতে একটি বোরখাও ছিল। আমি পোশাক পরিবর্তন করে গ্রামের দিকে রওনা হলাম। বাড়ীতে পৌঁছুলাম রাত প্রায় সাড়ে ন'টায়। আমার মা আমার জন্যে উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন।

আমার প্ল্যান ছিল বাড়ীতেই ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকবো—তাই ওয়ারিসকে বলে দিয়েছিলাম কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার জন্য পরদিন সকালে আসতে।

ওয়ারিস খান খুব ভোরেই এলো। আগের দিন সন্ধ্যাতেই আমার আর এক ভাই কিশোরীলাল তলোয়ার পৌঁছে গিয়েছিল। আমরা সবাই মিলে লাহোরে যাবার পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করলাম। ঠিক হলো, আকোরা খাটক স্টেশন থেকে আমি বোম্বাই এক্সপ্রেস ট্রেনটি ধরবো। কিশোরীলাল নওশেরা থেকে সেই ট্রেনে চেপে আকোরা খাটক স্টেশনে নেমে পড়বে। সে আমার জন্য

কাপড়-চোপড় নিয়ে আসবে—সেই পোশাক পরেই আমি লাহোরে একটা ভালো হোটেলে চলে যাবো। আমার লাহোরে ফিরে আসা আর কাবুলে ফিরে যাওয়ারও তখনকার মতো একটা ব্যবস্থা হলো। কাবুলে যাবো উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে সুতরাং যোগাযোগের ঠিকানাও ঠিক করে নেওয়া হলো।

পরদিন, অর্থাৎ ১৯৪১-এর ৪ঠা নভেম্বর ভোরে, আমি লাহোরে পৌঁছুলাম। সবই বেশ স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি সোজা একটা হোটেলে গিয়ে সেইখানেই সারাদিন রইলাম। পরদিন চলে গেলাম পার্টি-নির্দিষ্ট এক গুপ্তস্থানে। এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন গুরচরণ সিং।

কমরেডদের কাছে আমি আমার কাবুল যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পেশ করলাম। জার্মানীদের আসল অভিপ্রায় সম্পর্কে আমি আমার সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, বাইরে তারা যা-ই বলুক না কেন, প্রকৃত-পক্ষে তারা দালাল হিসেবে আমাদের ব্যবহার করতে চাচ্ছে। আমি একথাও তাদের বললাম—সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে যেসব সংবাদ ওরা পেয়েছে বলে জানাচ্ছে, সেগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করারও অবকাশ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মানীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চালিয়ে যেতে হবে আর তাদের কাছে যতটুকু সাহায্যই পাই, তাই আমাদের নিতে হবে। প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে আমরা এক প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভিত্তি গড়ে তুলতে পারি। তাছাড়া এমনভাবে কাজের পরিমাণ বাড়াতে হবে যাতে সেখানে একটা জমিদার-বিরোধী আন্দোলনও গড়ে ওঠে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ লোক ভূমিহীন—খুবই সামান্য সংখ্যক লোকের অবশ্য কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। অধিকাংশ জমি ছিল বড় বড় ভূস্বামীদের অধিকারে—এরা ছিলেন মুসলিম লীগ দলভুক্ত। উপজাতীয় অঞ্চলের শতকরা একশ জন অধিবাসীই মুসলমান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা প্রায় সাতানব্বই জন। সুতরাং ওখানকার সংগ্রাম প্রধানত ভূস্বামী ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে।

কমরেডদের কাছে পূর্ণ তথ্য পেশ করার জন্য আমার ইচ্ছে ছিল কলকাতায় যাবার। কিন্তু কলকাতায় নিরাপদে যোগাযোগ করবার মতো কমরেডই পাওয়া গেল না। সুতরাং যাবার পরিকল্পনা আপাতত ছেড়ে দিতে হলো।

স্থির হয়েছিল, নিরাপত্তার জন্যই ঘন ঘন ভারতে যাওয়া আমাকে বন্ধ করতে হবে। এর পরিবর্তে আমার সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োগ করতে হবে উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে। আর সেই সঙ্গে জার্মানদের সঙ্গে সংযোগও রেখে যেতে হবে।

আমি কমরেডদের বলেছিলাম, উপজাতীয় অঞ্চলে যেসব কমরেড কাজ করছেন তাদের একটা সভায় আমাকে যোগদান করতে হবে। সভার পরে যাবো কাবুলে। এই কারণে ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরী করা দরকার ছিল; এর সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণ চাই। দীর্ঘ আলোচনার পরে ঠিক হলো, আমি মর্দানে লালা যমুনাদাস তলোয়ারের বাড়ী যাব। গুরচরণ সিং এই সব রিপোর্ট সংগ্রহ করে যমুনাদাসের বাড়ীতে নিয়ে যাবেন। এই সব সংগৃহীত উপকরণের ভিত্তিতে আমি ও যমুনাদাস একটা রিপোর্টের খসড়া তৈরী করে নেব।

১৮ই নভেম্বর লাহোর পরিত্যাগ করে পরদিন সন্ধ্যায় আমার ভাইয়ের বাড়ীতে পৌঁছুবার পরিকল্পনা ঠিক করা হলো। এটা নিশ্চিত এক প্রচণ্ড ঝুঁকির ব্যাপার, কিন্তু বিকল্প কোনো পরিকল্পনা ভাবাও গেল না। দু'দিন পর গুরচরণ সিং এলেন একটা টাইপ-রাইটার আর কতকগুলি দরকারী কাগজপত্র নিয়ে। পাঁচদিন খেটে আমি রিপোর্ট তৈরী করলাম। সেই রিপোর্টই টাইপ করা হলো।

২৭শে নভেম্বর সন্ধ্যায় টাঙ্গায় চেপে আমি উপজাতীয় অঞ্চলের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে ছিল অনন্তরাম আর ওয়ারিস্। পথ চলে গেছে মালাকান্দ্ গিরিপথ, দির রাজ্য হয়ে সওয়াল কিল্লা পর্যন্ত। আমি মালাকান্দ্ ও স্বাকটের মধ্যপথে টাঙ্গা ছেড়ে দিয়ে বাস

ধরলাম—বাসে খুব ভোরে গেলাম বাটখেল্লা—সেখান থেকে সওয়াল কিল্লা। দির রাজ্য ও মালাকান্দের মধ্যবর্তী তল্লাশীর স্থানটিকে এড়িয়ে গেলাম এবং একটা ছোট গ্রামে রাতটা কাটিয়ে দিয়ে ২৯শে নভেম্বর সন্ধ্যায় গিয়ে পৌঁছুলাম সওয়াল কিল্লাতে। সেখানে আগেই উপস্থিত হয়েছিল সানোবর হুসেন, গোলাম মূর্তজা আর মহম্মদ উমর খান। সন্ধ্যায় আমি আমার কাহিনী ওদের বললাম—ওরাও ওদের অঞ্চলে যে কাজ করেছে তার একটা বিবরণ দিলো।

ওরা আমাকে জানালো, ৫ই ডিসেম্বর মিবন জানের গৃহে সক্রিয় কর্মীদের সভা হবে—এই রকম স্থির হয়েছে। এই সভা হবে খুবই গোপন—সাতজন কি আটজনের বেশী এই সভায় যোগদান করবে না। আমি বললাম, ভালোই হয়েছে, সভাটা গোপনে বসছে। আমি চাই না, যারা আমাকে জানে না তাদের কাছে আমার সত্য পরিচয় প্রকাশিত হোক। আমাদের প্রধান রণনীতি হলো গোপনে কাজ করে যাওয়া, গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে শক্তিতে এবং আরও অধিকতর শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই পথে আমাদের যতটুকু সহায় ও সম্পদ—তার সার্থকতম প্রয়োগও করে যেতে হবে।

আমরা তিনজন কুদাখেল-এ পৌঁছুলাম ৫ই ডিসেম্বর ভোরে। অন্য কমরেডরাও যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলো। সানোবর হুসেন আর মিবন জান তখনকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন—কর্মনীতি ও প্রচার-পদ্ধতি সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিলেন। আমি তাদের সতর্ক করে দিলাম এই বলে যে, প্রচারকার্য চালাতে হবে মুখে মুখে—লিখিত-ভাবে কিছুই থাকবে না, অবশ্য অত্যন্ত গুরুতর প্রসঙ্গ ছাড়া। অস্ত্র, গুলি-গোলা ও বারুদ ইত্যাদি কিনতে হবে স্বাভাবিক পথে—অর্থাৎ একসঙ্গে অনেক পরিমাণে নয়, কিছু কিছু করে; আর তা কিনতে হবে বিভিন্ন উৎস থেকে।

আমি কাবুল যাত্রা করলাম ৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে—একজন বিশ্বস্ত লোক মিরন জানকে আমার সঙ্গে নিলাম। লালপুরা গিয়ে আমি নৌকায় কাবুল নদী পার হলাম; পেশোয়ার-কাবুল রোডে গেলাম বেলা প্রায় এগারোটায়। খুবই ভাগ্যের কথা, অল্প সময়ের

মধ্যেই একটা ট্রাক পেয়ে গেলাম—সেই ট্রাকে কাবুল পৌঁছুলাম ১৯৪১-এর ৮ই ডিসেম্বর ভোরে।

বিকেলে উত্তমচাঁদ তার দোকান বন্ধ করার একটু আগেই আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম। সে বললো, সরকার তাকে কাবুলে খুচরা ব্যবসা চালাবার অনুমতি দেয় নি। সে নিউ কাবুলে ব্যবসার একটি প্রশস্ত জায়গা ভাড়া নিয়েছে, পরদিনই সেখানে উঠে যাওয়ার কথা। পরদিনই আমি তার নতুন জায়গাটিতে গেলাম। এবং ঐ দিন বিকালেই জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। পরদিন, ৯ই ডিসেম্বর, আমি জার্মান দূতাবাসে মিঃ রাসমাসের সঙ্গে দেখা করলাম; সঙ্গে আর একজন জার্মান ছিলেন—নাম উইৎজল। প্রথম সাক্ষাতেই আমার মনে হলো তিনি নিশ্চয়ই কাবুলে জার্মান গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান।

আমি দেখলাম তাদের উপজাতীয় অঞ্চলগুলি সম্পর্কেই বেশী উৎসাহ—ভারত সম্পর্কে ততটা নয়। হয়তো এমনও হতে পারে, উপজাতীয় অঞ্চলে যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব বর্তমান তাকে তারা কাজে লাগাতে চায় নিজেদেরই স্বার্থে; হয়তো সেখানে তারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে চায় যাতে ব্রিটিশরা সেখানে এক বৃহৎ সেনাবাহিনী মজুত রাখতে বাধ্য হবে—তাহলে তাদের মনোযোগ তারা যুদ্ধের প্রধান রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্যত্র সরিয়ে রাখতে পারবে।

আমি খোঁজ নিলাম, মাজোত্তার (সুভাষ বসু) কাছ থেকে কোনো বার্তা এসেছে কিনা। তারা বললো—একটি বার্তা এসেছে।

তারা নেতাজীর যে বার্তা আমাকে দিয়েছিল এইখানে তার সারাংশ দিচ্ছি:

১. কোনো শিল্প, বিশেষত ভারী শিল্পের উপর অন্তর্ঘাতীকাজ চালিও না।

২. যতক্ষণ অন্তত কোনো অঞ্চলে সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করবে না।

৩. তোমাদের সংগ্রাম ও আমাদের সংগ্রামকে এক সূত্রে

মেলাতে হবে। যতদিন তা সম্ভব না হয়, উপজাতীয় অঞ্চলের সংগ্রাম আরও দৃঢ় করে তোলো।

৪. আমাদের বন্ধুগণ তোমাকে পরিচালনা করবেন কিন্তু কি করা সঙ্গত বা কি করা সঙ্গত নয়, তা স্থির করতে হলে নিজের বিবেচনাশক্তির উপরেই নির্ভর করবে—কারণ ওখানকার বাস্তব পরিস্থিতি এরা জানেন না, তাদের ভুলও হতে পারে।

৫. যদিও এরা আমাদের সমান মর্যাদা দিচ্ছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতাই আমাদের কর্তব্য, তবু যতখানি তোমরা আশা করো ততখানি সাহায্য এরা না-ও করে উঠতে পারে। সুতরাং আর্থিক সাহায্যের জন্য ভারত বা অন্যত্র উৎসের সন্ধান করো।

৬. ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাকে জানাও। বিভিন্ন দল কোন্ ভূমিকা নিয়েছে, আমার সম্পর্কে তাদের মনোভাব কি, বিশেষত বাঙলার পরিস্থিতি কিরূপ—আমাকে জানাও।

৭. কাবুলে তোমার আয়োজন ব্যবস্থাদি নিরাপদ তো?

এইসব তথ্যাদি সংগ্রহ করতে আমার তিন দিন লেগে গেল। কয়েক দিন পরে একই জায়গায় তারা আমাকে আবার দেখা করতে বললেন। প্রয়োজন হলে কয়েক দিন তাদের সঙ্গে থাকতেও হবে। সুতরাং ১৯৪১-এর ১৯শে ডিসেম্বর তাদের সঙ্গে আমি পুনর্বার দেখা করলাম। ইতিমধ্যে আমি অন্য কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হলাম। এরাও একই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের মাধ্যমে আমি আরও কিছু যোগাযোগ গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম।

আমার ইচ্ছে ছিল কিছু হাল্‌কা অস্ত্র কাবুল বা অন্য কোনো জায়গা থেকে কিনে চোরাই পথে উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে চালান করে দেওয়া—উদ্দেশ্য হলো সেখান থেকে আমাদের কমরেডরা তা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন। ১৯শে ডিসেম্বর যখন মিঃ রাসমাসের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন এই অস্ত্র-ক্রয়ের প্রসঙ্গটি তুললাম। আফগান বা ভারতীয় মুদ্রায় কিংবা সোনায় কিছু অর্থ সাহায্য-প্রাপ্তিই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি সোনাকে অগ্রাধিকার দিই নি, কারণ ডলার বা স্টার্লিং ভাঙ্গাবার মতো এটাও ছিল এক ঝুঁকির

ব্যাপার। আমি এ প্রস্তাবও করলাম যে তারা ইচ্ছে করলে তাদের নিজস্ব বাণিজ্যিক সংস্থার মাধ্যমেও অর্থ সাহায্য করতে পারে।

অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে এই জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা সম্মতি জানালো। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা বেশ সফলও হয়েছিল। ওরা অবশ্য সব সময় আক্ষেপ করতো যে, তাদের অর্থ সাহায্যের শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

২৬শে ডিসেম্বর ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম; জানিয়ে এলাম, এক সপ্তাহ পরেই আমি উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে ফিরে যাবো। এই সময়ের মধ্যে তারা যথাশক্তি অর্থ সাহায্য যেন আমাকে করেন। আর আমার সঙ্গে আলোচনার এক বিস্তৃত বিবরণও যেন সুভাষচন্দ্র বসুর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৪২-এর ৩রা জানুয়ারী আমি কাবুল ছেড়ে জালালাবাদ পৌঁছুলাম সন্ধ্যায়। পরদিন লালমনে চলে গেলাম হাজি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে শুনলাম, এর আগেই হাজি সাহেব সানোবর হুসেন ও মিরন জানের কাছ থেকে জরুরী খবর পেয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন। রাত্রিটা আমি ওর জামাই-এর বাড়ীতে কাটালাম। হাজি সাহেবের এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম তুজন ব্যবসায়ী ঐ দিন রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পেশোয়ার যাত্রা করছেন। কুদাখেল পর্যন্ত আমি ওদের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। নমাজ পড়ে খেয়েদেয়ে আমরা আরখি ছেড়ে গেলাম রাত ১১টায়।

সঙ্গী তু'জনকে বেশ ফূর্তিবাজ বলা যায়। তারা আমাকে মিরন জানের বাড়ীতে নিয়ে গেল এবং বললো, হাজি সাহেবের কাছ থেকে তোমার জন্য এই পবিত্র সম্পদ এনেছি। রাত তখন প্রায় ১টা। মিরন জানের বাড়ীতে সামান্য কিছু খেয়ে ওরা পেশোয়ার চলে গেল। মিরন জানও ওদের চিনতো। তার কাছে শুনলাম, হাজি সাহেব তাঁর সফরসূচী সমাপ্ত করেছেন। এই সফরে তিনি বেশ ভালো সাড়া পেয়েছেন—এখন তিনি আছেন নিজের অঞ্চল শিনওয়ারিতে। তাঁর নিজস্ব পথে তিনি ভালো কাজই করে যাচ্ছেন—তবে আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে এখন দেখা করা সম্ভব হবে না।

আমার কাবুল ভ্রমণের সব বৃত্তান্ত আমি তাকে বললাম, অস্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থার কথাও জানালাম—সীমান্তের কোন্ কোন্ স্থান থেকে সেই অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে তা-ও তাকে বলে দিলাম। আমার এই সব ব্যবস্থার কথা শুনে সে একেবারে অবাক হয়ে গেল। আমার নির্বাচিত অস্ত্র সংগ্রহের স্থানগুলি তার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক।

তার কাছে যে বিবরণ পেলাম তাতে মনে হলো উপজাতীয় অঞ্চলগুলির অবস্থা সন্তোষজনক। মিরন জানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমি কিছু সময় ও বিশ্রাম চেয়েছিলাম। সুতরাং সেখানে চারদিন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষ করে রওনা হলাম সওয়াল কিল্লা। পথে দেখা হলো আবদুল রেজাকের সঙ্গে—সে একজন অস্ত্র-নির্মাতা। কি ধরনের অস্ত্র এখন চাই, তা তাকে জানাতে সে বললো—অধিকাংশই তো '৩০৩—এই অস্ত্র সংগ্রহ করা কোনো সমস্যাই নয়!

১৯৪২-এর ১৩ই জানুয়ারী—সওয়াল কিল্লা! এখানে সানোবর হুসেন, গোলাম মূর্তজা, মহম্মদ উমর খান, গোলাম উলরেহ্মান—সকলের সঙ্গেই দেখা হলো। আবদুল লতিফ আফন্দিকেও খবর পাঠানো হলো।

জমায়েতটা বেশ ভালো এবং তথ্যবহুল হয়েছিল। মিরন জান ছাড়াও এরাই হলো সেই সব লোক যারা উপজাতীয় অঞ্চলকে সংগঠিত করেছিল। আমরা পরস্পরের মধ্যে সংবাদ বিনিময় করলাম—কাবুল ও উপজাতীয় অঞ্চল-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ও আলোচিত হলো। কাবুলবাসী আমাদের বন্ধুদের কাছ থেকে তেমন সাড়া মেলে নি বলে কেউ কেউ নৈরাশ্য প্রকাশ করলো। আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম—দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত করা বা নিরাশ হয়ে পড়া কোনোটিই সঙ্গত নয়। শীঘ্রই হোক বা বিলম্বেই হোক, ব্রিটিশদের সঙ্গে আমাদের সোজাসুজি যুদ্ধ করতে হবে, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের অস্ত্র নেই, সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে বা অস্ত্র সংগ্রহের দিক থেকে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে কিছুটা সময় পাওয়া—আমাদের স্বার্থেই দরকার।

পরদিন, অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারী, কমরেডরা চলে গেল। উমর খান-কে পাঠানো হয়েছিল আমার ভাই অনন্তরাম ও কিশোরীলালের কাছে—তারা যাতে আমার লাহোরে যাবার আয়োজন ঠিক করে রাখে সেইজন্য। উমর খান ২১শে জানুয়ারী ফিরে এসে জানালো—২৩শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় আমাকে 'তখত্ ভাই'তে হাজির থাকতে হবে; সেখানে আমার ভাইয়েরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় টাঙ্গা নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

যথাসময়ে 'তখত্ ভাই'তে উপস্থিত হলাম—সেখানে দেখা হলো অনন্তরাম ও ওয়ারিসের সঙ্গে। আমি তাদের বললাম, কিছুদিন যাবৎ আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। সুতরাং আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে। আমি লালা যমুনাদাসের বাড়ীর কথা বললাম। সেখানে একজন ভালো ডাক্তার আছেন—তাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। ডাক্তারের নাম ঈশ্বরদাস কোহ্‌লি। তিনি লালাজীর বাড়ীতে প্রায়ই এসে থাকেন—তিনি আমাকে সেখানেই পরীক্ষা করতে পারবেন—চিকিৎসার জন্য সময়ের দরকার হলে আমি আমার গ্রামের বাড়ীতেও চলে যেতে পারবো।

আমরা রাত সাড়ে ন'টায় মর্দানে পৌঁছুলাম। আমি লালাজীকে আমার সমস্যার কথা বললাম, তিনি পরদিন যাতে ডাক্তার আসেন তার ব্যবস্থা করে দিলেন। ডাক্তার এসে বললেন, পেটের গোলমাল আর চর্মরোগের জন্য আমার দীর্ঘ দিনের চিকিৎসার প্রয়োজন। এই জন্য লালাজীর বাড়ীতে ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আমাকে এক সপ্তাহের জন্য থাকতে হবে—তারপর অন্য কোনো স্থানে।

এই ব্যবস্থার কোনো বিকল্প ছিল না। আমি অত্যন্ত দুর্বল এবং দৈহিক দিক দিয়ে অপটু হয়ে পড়েছিলাম। তাই এক সপ্তাহ পরে আমি গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে সাত সপ্তাহ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রইলাম—শেষে আরও তিন সপ্তাহ বিশ্রাম ও দৈহিক ক্ষতিপূরণের জন্য অপেক্ষা করলাম। অবশ্য, এই দীর্ঘ সময় আমি কমরেডদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলেছিলাম। গোলাম উলরেহ্‌মানের ভাইয়েরা

ইজারা নিয়ে আমাদের জমি চাষ করতো—তারাই ছিল এই সংযোগ রক্ষার সূত্র।

সুস্থ হয়ে আমি ভাবলাম খুশল খান খাটকের সঙ্গে দেখা করবো; কোহাট থেকে তাকে আনবার জন্য মীর গজনকে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েকদিন পর সে যখন এলো, তখন আমি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে সব কথা জানিয়ে বললাম, ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সে জিজ্ঞাসা করলো, তার কাছে আমি কি চাই। আমি তাকে বললাম, কমরেডদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া দরকার। এর জন্য অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন হলে সানোবর হুসেনের কাছ থেকে তা নিতে হবে। তাছাড়া একজন কমরেড্‌কে আমার সঙ্গে দিতে হবে। সেই কমরেড হবে নির্ভরযোগ্য, রাজনৈতিক দিক দিয়ে তৎপর এবং বুদ্ধিমান। সে আমার সঙ্গেই থাকবে—কখনও হয়তো আমার অনুপস্থিতিতে কাবুলে থেকে জার্মানদের সঙ্গে তাকেই যোগাযোগ রাখতে হবে। এই যোগাযোগ রাখার কাজটি অত্যন্ত জটিল।

জবাবে খুশল খান বললো, প্রথম কাজটি তারা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে এবং এই ব্যাপারে তারা ইপ্‌পির ফকিরের সঙ্গে সংযোগ রেখেছে। তাদের অর্থের অভাব ছিল, এখন নিশ্চয়ই তারা সানোবর হুসেনের সঙ্গে দেখা করবে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধের প্রসঙ্গে সে বললো---এই কাজে তার ছোট ভাই মোহম্মদ জিন্না ওরফে মোহম্মদ উস্‌সফ উপযুক্ত।

আমি তাকে বললাম, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমি পাঞ্জাবে যাবো, এমন কি বম্বেও যেতে পারি। আমার উদ্দেশ্য ওখানকার কমরেডদের সঙ্গে নীতিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। উপজাতীয় অঞ্চলে, দির ও সোয়াট রাজ্যে এবং আফগানিস্তানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারতের পরিস্থিতি অপেক্ষা অন্য ধরনের, সুতরাং পার্টির কর্মনীতি এখানে একটু পৃথকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের শ্লোগান এখানে ফাঁকা আওয়াজের

মতো শোনাবে ; এখানে লোকসংখ্যার শতকরা নিরানব্বই ভাগই মুসলমান—তারা অধিকাংশই লীগ-বিরোধী এবং কংগ্রেস-বিরোধী নয়। মুসলিম লীগ সমর্থকদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই ভূস্বামী। পাঠান জনসাধারণ সাম্প্রদায়িক নয়—আর পাঠান জনসাধারণের যারা শত্রু, অর্থাৎ ভূস্বামীবর্গ—তারা আছে লীগের দলে।

কমরেড্‌রা আমার মত পূর্ণ সমর্থন করলো। আমাদের ওখানে তিনদিন ওরা ছিল ; পরে খুশল খানকে আমি বললাম সে যেন তার ছোট ভাই মহম্মদ জিন্নাকে আমার কাছে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পাঠিয়ে দেয়।

এই সময়ের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম—তারপর ১৯৪২-এর ১লা জুন লাহোর রওনা হয়ে পরদিনই সকালে সেখানে পৌঁছুলাম ; সেই দিনই সন্ধ্যায় গেলাম ম্যাক্লিড্ রোডে, সি. পি. আই -এর অফিসে। আমার উদ্দেশ্য ছিল তেজ সিং স্বতন্ত্র-র সঙ্গে দেখা করা। শুনলাম তিনি সেখানে নেই কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ফিরবেন। ৪ঠা জুন তার সঙ্গে দেখা করতেও যখন পারলাম না, তখন অফিসের এক কমরেডের কাছে একটা চিরকূট রেখে এলাম। সেই কমরেড পরে আমার হোস্টেলে এসে আমাকে জানিয়ে গেল—তেজ সিং পার্টির অফিসে ৫ই জুন সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

সুতরাং ৫ই জুন সন্ধ্যায় আমার বহুশ্রুত সেই কিংবদন্তীর নায়ক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা তেজসিং স্বতন্ত্রের সঙ্গে প্রথমবার সাক্ষাৎ করলাম। এর পর থেকে ওঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেই ছিলাম। পরদিন খুব ভোরে তিনি আমার কাছে এলেন। এক ঘণ্টা আমরা আলোচনা করলাম ; সেই আলোচনায় এই কয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো :

১. আমার নিরাপদ বাসের জন্য গুরচরণ সিং তখন যেখানে ছিল, সেইখানেই আমাকে নিয়ে যাবে।

২. একজনকে পাঠাতে হবে আমার গ্রামে দরকারী কাগজ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য। গুরচরণ এই কাজের উপযুক্ত —তবু মালবহন করার জন্য একজন পৃথক লোকের ব্যবস্থা চাই।

৩. আমার ও আমার পরিবারের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান এবং যোগাযোগ রক্ষার ভার একজন মহিলা কমরেডের উপর দিতে হবে।

৪. পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পার্টি-নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। খুশল খান খাটক এবং কমরেড স্বতন্ত্র-র কাছে এর আগে আমি যে বক্তব্য ও ব্যাখ্যা রেখেছিলাম আর যে নীতিতে আমি এ পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছিলাম, আমার সেই রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এখন পার্টির কাছ থেকে আমাকে অনুমতি নিতে হবে।

৫. আমি যাতে নিরাপদে কাজ করে যেতে পারি সেইজন্য পার্টির দিক থেকে একটা গোপন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; অন্য দিকে আমার পরিবারের লোক আমাকে সাহায্য করবেন।

৬. আমি গভীর আগ্রহ সহকারে কলকাতায় গিয়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু স্বতন্ত্র বললেন--আমাকে প্রথমে বোম্বে যেতে হবে—তারপর কলকাতায়। এখন কলকাতায় যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। তাছাড়া ওখানে আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে, আমরা জানি না। আমি তাঁর মত মেনে নিলাম।

কমরেড স্বতন্ত্র শেষে গুরচরণের সন্ধান পেলেন। সে আমার হোটেলে এলো ১৯৪২-এর ১২ই জুন। সে বললো—স্বতন্ত্র বলে দিয়েছেন, আমাকে সেইদিনই গুরচরণের আশ্রয়স্থলে চলে যেতে হবে। তারপর সে সরলা শর্মাকে নিয়ে আমার গ্রাম ঘাল্লা দেহরে যাবে জিনিসপত্র আনবার জন্য। সরলা পরশুরাম শর্মার স্ত্রী। তিনি বেশ সঙ্গতি-সম্পন্না ও দুঃসাহসী রমণী এবং চমৎকার উপস্থিত-বুদ্ধির অধিকারিণী। আমি গুরচরণকে বললাম, সে আমার গ্রাম থেকে ফিরে এলে আমি তার আশ্রয়স্থলে উঠে যাবো।

ওরা গ্রাম থেকে ফিরে এলো ১৫ই জুন ভোরে, সেইদিনই সন্ধ্যায় আমি ওর আস্তানায় চলে গেলাম।

সেখানে গিয়ে গুরচরণের সঙ্গে আমার কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হলো। সে আমাকে বললো, শান্তিময় গাঙ্গুলি কয়েক মাস আগে লাহোরে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে বলেছি, আমাদের কর্মনীতির পরিবর্তন ঘটেছে বলেই এখন থেকে আমাদের মধ্যে কোনো সহযোগিতা আর রক্ষা করা যাবে না।

আমি গুরচরণকে বললাম—একথা শান্তিময় বাবুকে বলা অন্যায় হয়েছে, কারণ আমাদের কর্মনীতিতে কি পরিবর্তন ঘটলো, কেমন করে তা ঘটলো—আমারা তা জানি না। এই কর্মনীতি আমি যেমন বুঝেছি এরপর তা সংক্ষেপে গুরচরণকে বুঝিয়ে বললাম।

আমি তাকে জানালাম, এই নীতি নিয়ে কমরেড স্বতন্ত্র-র সঙ্গে আমার আলোচনা হয়ে গেছে, এখন আমি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য বোম্বে যাবো। তারপর যাবো কলকাতায়। গুরচরণ সম্মতি জানালো।

২১শে জুন আমি যাত্রা করলাম বোম্বের উদ্দেশে—স্বতন্ত্র রওনা হলেন তার পরদিনই। বোম্বে পেঁৗছুবার একদিন পরেই দেখা করলাম ডি. পি. সিং-এর সঙ্গে। ইতিমধ্যে কমরেড স্বতন্ত্র বোম্বে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং আমি সিং-এর সঙ্গে দেখা করবো তা বলে রেখেছিলেন। তিনি একটা আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করলেন—তাতে আমি ছিলাম, আর ছিলেন জি. অধিকারী এবং স্বতন্ত্র। আলোচনা চলেছিল দু'ঘণ্টারও বেশী সময়।

অধিকারীকে আমি সমস্ত কাহিনীটাই খুলে বলেছিলাম। কিভাবে কাবুলে গেলেন সুভাষচন্দ্র, কিভাবেই বা সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে বার্লিনে গেলেন—উপজাতীয় এবং পাশের অঞ্চলগুলিতে আমার কাজ, আমার রাজনৈতিক মতামত—সব কিছুই বুঝিয়ে বললাম তাঁকে। তিনি জানতে চাইলেন—ভারতে পার্টির কর্মনীতি সম্পর্কে আমার ধারণা কি।

আমি বললাম, ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই। কিন্তু আমার মত এই যে, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণ অক্ষশক্তির লক্ষ্যসাধনের অনুকূলে কাজ

করবে না, কারণ এর ফলে ফ্যাসিবিরোধী জোটের শক্তিগুলিই পুষ্ট হবে।

আরো কয়েকটি আলোচনা-সভার পর স্বতন্ত্র লাহোরে রওনা হলেন এবং আমি যাত্রা করলাম কলকাতা। ৩০শে জুন কলকাতায় পৌঁছে আমি সেণ্ট্রাল হোটেলেই উঠলাম। যাদের আমি চিনতাম এবারে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব কঠিন মনে হলো। আমার পরিচিত প্রায় সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা আমি জানতাম না। ব্যাঙ্কে কাজ করতেন এক ভদ্রলোক—তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চেষ্টা করলাম। তার নাম শশাঙ্ক দাশগুপ্ত। সকালে, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, ছুটির সময়—দিনে তিনবার আমি ব্যাঙ্কে হাজির হতাম, তাকে দেখতে পাবো এই আশায় বাইরেও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাম। তিন দিন এই ছুটোছুটির পর সিদ্ধান্ত করলাম—হয় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, না হয় তিনি অন্য ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এইভাবে তার সঙ্গে দেখা করার আশায় ব্যর্থ হয়ে আমি লাহোরে ফিরে এলাম।

লাহোরে এসে দুই দিন পুরো বিশ্রাম নিলাম। গুরুচরণকে বলে দিলাম স্বতন্ত্র-র সাহায্য নিয়ে সে যেন একটি রিপোর্ট তৈরী করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে রাখে—তাকেই ঐ রিপোর্ট কাবুলে নিয়ে যেতে হবে। তার বাড়ীতে স্বতন্ত্র-র সঙ্গে সে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলো। তাঁর সঙ্গে বোম্বের ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি বললেন—বোম্বের কমরেডরা তোমার কাজে নাক গলাতে চায় না, আমিও না। সব শুনে আমি খুশিই হলাম। আমি তাঁকে বললাম, হাল আমলের রাজনৈতিক ও সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমার সঙ্গে লাহোরস্থিত আমাদের পার্টি-কেন্দ্রের সঙ্গে এবং আমার বাড়ীর সঙ্গে—যোগাযোগ রক্ষার জন্যও এই সংগঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। দক্ষতার সঙ্গে এই সংগঠন-যন্ত্রকে কাজ করে যেতে হবে—যাতে কারও নিরাপত্তা বিপন্ন না হয় তা-ও দেখতে হবে। সরলা আমার ও লাহোরের মধ্যে দূতের কাজ করতে পারবে—মর্দান, পেশোয়ার

ও উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগ রক্ষাকারীর কাজ করতে পারবে মোহম্মদ উমর খান।

স্থির হলো, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরী করবেন কমরেড স্বতন্ত্র আর গুরচরণ। উপজাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরী করবো আমি, সানোবর হুসেনকে নিয়ে।

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। ওদের দুজনের রিপোর্ট শেষ করতে লেগে গেল প্রায় এক সপ্তাহ। ২২শে জুলাই গুরচরণকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মর্দানে, আমার বাড়ী ফেরার পথ নিষ্কণ্টক করার জন্য। ২৭ তারিখে সে লাহোরে ফিরে এসে জানালো—১লা আগস্ট আমাকে মর্দানে রওনা হতে হবে ফ্রন্টিয়ার মেলে, ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে।

আমি ট্রেনে রওনা হলাম, সন্ধ্যায় পৌঁছুলাম নওশেরা। দেখলাম, অনন্তরাম প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করছে আমার জন্য। সে আমাকে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নিয়ে এলো এমন একটি জায়গায় যেখানে ওয়ারিস খান অপেক্ষা করছিল টাঙ্গা নিয়ে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলাম গ্রামের দিকে। বাড়ী থেকে কিছু দূরে ওয়ারিস খান আমাকে নামিয়ে দিল। আমি অনন্তরামকে অনুসরণ করে আমাদের বাড়ী চলে এলাম। গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আমারই পথ চেয়ে ছিলেন আমার মা। তিনি বললেন, আমার বাড়ী ফিরে আসায় তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, কদিন বাদে যখন কাজের জন্য আবার আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে তখন তিনি দুঃখ পাবেন। সুখ-দুঃখের চাকা এই ভাবেই ঘুরতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা লাভ করতে না পারি।

উপজাতীয় অঞ্চলে রওনা হবার আগে ওয়ারিসের সঙ্গে আমার বিস্তৃত আলোচনা হলো। ইতিমধ্যেই আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম—উত্তমচাঁদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবার কাবুলে গিয়ে আমাকে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাই ভেবে আমার আশঙ্কার কথাও প্রকাশ করলাম। আমীর জাদা নামে একজন আফগান দীর্ঘকাল

ভারতে বাস করছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি ওয়ারিসকে প্রশ্ন করলাম—আমীর জাদাকে আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে আগেই কাবুলে পাঠানো যায় কিনা। কাবুলে আমার এক বন্ধুর পশমের পোশাক তৈরীর করখানা আছে—আমীর জাদার কাজ হবে তার কাছে আমার একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়া। আমির জাদার আফগান পাসপোর্ট ছিল।

ওয়ারিস খান তাকে অনুরোধ করতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাবুলে যেতে রাজী হয়ে গেলেন। আমি তাকে লবে-দর্যার সেই জায়গাটির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে দিলাম—বললাম যার কাছে আমি তাকে পাঠাচ্ছি তার নাম হাজি আবদুল সোভান্। আমীর জাদা তাকে বলবেন, তিনি রহমৎ খানের কাছ থেকে এসেছেন—রহমৎ খান দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই কাবুলে যাচ্ছেন।

আমীর জাদা ৫ই আগস্ট রওনা হয়ে গেলেন—এবং ১৯৪২-এর ৬ই আগস্ট কাবুলে হাজির হলেন। তিনি যখন হাজির গৃহে ছিলেন, দুর্ভাগ্যবশত পুলিশ এলো হাজিকে গ্রেপ্তার করতে। তারা আমীর জাদার পরিচয় জানতে চাইলো। আমীর জাদার কাছে আফগান পাসপোর্ট থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করলো। আফগানিস্তানে তার যত আত্মীয়-স্বজন ছিল তাদের উপরেও নির্যাতন করা হলো। আমরা গ্রাম ছেড়ে যাবার আগেই তার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এই সব খবর জানতে পারলাম।

আমি সরলা আর জিন্নার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। জিন্না আমার সঙ্গে কাবুল যাবে—এই রকমই কথা ছিল; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাবুল যাবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

শেষ পর্যন্ত বোরখা-পরা সরলা এলো পাঠান মহিলার বেশে। সে সোজা মর্দানে আমার বড় ভাইয়ের কাছে গিয়েছিল—সেখান থেকেই এসেছে আমাদের গ্রামে। দু'দিন তাকে আমাদের বাড়ীতেই থাকতে হলো, কেননা, কাবুলের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো আমি স্বতন্ত্রকে জানাতে চেয়েছিলাম।

১২ই আগস্ট তারিখে জিন্না এলো। আমি ওয়ারিসের সঙ্গে দেখা

করে তাকে জানালাম, ১৬ই তারিখে রাত্রিতে আমি রওনা হবো। কথা ছিল, গোলামুল রেহমানের ভাই আবদুল হাকিম সওয়াল কিল্লা পর্যন্ত 'গাইড' হিসেবে আমাদের সঙ্গে যাবে। এবারে আমি আমার পথ পরিবর্তন করলাম। নিরাপদ হলেও এই পথ অত্যন্ত কঠিন ছিল। আমি দ্বিতীয়বার কাবুল যাত্রার সময় এই পথই ব্যবহার করেছিলাম— যখন শান্তিময় গাঙ্গুলি আর সোধি হারমিন্দর সিংকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ১৬ই আগস্ট অনন্তরাম ও আমি অন্ধকারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম; জিন্না ও আবদুল হাকিম ছিল ওয়ারিস খানের সঙ্গে। ওয়ারিস খান নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছুলো— রাত প্রায় দশটায় আমরা সবাই একসঙ্গে যাত্রা করলাম। প্রায় ছুটোয় পৌঁছুলাম নওশেরার মর্দান রেলপথে অবস্থিত দুরগাই।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম ওখানে। ভোরের দিকে প্রায় ছ'টায় পৌঁছুলাম উপজাতীয় সীমান্তে। ওখানে আমরা টাঙ্গা ছেড়ে দিলাম— ওয়ারিস আর অনন্তরাম বাড়ী ফিরে গেল।

এইবার আবার আমরা যাত্রা করলাম পায়ে হেঁটে—আমি, আবদুল হাকিম আর জিন্না। সীমান্তে যেখানে তল্লাশীর ব্যবস্থা ছিল সেখানে আমাদের জেরা করা হলো, কিন্তু তল্লাশী চৌকির কর্মচারী আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে এগিয়ে যাবার জন্য অনুমতি দিলেন। তার পদমর্যাদা ছিল তহ্শীলদারের। তিনি আমাকে বললেন—তার একটি রিভলবার আছে কিন্তু এর কার্তুজ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। খুব সম্ভব চিন্‌গাইতে কার্তুজ পাওয়া যেতে পারে। তিনি আমাদের অনুরোধ জানালেন ফেরার পথে আমরা যেন কিছু কার্তুজ নিয়ে আসি—কার্তুজের দাম তিনি সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতে প্রস্তুত। আমি তাকে বললাম, এর জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তার সামনেই আবদুল হাকিমকে বলে দিলাম সে যেন কার্তুজ সংগ্রহ করে ফিরে যাবার পথে তহ্শীলদার সাহেবকে দিয়ে যায়।

বেলা দশটায় তল্লাশী-চৌকি পার হয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর সোয়াট নদী পার হয়ে বরঙ্গ্-এ হাজির হলাম সকাল ৭ টায়।

আফেন্দি আব্‌দুল লতিফ এইখানে থাকতেন, এবং আমাদের ভাগ্য-বশতই বলতে হবে, তখন তিনি সেইখানেই ছিলেন। তাঁর বাড়ীতেই আমরা রাত কাটালাম।

১৮ই আগস্ট বিকাল ছ'টায় আমরা পৌঁছুলাম সওয়াল কিল্লাতে। কিছু পরেই পার্টির নেতাদের সঙ্গে কাবুলের পরিস্থিতি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা হলো। বেশ উৎসাহ নিয়েই ওরা আমার রিপোর্ট শুনলেন। রিপোর্ট পেশ করার পর আমি তাদের বললাম, কাবুলের অবস্থা যখন জটিল হয়ে উঠেছে তখন আমার সঙ্গে সৈয়দ মূর্তজাকে নেওয়া দরকার, যদিও জিন্না সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তবু এ-ধরনের কাজে সে একেবারে নতুন—সে কিভাবে এই জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তা বলা কঠিন।

পরদিন বিকেলে আমরা চারজন কাবুলে যাত্রা করলাম—আমি, গোলাম মূর্তজা, জিন্না আর গোলাম উলরেহ্‌মান। ২৩শে আগস্ট সন্ধ্যায় আমরা 'কুদাখেল'-এ হাজির হলাম। মিরন জানের সঙ্গে কথা হলো। সাধারণভাবে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অলোচনার পর আমি তাকে জানালাম, পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় আমি কি মনোভাব নিয়েছি। যদিও আমার কথায় সে খুশি হয়েছে দেখলাম, কিন্তু মনে হলো যুদ্ধ-পরিস্থিতির অগ্রসরণ এবং দেশ থেকে ব্রিটিশ-বিতাড়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে সে যেন কিছু নিরাশ হয়ে পড়েছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম—আশা-ভঙ্গের কোনো কারণ নেই। রুশ-ফ্রণ্টে জার্মানরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। রাশিয়া, ইরান ও আফগানিস্তানকে পর্যুদস্ত করা এবং তাদের ভারত-আক্রমণের পরিকল্পনাও কখনো সফল হবে না। মিরন জান প্রশ্ন করলো—আমি কি করে জানতে পারলাম যে জার্মানরা ভারত-আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে, ব্রিটিশের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার সঙ্কল্প করে নি? তার বক্তব্য, সুভাষচন্দ্র বসু তো ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্যই জার্মানীতে রয়েছেন, আর তাঁর পক্ষ হয়েই তো আমরা কাবুলে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।

আমি তাকে বললাম, জার্মানদের লক্ষ্য নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ

রাখা, আমাদের স্বার্থের কথা তারা ভেবেও দেখবে না। হিটলার এই যুদ্ধ শুরু করেছে ঔপনিবেশিক জাতিগুলিকে তাদের প্রভুদের হাত থেকে মুক্ত করার শুভ সঙ্কল্প থেকে নয়—উপনিবেশগুলিকে পুনরায় ভাগাভাগি করে দেওয়ার জন্য। তাবা আমাদের সাহায্য করছে এখানে একটা সংগঠন গড়ে তুলতে, যা ব্রিটিশকে পরাজিত করার জন্য সময় মতো তারা কাজে লাগাতে পারবে বলে মনে করে। কিন্তু তাদের এই অবসর হয়তো মিলবে না; যখন সময় আসবে তখন এই সংগঠন ব্রিটিশ-বিতাড়নের ব্যাপারে আমাদের সংগ্রামে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। মিরন জান সব শুনে বললো—হ্যাঁ, ওইটাইতো আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পরদিন শেষ রাত্রি ৩ টায় আমরা কুদাখেল ছেড়ে এলাম। জালালাবাদ পৌঁছেই সৌভাগ্যবশত আমরা একটা ট্রাক পেয়ে গেলাম—কাবুলে পৌঁছুলাম ২৮শে আগস্ট রাত্রিশেষ ৩ টায়।

সেদিন সন্ধ্যায় বহু কষ্টে আমি হাজি আবদুল সোভানের বাড়ীতে প্রবেশ করার সুযোগ খুঁজে বের করলাম—দেখা হলো তার জার্মান ভার্যার সঙ্গে। তিনি বললেন, পুলিশ যখন হাজি সাহেবকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল তখন আমীর জাদা এখানেই ছিলেন; পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করেছে। তিনি আমাকে জানালেন, আমীর জাদার মারফৎ আমি জার্মান দূতাবাসে যে বার্তা পাঠিয়েছিলাম তা তিনি মিঃ বাসমাসকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমার আগমনবার্তাও তিনি তাকে জানিয়ে দেবেন। আর একটি বিষয়ও তিনি তার কথায় যোগ করে দিলেন, উত্তমচাঁদের গ্রেপ্তারের পরে কাবুলের অবস্থা অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে—তাই আমি আমার কমরেডদের নিয়ে যেন খুবই সতর্ক থাকি। আফগান পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে; তারা হাজি আবদুল সোভানের কাছে আমার সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর করছিল। শেষে তিনি বললেন, 'তাদের যা খুশি করুক, কিন্তু জার্মান সৈন্যবাহিনী খুব বেশী হলে আর ছয় মাসের মধ্যেই এখানে এসে পড়বে, তখন আমরা দেখবো, এখানে ব্রিটিশ ও

রুশীয়দের সাহায্য করে তারা যে পাপ করেছে তার হাত থেকে কিভাবে ওরা আত্মরক্ষা করে।'

২২ তারিখে মিঃ রাসমাসের সঙ্গে আমার দেখা করাব কথা। সাক্ষাতের স্থান—ডক্টর ডেভ্রিৎথ-এর বাড়ী। এই সাক্ষাৎকার ছিল অল্প সময়ের জন্য ; কারণ বেশী সময়ের জন্য আলাপ-আলোচনা ওখানে সম্ভব ছিল না। সাধারণ কুশল বিনিময়, যে রিপোর্ট দুটি সঙ্গে এনেছিলাম তা দিয়ে দেওয়া—করণীয় ছিল মাত্র এইটুকু। কিন্তু তারা রিপোর্ট পড়বার পর তা আলোচনা ও ব্যাখ্যার জন্য, আর জার্মানদের পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিতে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হতে পারে। পরবর্তী সাক্ষাৎকারের দিন নির্দিষ্ট হলো সপ্তাহ-খানেক পর—হয়তো সেই আলোচনা সাতদিন বা দশদিন পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এই অবকাশে আমরা একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত মেজং-এর কাছে চরদহতে একটা ছোট বাড়ী পেয়ে গেলাম—সেইখানেই আমরা চলে গেলাম দ্রুত।

৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মিঃ উইৎজল একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আমাকে তুলে নিলেন—তারপর পৌঁছে দিলেন একটা বাড়ীতে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন মিঃ রাসমাস, মিঃ হ্যান্‌স্ ডো, মিঃ জুজুম্‌বুল্লা আর মিস্ গ্যালিন। ইনি পরবর্তীকালে মিঃ উইৎজলের গৃহিণী হয়েছিলেন।

মিঃ রাস্‌মাস্ আমাকে বললেন,—'শহরের অবস্থা যেরকম সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে তাতে আমাদের ইচ্ছে আপনাকে কিছুদিন এখানে নিরাপদে রাখা—অবশ্য এই ব্যবস্থা আপনার কাছে কষ্টদায়ক মনে হতে পারে।' এর অর্থ এই, দূতাবাসে যেসব আফগান কর্মচারীরা রয়েছেন তাদের দৃষ্টিপথের বাইরে আমাকে থাকতে হবে এবং গোপনে আমার খাদ্যের ব্যবস্থাও করতে হবে।

আমি তাদের বললাম—কষ্টের প্রশ্নটা খুব বড় নয়; আসলে আমার মনে হচ্ছে এই ব্যবস্থাও যথেষ্ট নিরাপদ নয়। কারণ হঠাৎ যদি আমি ঘরে কেসে ফেলি তাতেই জানাজানি হয়ে যাবে ঘরে কেউ

আছে ; ফলে, আফগান কর্মচারীদের মনে সন্দেহ জাগবে। তারা তখন আমার উপর লক্ষ্য রাখবে ; তারপর আমি বাথরুমে যাবার সময় আমাকে দেখেও ফেলতে পারে।

ব্যাপারটা এইখানেই স্থগিত রইলো ; আমরা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও আমাদের কাজের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। আমার দেওয়া রিপোর্ট সম্পর্কে ওরা বললেন—কতকগুলো মূল্যবান তথ্য ঐ রিপোর্টে ওরা পেয়েছেন, বিশেষত গান্ধীজি-পরিচালিত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য জানবার জন্য তারা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তারা বললেন, রেডিও এবং সংবাদ-পত্রের বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ আর নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে আমিও তাদের সঙ্গে একমত ; তাদের বললাম, 'আমিও তো এই আন্দোলনের সমস্ত ছবিটা আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারবো না ; কারণ আমি যখন ভারতে ছিলাম বা উপজাতীয় অঞ্চলে ছিলাম—এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের উপকরণ সংগ্রহের উপায় আমার ছিল না। তবে কথা দিচ্ছি, এই আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ আগামীবারে আপনাদের দিতে পারবো।'

তারা আমাকে জানলেন, রুশীয় কিংবা মধ্য-প্রাচ্যের রণাঙ্গনে সামরিক অবস্থা আশাব্যঞ্জক, যদিও অগ্রগতির ধারা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জাপানীরা ব্রহ্মদেশে, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে সেনা-বিন্যাস করে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে নিচ্ছে।

তারা বললেন—রুশীয় রণাঙ্গনে তাদের সশস্ত্র বাহিনী স্তালিনগ্রাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেইটিই তাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ; কিন্তু তারা আশঙ্কা করছেন, ঐ অঞ্চলে রুশীয় প্রতিরোধও তীব্রতম হয়ে দেখা দেবে।

মিঃ উইৎজল আমাকে বললেন—এটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, তাদের সশস্ত্র বাহিনী সমগ্র রুশীয় এলাকা দখল করে নিতে চায় না। তাদের রণনৈতিক অভিপ্রায় হলো—রাশিয়ার যে অঞ্চলগুলি তারা

অধিকার করতে চায় সেই অঞ্চলগুলিতে তাদের যে সশস্ত্র বাহিনী থাকবে তাদের সঙ্গে মধ্য-প্রাচ্যের সশস্ত্র বাহিনীর যোগাযোগ ও মিলন ঘটিয়ে দেওয়া।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—তার অর্থ কি এই নয় যে, জার্মান সশস্ত্র বাহিনী রাশিয়া অতিক্রম করে ইরান আর ইরাকে প্রবেশ করবে, তারপর আরও এগিয়ে আসবে মধ্যপ্রাচ্যের বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য ?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, আর যদি তারা এই লক্ষ্যে এসে পৌঁছুতে পারে, তবে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে তাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে।

তারা আমাকে বললেন, পরের দিন থেকেই আমাদের রিপোর্ট বার্লিনে পাঠিয়ে দিতে শুরু করবেন। তারা আরও জানালেন, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের রিপোর্ট তাদের কাজের সহায়ক ; তবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে তারা আরও বিস্তারিত ভাবে জানতে ইচ্ছুক।

উপজাতীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছিলাম সেই প্রসঙ্গে তারা বললেন—রিপোর্ট পড়ে তারা খুশিই হয়েছেন তবে সেখানে কাজের গতি অত্যন্ত দ্রুত—এর ফলে ঐ অঞ্চলে তাদের সামগ্রিক রণনীতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে। এই ভাবে এগিয়ে গেলে আন্দোলনের উচ্চতম শিখরে পৌঁছুতে দেরী হবে না, কিন্তু তখন একে আয়ত্তে রেখে পরিচালিত করা কঠিন হয়ে উঠতে পারে। তারা মন্তব্য করলেন, রুশীয় রণাঙ্গনে আমাদের চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্য আন্দোলনের গতি খানিকটা শিথিল করে আনা দরকার। আমি বললাম, তাদের রণনীতি কি, আমাদের কাছ থেকে তারা কি আশা করেন তা আমাদের না জানতে দিলে তাদের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে চলা আমাদের পক্ষে কঠিন। সুতরাং এই সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন আলোচনার দরকার।

এরপর মিঃ রাসমাস আমাকে কতকগুলো প্রশ্ন করলেন, আমি সেগুলির জবাব দিলাম :

প্রশ্ন : 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের ফলে মনে হয় ভারতীয় পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে চলে এসেছে। কিন্তু মিঃ জিন্নার ভূমিকা ক্ষতিজনক। আমার প্রস্তাব এই, অক্ষশক্তির সমস্ত বেতারকেন্দ্র থেকে এবং আজাদ হিন্দ্ সরকারের বেতার-ঘোষণাতেও জিন্না-বিরোধী প্রচার চালু হোক। এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর : আমার মনে হয়না, তাতে কোনো সুবিধে হবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, জিন্না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু এ রকম জিন্না-বিরোধী প্রচার যদি শুরু হয়ে যায় তাহলে মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগ এর প্রত্যুত্তরে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তাদের প্রচণ্ড নিন্দামূলক প্রচার চালাতে থাকবে—এতে পরিণামে আমাদের স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হবে।

প্রশ্ন : আমার মনে হয় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া উচিত।

উত্তর : ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ধরনের চিন্তা অনুমোদন করি না। আমার ধারণা, মাজোত্তাও (সুভাষচন্দ্র বসু) এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন না। বড় বা ক্ষুদ্র যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই হউক, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, সাধারণত যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের একটা বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করবে; স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা এগিয়ে চলেছি, সুতরাং যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে সেগুলো ধ্বংস করা নিশ্চয়ই ক্ষতিজনক। আপনাকে আমার অনুরোধ, আমার মত উল্লেখ না করে সম্ভব হলে বিষয়টি আলোচনার জন্য পাঠাতে পারেন।

প্রশ্ন : 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশরা সৈন্যবাহিনী প্রয়োগ করছে। কোন্ পথে এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করা যায়?

উত্তর : আমার মনে হয়, নিশ্চয়ই আপনারা এটা চান না, যে-সৈন্য-বাহিনী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দমনে নিযুক্ত তারা এসব ছেড়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে আপনাদের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক। (এই মন্তব্য ছিল অবশ্য একটু লঘু সুরে)। আমি বলি, আমাদের জনগণ আর আপনাদের প্রচার-যন্ত্র 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দমনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করুক—কেননা এই আন্দোলন বিদেশী জোয়াল থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্যই পরিকল্পিত।

মিঃ রাসমাস এবং মিঃ উইৎজল দুই জনেই বললেন, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনের পরিচালন-পদ্ধতিটা ভুল। সাধারণ মানুষ মিছিল বের করছে এবং সর্বসাধারণের জন্য সভার অনুষ্ঠান করছে : পুলিশ আর সৈন্যবাহিনী এসে তাদের সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে—তারা সরে না গেলে ওরা গুলি ছুড়ছে, তারপর ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তাতে বিশেষ ক্ষতিই হচ্ছে—বাস্তব লাভ কিছু হচ্ছে না। আপনি কিভাবে এটি ব্যাখ্যা করবেন ?

আমি উত্তর দিলাম—আপনার মূল্যায়ন সঠিক বলেই মনে হয়, কিন্তু ঘটনার বাস্তব পরিস্থিতিটা এই রকম : 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই কংগ্রেসের নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। উচ্চপদে আসীন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না যিনি আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন ; সুতরাং যারা গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছেন তারা সর্বভারতীয়, প্রাদেশিক বা জেলাস্তরে যে-যেখানে থাকুন না কেন যেমন উপযুক্ত মনে করছিলেন সেইভাবে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল। স্বভাবতই তারা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই আন্দোলনের পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন, অর্থাৎ যাতে আন্দোলনে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত অতীতের সংগ্রামগুলি থেকে এখন আন্দোলনের রূপ ও রীতি সম্পূর্ণ পৃথক—স্থানে স্থানে এর তীব্র গতি দেখলে মনে হবে যেন সত্যিকার গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে।

মিঃ উইৎজলের মতানুসারে দক্ষিণ রণাঙ্গনে রুশীয় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে জার্মান সশস্ত্রবাহিনী সমগ্র রুশ সাম্রাজ্য অধিকার করতে যাবে না—বাহিনীর মোড় ঘুরে যাবে মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনে। মিঃ রাসমাস অবশ্য আশা করছিলেন, জার্মান-বাহিনী রুশ-বাহিনীকে পরাস্ত করে ইরান, ইরাক ও আফগানিস্তানকে পদদলিত করে চলে আসবে ভারতের সীমান্তে।

এই আলোচনার সময় আমার মিসেস হাজির কথা মনে পড়লো। তিনিও আশা প্রকাশ করেছিলেন, জার্মান সৈন্য ছয় মাসের মধ্যে আফগানিস্তানে চলে আসবে। তখন আমি ভাবলাম—আফগানিস্তান ও ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা হয়তো থাকতে পারে।

১৫ই সেপ্টেম্বর আবার আমাদের দেখা হলো। মিঃ উইৎজল জানতে চাইলেন, উপজাতীয় অঞ্চলে কি রীতিতে কাজ চলেছে। আমি আমাদের কর্মনীতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলাম। এর পর তিনি বললেন, তিনি বার্লিন থেকে এক নির্দেশ পেয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে আফগানিস্তানে এবং উপজাতীয় অঞ্চলে কিছু সংখ্যক নতুন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এদের হতে হবে ব্রিটিশ-বিরোধী এবং আমানুল্লার (আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব রাজা) পক্ষপাতী। জেনারেল গোলাম নবী খানের ভাই গোলাম সাদেক খান কয়েকটি নামের তালিকা জার্মান হাইকম্যাণ্ডের কাছে পাঠিয়েছিলেন। গোলাম নবী খান আফগানিস্তানের বর্তমান শাসক দলের বিরোধী ছিলেন—রাজা নাদির শাহের হাতে তিনি নিহত হন। গোলাম সাদেক খান জার্মানীর বন্ধু—আফগানিস্তানের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। মিঃ উইৎজল এদের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ স্থাপনের অনুরোধ জানালেন। সেই নামগুলি এই :

১. মল্লিক হাসান খান (সর্দার খানের পুত্র; গন্দব গ্রামের মোহামন্দ উপজাতীয়)

২. মল্লিক আমিনজান (মল্লিক মসল খানের পুত্র; কুদাখেল-এর মোহামন্দ উপজাতীয়)

৩. মুল্লা মহম্মদ ইউসফ (বাব্রে মুল্লা নামে পরিচিত ; গ্রাম—বাবারা)

৪. পশৎ-এর খান (বজাউর)

৫. মুল্লা মহম্মদ উমর খান্ (সওয়াল কিল্লা ; বজাউর অঞ্চলের শামাজাই উপজাতীয়)

আমি মিঃ উইৎজলকে জানালাম, মল্লিক হাসান খানকে ইতিমধ্যেই কাবুল শহরে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে—তার শহর ছেড়ে যাবার উপায় নেই। সুতরাং তার সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো লাভ নেই। তবে তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো। আর চারজন সম্পর্কে বলতে পারি—এদের সকলের সঙ্গে আগেই আমাদের ভালো বোঝাপড়া হয়ে আছে। বিশেষত আমাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র সওয়াল কিল্লার মহম্মদ উমর খান ঐ অঞ্চলে আমাদের একজন বিশ্বস্ত ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী কর্মী।

১৯৪২-এর ৭ই অক্টোবর আবার আমি মিঃ রাসমাস ও মিঃ উইৎজলের সঙ্গে দেখা করলাম। তারা বলেছিলেন—আমার জন্য একটা বার্তা এসেছে এবং পরের দিন আমরা আবার মিলিত হবো।

মিঃ উইৎজল আমাকে গাড়ীতে তুলে নিলেন ; কিন্তু আমাকে বললেন—আলোচনা-সভা পরের দিনের জন্য স্থগিত রাখতে হচ্ছে, কেন না তারা এর জন্য ঠিক প্রস্তুত হতে পারেন নি।

তবু সাধারণভাবে রাজনীতি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হলো। মিঃ উইৎজল ছিলেন জার্মান কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাজ্ঞ এবং যোগ্য ব্যক্তি—তবু সেদিন তাকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হলো। তিনি আমাকে বললেন, রুশীয় প্রাচ্য রণাঙ্গনে তারা এমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন যা তারা ভাবতেও পারেন নি। বস্তুত জার্মান অগ্রগতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তবু তাদের শেষ সাফল্য সম্পর্কে তিনি আশান্বিত ; যদিও এই সাফল্য সহজে আসবে না।

৯ই অক্টোবর মিঃ রাসমাস ও মিঃ উইৎজলের সঙ্গে আবার

আলোচনা সভা। তারা বললেন—বার্লিনের ইচ্ছা, আমি নিম্নলিখিত নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাই :

১. বিমান অবতরণের জন্য একটি জমির ব্যবস্থা করতে হবে—এই জমির দৈর্ঘ্য হবে ১১/২ মাইল, আর বিস্তার ১/২ মাইল।

২. বিমান চালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ তেলের আয়োজন রাখতে হবে; এই তেলের পরিমাণ হবে ইয়োরোপের কোনো বিমানভূমি থেকে উপজাতীয় অঞ্চলে অন্তত দুবার যাতায়াতের পক্ষে পর্যাপ্ত।

৩. উপজাতীয় অঞ্চলে কিছু গেরিলা-কেন্দ্র গঠন করা আশু প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ঐ সব অঞ্চলে শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলতে হবে—উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের যে কমরেডরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

৪. নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা—এখানে থাকবেন কারিগর, ডাক্তার, সমরকুশলী ব্যক্তিগণ; সঞ্চয়-ভাণ্ডার—এখানে রাখা হবে হালকা অস্ত্র, গোলা-বারুদ, বিভিন্ন ধরনের বেতারের উপকরণ, ম্যাপ, ঔষধ ও অর্থ প্রভৃতি।

৫. ঐ অঞ্চলগুলিতে যারা থাকতে আসবেন তাদের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা। এটি অত্যন্ত গোপন রাখতে হবে—কেননা, এতে কিছু ভারতীয় লোকও থাকতে পারে।

৬. সবগুলি কেন্দ্রের সঙ্গেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সুসংবদ্ধ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

৭. ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করাই উদ্দেশ্য কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করা চলবে না।

৮. ভারতে যেখানে যেখানে ব্রিটিশের সামরিক সরবরাহ কেন্দ্র সেইসব স্থানে অন্তর্ঘাতমূলক নীতিই হবে প্রধান লক্ষ্য।

৯. ব্রিটিশ ও আমেরিকা ইরানের মাধ্যমে সোভিয়েতকে যে সাহায্য সরবরাহ করে যাচ্ছে তা ধ্বংস করে দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন।

১০. ইরানের মাধ্যমে রাশিয়ায় এই সরবরাহ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কতকগুলি সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথগুলি ধ্বংস করতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য ভালোভাবে সাধিত হবে।

১১. ভারতে সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথার্থ রিপোর্ট এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক আবহাওয়ার পূর্ণ বিবরণ পাঠাতে হবে।

১২. ভারতে যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ ছাঁটাই করার বা নির্মাণে বাধা দেবার যথাসম্ভব চেষ্টা করে যেতে হবে।

আমি জার্মানদের জানালাম, বিশেষ জরুরি কাজের জন্য গোলাম মূর্তজাকে নিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে কাবুল ছেড়ে যেতে হবে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য জিন্না থাকবে কাবুলে। আমি এও বলে রাখলাম, যদি আমার কিছু ঘটে, অর্থাৎ যদি গ্রেপ্তার হই বা নিহত হই, গোলাম মূর্তজা আমার হয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। যতদিন আমার স্থানে অন্য কাউকে না পাঠানো হয় ততদিন এই ব্যবস্থাই চলবে।

মূর্তজা ফিরে এলো আমদের বাড়ীওয়ালা আবদুল রউফের সঙ্গে। আমাদের মালবহনের জন্য দুটো ঘোড়া সে কিনে এনেছে। ১৯৪২-এর ১৯শে অক্টোবর আমরা কাবুল ছাড়লাম। জিন্না রইল বাড়ী দেখাশোনা করা আর জার্মানদের'সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য।

২০শে অক্টোবর আমরা পৌঁছুলাম জালালাবাদে; সেখানে একদিন থেকে 'কুদাখেল'-এ (এই উপজাতীয় অঞ্চলে মিরন জানের বাস) পৌঁছুলাম ২১শে অক্টোবর গভীর রাত্রিতে। সেখানে একদিন থেকে তার কাছে মোহামন্দ্ এবং আফগানিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাশাপাশি অন্যান্য উপজাতীয় অঞ্চলের অবস্থার কথা শুনলাম। আমিও কাবুলের আলোচনার বিবরণ দিলাম।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাবুল থেকে সওয়াল কিল্লা, রীতিমত ক্লান্তিজনক পথ-পরিক্রমা। আরাম ও বিশ্রাম—দুইয়ের প্রয়োজন অনুভব করলাম। আরও একটি প্রয়োজন ছিল; তখনকার কংগ্রেস এম. এল. এ. আমার বড় ভাই লালা যমুনাদাস তলোয়ার কিংবা আমার ছোট ভাই অনন্তরামকে আমার ঘাল্লা দেহরে ফিরে যাবার কথা জানিয়ে একটা বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে; আমার আর একটি ছোট ভাই কিশোরীলাল মর্দানে থাকতো। মহম্মদ

উমর খানকে ২৬শে অক্টোবর মর্দানে পাঠালাম তিন ভাইয়ের মধ্যে যে-কোনো একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই সংবাদ জানাতে যে, আমি ১লা নভেম্বর রাত দশটা নাগাদ মর্দানে পৌঁছুব।

এরপর মর্দানের উদ্দেশে যাত্রা। যথোপযুক্তভাবে ছদ্মবেশ পরে নিলাম; তারপর গোলামুল রেহ্মানের সঙ্গে রওনা হয়ে ১লা নভেম্বর ভোর ৪টের সময় গেলাম বাটখেল্লা। এখানে এসে গোলামুলকে ফিরে যেতে বললাম, আমি ধরলাম মর্দানের বাস। রাত আটটায় 'তখত ভাই'তে পৌঁছে বাস থেকে নেমে একটা টাঙ্গা নিলাম—রাত দশটায় মর্দানে পৌঁছুলাম এবং শঙ্কর বাজারে আমার ভাইয়ের বাড়ীর সামনে এসে টাঙ্গা থামলো। আমার লোকজনেরা সবাই সতর্ক ছিল এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। ভাইকে বললাম—এখনও তাকে 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে' গ্রেপ্তার করা হয় নি কেন? তিনি বললেন—যে কোনো দিন গ্রেপ্তারের আশঙ্কা রয়েছে—সুতরাং আমার গ্রামের বাড়ীতে চলে যাওয়া ভালো।

মর্দান থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে আমাদের গ্রাম। রাত প্রায় ১টায় রওনা হলাম—যখন হাজির হলাম তখন রাত আড়াইটে। মা গেটের সামনেই বসে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর লালা যমুনাদাস মর্দানে ফিরে গেলেন। তিনি যে কোনো সময় গ্রেপ্তারের আশঙ্কা করছিলেন সুতরাং আমি যখন গ্রামের বাড়ীতে আছি তখন মর্দানের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র থাকা তার পক্ষে সঙ্গত ছিল না।

এই অবস্থায় গ্রামের বাড়ীতেও আমার বেশীদিন থাকা বিপজ্জনক। তাই আমি অনন্তরামকে বললাম আমাকে 'আকোরা খাটক' রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে যাতে আমি লাহোরে যাবার ট্রেন ধরতে পারি।

লাহোরে উপস্থিত হলাম পরদিন—১৯৪২-এর তেসরা নভেম্বর। পৌঁছেই আমি তেজ সিং স্বতন্ত্র-র সঙ্গে দেখা করলাম তাঁর বাড়ীতে—তাঁকে অনুরোধ করলাম আমার থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে। তিনি বললেন, তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আমি থাকতে পারি, এতে

অসুবিধের কিছু নেই। পরদিন তাঁর বাড়ীতে উঠে গিয়ে আমি বললাম—আমার কিছু বিশ্রাম দরকার, পরে কথাবার্তায় বসবো, উপজাতীয় অঞ্চলের সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো। তিনি সম্মত হলেন। চিকিৎসার কথায় আমি বললাম, আমার বিশেষ কোনো অসুখ নেই, তবে কাজের চাপে আর বিশ্রামের অভাবে স্বাস্থ্যটা ভেঙ্গে পড়েছে।

৫ই নভেম্বর থেকে আমি স্বতন্ত্র-র সঙ্গে পুরো পাঁচদিন আলোচনায় বসলাম। গতবার লাহোর ছেড়ে যাবার পর যা যা ঘটেছে সব কিছু তাঁর কাছে খুলে বললাম। তিনি আমার দেওয়া বিবরণ শুনলেন। আমাদের জার্মান বন্ধুরা তাদের সামরিক রণনীতির প্রয়োজনে উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে যে প্রস্তুতির দাবীগুলোর কথা বলেছিলেন সেসব কথাও মন দিয়ে শুনলেন। এই সব প্রশ্নে গভীর চিন্তার যেমন প্রয়োজন, অঞ্চলগুলি সম্পর্কে তেমনি বিশেষ পরিচয় থাকাও দরকার। সৌভাগ্যবশত উপজাতীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি আমার চেয়ে স্বতন্ত্র-র বেশী ভালো জানা ছিল।

রাজনৈতিক রিপোর্ট এবং 'সামরিক রিপোর্ট তৈরী করার জন্য কিছু তথ্যাদি সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গুরচরণ সিংকে। স্থির হলো, আমি আর স্বতন্ত্র—দুই জনেই বোম্বে যাবো, সেখানে পার্টি-নেতাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই তুলে ধরবো। আগেই বলা হয়েছে, নেতৃবর্গ আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে ভারতের জন্য যে দলীয় কর্মনীতি তা উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে, বিশেষত আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিকটবর্তী স্থানগুলোতে যান্ত্রিকভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। একটি মাত্র শ্লোগান ওখানকার সাধারণ মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে পারে—যাতে মিলিত সংগ্রামের কথা থাকবে, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জনবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওদের স্বার্থরক্ষার আশ্বাসের সুর ধ্বনিত হবে।

আমি ১৯৪২-এর ১৬ই নভেম্বর বোম্বে রওনা হলাম—স্বতন্ত্র রওনা হলেন পরদিন। বোম্বে পৌঁছে আমি ডি. পি. সিন্‌হা-র

সঙ্গে দেখা করলাম; তাকে বললাম, অধিকারীকে আমার আসার কথা জানাতে আর স্বতন্ত্র এলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

ডি. পি. সিন্‌হা আমাকে দেখতে এলেন ১৮ই নভেম্বর বিকেলে; তাঁর মুখেই শুনলাম স্বতন্ত্র এসে গেছেন। তিনি আমাকে পাঁচটার সময় আলোচনা সভায় নিয়ে যাবেন বলে জানালেন। আমরা তিনজন আলোচনায় বসলাম এবং আমি অধিকারীর কাছে সমগ্র পরিস্থিতিটা ব্যক্ত করলাম।

এযাবৎ আমি স্বতন্ত্র-র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলাম; এ কাজের ধারা নির্দিষ্ট হতো উপজাতীয় অঞ্চলের চাহিদা অনুযায়ী। এখন অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে। আমি নিজেই নিশ্চিত নই দূতাবাস মারফৎ যে নির্দেশগুলো পাওয়া যাচ্ছে তা সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে পাচ্ছি, না জার্মানীর সমর-দপ্তর থেকে? আর, এই কারণেই আমরা উভয়েই পার্টি-কেন্দ্রের সঙ্গে প্রায়শই আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করতাম। তাই যদি হয় তবে এই যুদ্ধের রণনীতির পেছনে জার্মানীর আসল অভিপ্রায় কি? সে-সম্পর্কে আমাকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ব্যাপাবটা বিচার-বিবেচনা করেও দেখতে হবে। ভারত সম্পর্কে তারা কি করতে চায়, সেটা খুঁজে বের করাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পরের দিন আমরা আবার বসলাম এবং উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করলাম। ওখানকার কাজকর্মকে অধিকারী তারিফও করলেন। আমাদের আলোচনা সভায় অধিকারী বললেন—খুবই সাবধানে থাকা দরকার; ঐ অঞ্চল আসলে কারুরই নয় আবার সকলেরই, অর্থাৎ সকলেই সেখানে যেতে পারে—বিপ্লবী ও ব্রিটিশের দালাল—একই সঙ্গে! পদে পদে জীবনের আশঙ্কাও রয়েছে। শেষ পর্যন্ত অধিকারী বললেন—কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে, কেননা নেতৃবর্গ আমার অভিমত মেনে নিয়েছেন।

বোম্বের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর আমরা দুজনেই ২৩শে নভেম্বর লাহোর যাত্রা করলাম—কিন্তু পৃথকভাবে।

এরই মধ্যে যে খসড়া রিপোর্ট তৈরী হয়েছিল তা গভীরভাবে আলোচনা করার পর ঠিক হলো, আমি প্রথম উপজাতীয় অঞ্চলে যাবো—সেখান থেকে যাবো কাবুলে। তাই ব্যবস্থা হলো যে, সরলা মর্দানে চলে যাবে, আমার যাওয়ার কথা আমার লোকজনদের জানাবে—আর অনন্তরাম ও ওয়ারিস খানকে উপস্থিত থাকতে বলবে আকোরা খাটক স্টেশনে সন্ধ্যায়, বোরখা ও প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ নিয়ে।

সরলা মর্দানে চলে গেল ৩রা ডিসেম্বর, ও জানিয়ে আসবে আমি সেখানে যাচ্ছি ৮ই ডিসেম্বর। ৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সরলা ফিরে এসে জানালো—'লাইন ক্লিয়ার', আমি যেতে পারি।

ট্রেনে লাহোর ছেড়ে এলাম ভোরে—আকোরা খাটক স্টেশনে হাজির হলাম সন্ধ্যায়। আমার সবচেয়ে ছোট ভাই হরবন্সলাল স্টেশনের বাইরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল; অনন্তরাম আর ওয়ারিস খান বড় রাস্তার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করছিল টাঙ্গা নিয়ে।

দ্রুত টাঙ্গায় উঠে পড়লাম—বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম রাত দশটায়। আমার ভাই এবং পরিবারের আরও কয়েকজন লোকও আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ওয়ারিস খান আমাদের বাড়ীতেই রাতটা কাটালো। তাকে মনে করা হতো আমাদের পরিবারেরই একজন। পরদিন আমি ওকে পাঠিয়ে দিলাম খুশল খান খাটক আর মীর গজন খান্—এ দু'জনকে নিয়ে আসতে।

তারা এলে আমি তাঁদের কাছে বর্তমান পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বললাম—এখন আমাদের কর্তব্য কি তা নিয়েও আলোচনা করলাম। আমার বক্তব্য ছিল—এই পরিস্থিতিতে আমাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্য যেটুকু করা দরকার, শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত হানবার জন্য যে কর্মিদল গঠন করা দরকার, তা খুব দ্রুত এবং সতর্কভাবে শেষ করে ফেলতে হবে—সম্ভব হলে এক বছরের মধ্যেই।

খুশল খানকে নিভৃতে ডেকে বললাম—তাকে স্বতন্ত্র-র সঙ্গে

যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। আলোচনা চলাকালে সে আমাকে বললো, ভারত এবং উপজাতীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা এক রকমের নয়। আমি বললাম, আমিও অনুরূপ মত পোষণ করি। এ ব্যাপারে পার্টি-নেতৃত্বের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়েছে। আমরা এখন যেভাবে কাজ করে যাচ্ছি সেভাবেই তা করে যাবো—পার্টি-নেতাদেরও তাই মত। কথাটা শুনে সে খুশি হলো। এটা না হলে তার আশঙ্কা ছিল—জনগণ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। তাঁকে বললাম, কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার ভার নেবে সানোবর হুসেন।

এরপর ওবা চলে গেল।

সরলা মর্দানে পৌঁছালো ১৪ই ডিসেম্বর—আমাদের গ্রামে এলো তার পর দিন। যে কাগজপত্রের জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেগুলি সে সঙ্গে এনেছে। আমি ওগুলি দিয়ে দেখলাম রিপোর্ট যেভাবে লেখা হয়েছে তা খুবই সন্তোষজনক।

কাজের সম্পর্কে আর এই যাতায়াতের মধ্য দিয়ে সরলা ও আমার মা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন—তার সাহস আর নিষ্ঠা দেখে আমার মা খুব তারিফও করতেন।

পরদিন অনন্তরাম তার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিল। তাকে দিয়ে আমি স্বতন্ত্রকে একটা সংবাদ পাঠালাম যে, আমি মোহম্মদ উমর খানের আসার জন্য অপেক্ষা করে আছি।

এরই মধ্যে অনন্তরাম আবদুল হাকিমকে জানিয়ে রেখেছিল, সে যেন আমার সঙ্গে উপজাতীয় অঞ্চলে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে। আবদুল হাকিম আমাদের গ্রামের কাছেই থাকে—সে গোলাম উল্‌রেহ্‌মানের ভাই।

২০শে ডিসেম্বর এলো উমর খান—আমার ভাই কিশোরীলালকে সে বললে সওয়াল কিল্লাতে ২৭শে ডিসেম্বর সভা ডাকা হয়েছে। কাজেই ঐ তারিখের আগেই আমাকে সওয়াল কিল্লাতে পৌঁছুতে হবে।

যথাসময়ে রওনা হলাম—আমার সঙ্গে অনন্তরাম, ওয়ারিস খান আর আবদুল হাকিম। মধ্য রাত্রিতে টাঙ্গাতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। অক্ষকোট যখন ছাড়িয়ে গেলাম তখন ভোর হয়েছে। আমরা টাঙ্গাটা ছেড়ে দিলাম—ঐ টাঙ্গাতেই ফিরে গেল অনন্তরাম আর ওয়ারিস খান। থানার দিকে একটা ট্রাক যাচ্ছিল, আমি আর আবদুল হাকিম উঠে পড়লাম সেই ট্রাকে। একটা সুবিধামতো জায়গায় এসে সেই ট্রাক থেকেও আমরা নেমে পড়লাম।

এবার পায়ে হেঁটে যাত্রা।

২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমরা পৌঁছুলাম সওয়াল কিল্লা। সানোবরকে বলে রেখেছিলাম ভারত ত্যাগের আগেই উপজাতীয় অঞ্চলের অবস্থা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরী করে রাখতে। সানোবর রিপোর্ট দেখালো—রীতিমতো উৎসাহজনক। তাকে বললাম, মিরন জানকে সে যেন অবশ্যই রিপোর্টটা দেখায়।

বারো

পরবর্তী পর্যায় [১৯৪৩-৪৫]

আমি আর গোলাম মূর্তজা কাবুল যাত্রা করেছিলাম ১৯৪২-এর ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩-এর ৪ঠা জানুয়ারী পৌঁছেছিলাম জালালাবাদে।

আমরা চেয়েছিলাম সমস্ত ঘটনা হাজি সাহেবকে জানাতে। তাই, আমি একাই গেলাম লালমন গ্রামে। তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। আমাদের সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি সমর্থন জানিয়ে বললেন, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিকটস্থ উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে তিনি যথাসাধ্য কাজ করে যাবেন। দেখলাম, তিনি অত্যন্ত উৎসাহী। সেইদিন সন্ধ্যাতেই আমি জালালাবাদে চলে এলাম। জালালাবাদ থেকে কাবুলে পৌঁছুলাম ১৯৪৩-এর ৮ই জানুয়ারী।

কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম—গোলাম মূর্তজা আগেই কাবুলে চলে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল, আয়ুব (জিন্না) নতুন মানুষ, সে একাকী নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় বিরক্তি বোধ করতে পারে। সানোবর হুসেনও নাকি তাকে কাবুলে চলে যেতে বলেছিল। কাবুলে এসে গোলাম মূর্তজা দেখলো তার অনুমান যথার্থ। তখন আয়ুবকে নিয়ে গোলাম মূর্তজা গেল মিঃ রাসমাসের সঙ্গে দেখা করতে। মিঃ রাসমাস তাদের আপাতত কাবুল ছেড়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন; সেই পরামর্শ অনুযায়ী তারা দুজনেই ফিরে এসেছিল ২৫শে ডিসেম্বর।

আমাদের সভা বসেছিল ২৭শে ডিসেম্বর; সেই সভায় আমি ছাড়া আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন—মিরন জান, সানোবর হুসেন, গোলাম মূর্তজা, রাইফেল প্রস্তুতকারী প্রয়াত আবদুল রেজ্জাক

আর আবদুল লতিফ আফন্দি। এরা সবাই উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে যেসব ব্যবস্থা নিতে হবে তাই নিয়ে আলোচনা করেছিলেন—এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব নিয়েও কথা হয়েছিল। নিরাপদে বিমান অবতরণের ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনেক আলোচনা হয়েছিল—বিমানে যেসব জার্মান আসবেন কিংবা যেসব ভারতীয় আসতে পারেন তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার কথাও বাদ যায় নি।

যারা সভায় এসেছিলেন তারা আমাদের প্ল্যানের কথা শুনে বেশ খুশি ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন এই ভেবে যে, এইবার তারা তাদের চিরদিনের শত্রু উৎপীড়ক ব্রিটিশদের আঘাত হানবার সুযোগ পাবেন। সভার পরে ১৯৪২-এর ২৯শে ডিসেম্বর আমরা যে যার মতো চলে গেলাম।

যখন আয়ুব আর গোলাম মূর্তজা হঠাৎ কাবুল ছেড়ে চলে গেল তখন পরবর্তীকালে আমরা কাবুলে গেলে আমাদের জার্মান বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনেব জন্য কোনো ব্যবস্থাই তারা করে যায় নি। তারা নিশ্চয়ই আমাকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই আশা করছিল, আমাদের ফিরে আসার জন্যও প্রতীক্ষা করছিল।

১২ই জানুয়ারী রাত প্রায় আটটায় আমরা খাবার তৈরী করছিলাম এমন সময় দরজায় শব্দ হলো।

মূর্তজা দরজা খুলে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ উইৎজল। দেখে যেমন বিস্মিত হলাম, খুশিও হলাম তেমনি। মূর্তজাকে খাবার তৈরী করতে বলে আমি মিঃ উইৎজলের সঙ্গে আলোচনায় বসলাম।

মিঃ উইৎজল বললেন, হঠাৎ আয়ুব ও মূর্তজা চলে যাবার ফলে যোগাযোগ-সূত্র ছিন্ন হওয়ায় তারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তারা আশা করেছিলেন, আমি জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কাবুলে ফিরে আসবো, তাই তিনি প্রতিদিন এই পথ দিয়ে যেতেন আমাদের কুঠরির দরজা খোলা আছে কিনা তাই দেখার জন্য; আজ আমাদের জানলা খোলা আছে দেখেই ঢুকে পড়েছেন।

আমি তাকে তিনটি রিপোর্টই দিলাম। পরবর্তী আলোচনার দিন

ঠিক হলো ১৮ই জানুয়ারী। তাদের বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন, কেন না রিপোর্টগুলি পড়তে হবে, বার্লিনে পাঠাতে হবে আর তাদের নির্দেশও আনতে হবে।

১৮ই জানুয়ারী ওদের কাছে যেতেই প্রথমে ওরা যে কথাটি বললেন— তা হলো এই যে, আমাকে ওদের সঙ্গে সপ্তাহ খানেক কিংবা তারও বেশী সময় থাকতে হবে। আমি রাজী হয়ে গেলাম।

যখন আমি মিঃ রাসমাসের সঙ্গে দেখা করলাম তখন তিনি আমাকে বললেন, আমার দেওয়া রাজনৈতিক রিপোর্টটা তিনি খুব মন দিয়ে পড়েছেন। তাদের নিজস্ব পথে যেসব ভারতীয় সংবাদপত্রের রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে—সেগুলিও পড়ে দেখেছেন; এখন অবশ্য আমাদের তৈরী ব্যবস্থার মাধ্যমেই সেইসব সংবাদ পাচ্ছেন। তিনি বললেন, আমাদের রিপোর্ট এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে তারা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ছবি পেয়েছেন। তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন একটা শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন এবং মনে হচ্ছে এটি জাতীয় জীবনে স্থিতিলাভ করতে চলেছে। তাদের অভিমত, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় বার্মার দিক থেকে জাপানীদের এক প্রচণ্ড সামরিক আঘাত প্রয়োজন—অবশ্য সেই সময়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনটিকেও এমন সুদৃঢ় করে তুলতে হবে যাতে বিরাট ইঙ্গ-মার্কিন সশস্ত্র বাহিনী একটা সঙ্কটের আবর্তের মধ্যে পড়ে যায়। তিনি বললেন, 'আমরা বার্লিনকে সেইভাবেই জানাতে যাচ্ছি।'

মিঃ উইৎজল এলেন আবার সন্ধ্যায়। তিনি বললেন—অন্য রিপোর্টগুলোও তিনি দেখেছেন। আমাদের কাজের সামগ্রিক অগ্রগতিতে তিনি খুশি হয়েছেন। তিনি জানতে চাইলেন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থাগুলো কিভাবে কাজ করে।

আমি তাকে বললাম—ভারতে রাজনৈতিক সংস্থার সংখ্যা অনেক। কোনো কোনো সংস্থা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মতোই

শুধুমাত্র প্রকাশ্য গণসংগ্রামের উপর বিশ্বাস করে। এছাড়া কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি আছে—এই পার্টি প্রকাশ্য ও গোপন—উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। ফরোয়ার্ড ব্লকও উভয় পন্থায় বিশ্বাসী। বি. ভি. দল আছে, তারা কাজ করেন গুপ্ত পথে। অবশ্য কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শের দ্বারা ও ফ্যাসি-বিরোধী নীতির ভিত্তিতে। মুসলিম লীগ হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্রিটিশ সমর্থক দল—এরা ব্রিটিশের সমরনীতিকে সমর্থন করে। মুসলিমরাই ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এর পর আকালি দল আছে, একে শিখ সম্প্রদায়ের একটি ধর্মীয় দল বলে মনে করা হয়—এরাই ভারতের গুরুদ্বারগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সমর্থক। সমর বাহিনীর অধিকাংশ ভারতীয়ই শিখ—এরা ব্রিটিশের স্বার্থে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। অবশ্য এসব ছাড়া প্রাদেশিক ভিত্তিতে এমন কি স্থানীয় ভিত্তিতেও, গড়ে ওঠা কতকগুলো ছোট ছোট রাজনৈতিক দল আছে। এরা কেউ ব্রিটিশের সমর্থক, কেউ-বা বিরোধী। এই কারণেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার একটা পুরো ছবি আঁকা খুবই কঠিন। এমন কি সুভাষচন্দ্র বসু নিজেও দেশের বামপন্থী শক্তিগুলোকে একত্র করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেন নি—যদিও দুবার তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার সুভাষচন্দ্র সভাপতি-পদ পেয়েছিলেন কংগ্রেসের ভিতরকার বামপন্থী শক্তিগুলির সমর্থনের ফলে।

মিঃ উইৎজল বললেন—ভারতের অধিকাংশ আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে গণ-মিছিল। তারা থানা, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, ট্রাক ও সেতু আক্রমণ করে, কিন্তু আক্রমণের আগেই শত্রু তা জানতে পেরে পর্যাপ্তভাবে শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। তারপর যখন সংঘর্ষ বাধে, জনতার পক্ষেই হতাহত হয় বেশী। ফলে, তাদের দুঃখই বাড়ে, লাভ তেমন কিছু হয় না। তাই এসব আন্দোলন খুবই গোপনে পরিকল্পিত হওয়া দরকার—আর এই আন্দোলন পরিচালনা করবেন বিশেষ ধরনের কাজে দক্ষ বিশেষভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ।

আমি তাকে বললাম—এসব প্রকাশ্য ও গোপন আন্দোলনের সব কথাই আমরা জানি। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক কর্মধারায় জনগণ অংশ গ্রহণ করুক—এই রকম একটা ঐতিহ্য ভারতে গড়ে উঠেছে এবং সেই অংশ গ্রহণও হবে অহিংসার পথে। অবশ্য অন্য পথ, অর্থাৎ হিংসার পথও তারা সুবিধে মতো প্রয়োগ করেছে—এরকমও দেখা গেছে। আমাদের দেশ বিশাল—বিপুল তার লোক সংখ্যা, তারাও আবার অত্যন্ত দরিদ্র। কিন্তু গণজাগরণের ভিত্তিতে এই যে সংগ্রাম-কৌশল—শত্রু নিষ্ঠুর ও শক্তিমান হলেও এটা তার বিরুদ্ধে এ-পর্যন্ত সম্পূর্ণ কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। প্রথম থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকাল পর্যন্ত আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস প্রমাণিত করেছে যে আমাদের দেশে যেমন পরিবেশ বিদ্যমান তাতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ যথোপযুক্ত।

পুরো তিন দিন আমাদের এই আলোচনা চললো—অর্থাৎ ১৯৪৩-এর ২২শে জানুয়ারী পর্যন্ত। ২৪শে জানুয়ারী মিঃ রাসমাস আমার কাছে এসে বললেন—ভারতের খাদ্য-পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ছে, খুব শীগ্‌গিরই একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। এই পরিস্থিতিকে আমরা অবশ্যই কাজে লাগাতে পারি। এর সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চলতে পারে, জনসাধরণকে উত্তেজিত করে দাঙ্গা বাধিয়ে খাদ্যের দোকান কিংবা সরকারি ও সামরিক গুদামগুলি লুঠ করা যায়।

আমি বললাম—দেশের খাদ্য-পরিস্থিতি যে অবনতির পথে যাচ্ছে এ বিষয়ে আমি একমত; বাঙলাদেশ যে এক চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে চলেছে সেই আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। কিন্তু এর ফলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা সৃষ্টি হবে তাকে আমরা রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে প্রয়োগ করতে না-ও পারি। কারণ ক্ষুধার্ত মানুষের প্রথম সমস্যা খাদ্য—এবং শুধুই খাদ্য। এই অবস্থায় তাদের দোকান লুঠ করতে, সরকারি গুদাম আক্রমণ করতে নিয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু তারা সেইখানেই থেমে যাবে, এমন আশঙ্কাই বেশী। তারা কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যেতে

পারবে না। এমন আশঙ্কাও রয়েছে যে, এর ফলে জনগণ নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলবে, আশাহীন ও উদ্যমহীন হয়ে পড়বে। ফলে দেশের সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে ভাঙন দেখা দিতে পারে।

গভীর ধৈর্যের সঙ্গেই মিঃ রাসমাস আমার কথা শুনলেন—এ বিষয়ে তিনি একমত হলেন যে ঐ জাতীয় ঘটনার ফলাফল শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী শক্তির পক্ষে অশুভ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু খাদ্যের অভাব তো ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক বাহিনীরও প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াতে পারে! তিনি বললেন—'সুতরাং এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতেই হবে। যুদ্ধ বাধলে যে নীতি এখানেও সেই নীতি, অর্থাৎ শত্রুর প্রত্যেকটি দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া দরকার।'

পরে মিঃ উইৎজল আমার কাছে অস্ত্র সংগ্রহের সমস্যার কথা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম—আমাদের অধিকাংশ বন্ধুর কাছে '৩০৩ বোর রাইফেল আছে; কিন্তু গুলি-বারুদ প্রভৃতির বড়ই অভাব। আমাদের তা কিনতে হচ্ছে অত্যন্ত চড়া দামে। তিনি জানতে চেয়েছিলেন—কত অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। আমি তাকে বলেছিলাম—সঠিক সংখ্যা আমি বলতে পারবো না—তবে প্রায় পনের'শ রাইফেল আর শট্‌গান আছে। এইটুকুই আমাদের সকলের সংগৃহীত সাধারণ ভাণ্ডার। আমাদের সমর্থকদের কাছেও অবশ্য পনের'শর বেশী রাইফেল আছে, তবে সেগুলো আছে তাদেরই হেপাজতে। এ ছাড়া আমাদের নানা ধরনের কিছু পিস্তল ও রিভলবারও আছে।

১৯৪৩-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী আবার মিঃ উইৎজলের সঙ্গে আমি দেখা করলাম। তিনি সেই সময় আমাকে কতকগুলো প্রশ্নসংবলিত একটি কাগজ দিয়ে বললেন—এটি এসেছে সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে, আমাকে ৯ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন : বিদেশ থেকে আমরা যেসব ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি ভারতে তার প্রতিক্রিয়া কিরূপ ?

উত্তর : সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিক্রিয়া ভালো, যদিও এখানে

নানাবিধ স্বার্থের ব্যাপার জড়িয়ে আছে। আপনি নিজেই জানেন, ভারতের জনসাধারণের এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলের মনোভাব জাপ-বিরোধী এবং চীনের অনুকূল; অন্যদিকে, তারা আবার রাশিয়ার পক্ষে এবং ব্রিটিশ-বিরোধী। সুতরাং আপনাদের প্রচার-ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ইঙ্গ-মার্কিনের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন। আপনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন—কংগ্রেস সর্বদাই জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনকে সমর্থন করে গিয়েছে। তাই বর্তমান অবস্থায় বিদেশ থেকে চীনের বিরুদ্ধে যদি আপনি প্রচার চালিয়ে যান তবে বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবী মহলে আপনার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে।

প্রশ্ন: আজাদ হিন্দ-এর বেতার প্রচার ভারত কিভাবে নিয়েছে। প্রচারের এই পদ্ধতি কি তুমি পছন্দ কর?

উত্তর: ভারত ভালোভাবেই নিয়েছে এবং এই নীতিটা ভালো, তবে চীন-বিরোধী ভাবটা কমিয়ে আনা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আমাদের ছাত্র-আন্দোলনের অবস্থা কি? যেসব কর্মী ছাত্রফ্রণ্টে কাজ করছে ছাত্রদের মধ্যে তাদের কাজ দ্বিগুণ করতে বলুন।

উত্তর: ছাত্র-আন্দোলনের অবস্থা সন্তোষজনক। বর্তমান সংগ্রামে তারা এক আদর্শ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি আগেই জানেন, ছাত্র-আন্দোলন দ্বিধাবিভক্ত এবং এর একটা প্রভাব আন্দোলনের উপরে থাকবেই।

প্রশ্ন: জে. পি. জেল থেকে বেরিয়ে এলেন কিভাবে? অন্য কে কে তাঁর সঙ্গে পালাতে পেরেছে? তিনি এখন কি করছেন এবং আমার কাজ সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি?

উত্তর: ঠিক এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না; আমার ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে।

প্রশ্ন: ফজলুল হক্ কেমন আছেন? তাঁর মনোভাব কি?

উত্তর: মনে হচ্ছে ফজলুল হকের মনোভাব ভালোই। তবে কতটা তিনি কাজে লাগবেন—এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।

প্রশ্ন : ভারতীয় মুদ্রা সম্পর্কে ভারতীয়দের আস্থা কতখানি আছে ?

উত্তর : এখন মুদ্রাস্ফীতি চলছে—তার সঙ্গে জিনিসপত্রের চড়াদাম আর ভোগ্য দ্রব্যেরও অভাব। এই অবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণ স্বভাবতই বিচলিত কিন্তু ভারতীয় মুদ্রা সম্পর্কে তারা আস্থা হারায় নি।

প্রশ্ন : ভারতে খাদ্য-পরিস্থিতি কিরূপ ? সত্যিই যদি খারাপ হয়ে থাকে তবে এই অবস্থায় এলো কিভাবে ?

উত্তর : খাদ্যের অবস্থা সত্যিই অত্যন্ত খারাপ—দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে। এর মূলে আছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জঘন্যতম উদাসীনতা। বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকও সমান দায়ী। শস্য-ব্যবসায়ীদের ভ্রান্তিমূলক বিবরণের উপর তিনি খুব বেশী নির্ভর করছেন। বাঙলা এখন দারুণ দুর্ভিক্ষের কব্জায়।

প্রশ্ন : ভারত, আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং উপজাতীয় অঞ্চলের লোকেরা রুশ-জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে কিরকম ধারণা পোষণ করে ?

উত্তর : রুশ-বিপ্লবের সময় মধ্য-এশিয়ার রুশীয় অঞ্চল থেকে তুর্কমান, উজবেক, তাজিক প্রভৃতি জাতির যেসব লোকেরা আফগানিস্তানে পালিয়ে এসেছিল তাদের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকার কয়েক যুগ ধরে আফগানিস্তানের লোকদের কাছে রুশ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে এসেছে। এখন এরা আর ইচ্ছে করলেও এই মনোভাব ত্যাগ করতে পারে না। উপজাতীয় অঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও কতকটা এই রুশ-বিরোধী প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীদের চেষ্টায় এই রুশ-বিরোধী মনোভাব মুছে গেছে। এরা এখন ব্রিটিশ-বিরোধী।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতীয়দের মনোভাব মিশ্রিত, তবে আপনি তো জানেন, সাধারণ লোকের সহানুভূতি সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে।

প্রশ্ন : এটা কি সত্য যে রাশিয়া ভারতের উপজাতীয় মানুষদের মধ্যে

গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে ?

উত্তর : ওদের প্রভাব বেশ গভীরই ছিল—সেই প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছিলেন ভারতীয় এবং উপজাতীয় বিপ্লবীগণ। কিন্তু রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধবার পর রাশিয়া হয়ে গেল ব্রিটিশের মিত্র। তাই ওখানকার যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ছিল সেটা এখন রাশিয়ার দিকেও মোড় নিয়েছে।

প্রশ্ন : উপজাতীয় অঞ্চলের মুজাহিদিনদের কার্যধারার বিবরণ পাঠাও। এটা কি সত্য যে ওরা আর এখন বিপ্লবী নয় ?

উত্তর : মুজাহিদিনরা কিছু কালের জন্য ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ দালালের হাতে মৌলভী বশীর আহ্‌মেদ নিহত হবার পর এদের নেতৃত্বভার চলে গেছে ব্রিটিশ-সমর্থক দলের হাতে।

প্রশ্ন : কাবুলের জার্মান বন্ধুদের সাহায্য করার জন্য সোভিয়েত-বিরোধীদের সঙ্গে কাজ করতে তোমার দ্বিধা কিসের ?

উত্তর : কাবুলের অধিকাংশ সোভিয়েত-বিরোধীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের থেকেই ব্রিটিশের দালাল ছিল—এদের বেশীর ভাগই এসেছে মধ্যএশিয়ার রুশীয় অঞ্চল থেকে (তুর্কমান, উজবেক, তাজিক—এরা আফগানিস্তানে স্থায়িভাবে বসবাস করছে)। রুশ-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তাদের মধ্যে অনেকেই জার্মানদের সংস্পর্শে আসে। আমি এটা জানতে পেরেছিলাম, কিছুটা মিঃ হাজি আবদুল সোভানের কাছ থেকে। তিনি আমার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে এদের সঙ্গে কাজ করা বিপজ্জনক। তারা কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করবে না—না জার্মানদের—না আমাদের। ভারতের মুক্তি-সম্পর্কে এদের কোনো আগ্রহই নেই। এটা শুধু আমার অভিজ্ঞতা নয়, উপজাতীয় অঞ্চলে আমাদের যেসব কমরেড কাজ করছেন, তাদেরও।

প্রশ্ন : বাঙলার বিপ্লবীদলের কাজকর্ম সম্পর্কে আমাকে জানাবে কি ?

উত্তর : আগামীবার ভারত থেকে ঘুরে আসার পর এর উত্তর পাঠাবো।

প্রশ্ন : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন কত-খানি শক্তিশালী ?

উত্তর : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জোর ভালোই বলতে হবে—তবে অন্যান্য বারের আন্দোলনের মতো নয়।

প্রশ্ন : পাঞ্জাবে আন্দোলনটা দুর্বল কেন ?

উত্তর : প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। পাঞ্জাবের কমরেড্‌রা যদি নিজেরাই এই প্রশ্নের জবাব দেন তাহলে ভালো হয়।

প্রশ্ন : সি. পি. আই-এর সংবাদ কি ? এম. এন. রায়ের ভূমিকাই বা কি ?

উত্তর : সি. পি. আই. 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরোধী। তাদের শক্তিকে ছোট করে দেখা সঙ্গত হবে না। ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার ভিত্তির উপরেই তারা দাঁড়িয়ে আছে।

এম. এন. রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।

প্রশ্ন : স্বামী সহজানন্দ এবং ইন্দুলাল যাজ্ঞিক দেশের বাইরে আমার এই কর্মধারা সম্বন্ধে কি মনে করেন ?

উত্তর : আমি ভারতে তাদের বিষয়ে সন্ধান নেব—তারপর আপনাকে জানাবো।

প্রশ্ন : একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট 'পরিকল্পনা প্রস্তুত করো ; তোমাকে এর আগেও এই বিষয়ে নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম।

উত্তর : ইয়োরোপের কমরেডদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে এর আগেই যখন আপনি এক ধরনের সংস্থা গঠন করেছিলেন তখন আমি আপনাকে বলেছিলাম এই প্রসঙ্গটি কিছুকালের জন্য বিলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। তবু যদি আপনি মনে করেন একটা অস্থায়ী সরকার গঠনের উপযুক্ত সময় হয়েছে—তাহলে বলবো ইয়োরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যথেষ্ট যোগ্য দেশপ্রেমিক রয়েছেন—এদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করে আপনি একটি সংস্থা গঠন করতে পারেন। আমি এই প্রশ্নটি নিয়ে

আমার সহকর্মী কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত আপনাকে জানাবো। আমার কথা বলতে পারি, আমি মনে করি এটার সময় এখনও হয় নি। এর কারণ অস্থায়ী সরকার গঠনের ব্যাপারটা আমাদের প্রচার করতে হবে; এই মুহূর্তে সেটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

১৯৪৩-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী আমি নির্দিষ্ট স্থানে মিঃ উইৎজলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু মিঃ উইৎজলের পরিবর্তে মিঃ হ্যান্‌স্ ডো নামে এক ভদ্রলোক এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তাদের প্রশ্নগুলির উত্তর যে কাগজে লিখে এনেছিলাম—তা তার হাতে দিলাম। পড়বার জন্য যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো এনেছিলাম, সেগুলোও দিলাম। আমাদের সাক্ষাৎকারের এই স্থানটি ছিল রুশীয় দূতাবাসের কাছে।

এই স্থানেই ১০ই ফেব্রুয়ারী দেখা হলো মিঃ উইৎজলের সঙ্গে। তিনি টাইপ করা একটি কাগজ খুব দ্রুত আমার হাতে গুঁজে দিলেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, সাধারণ পোশাক-পরা বহু লোক চারধারে ঘোরাফেরা করছে—আমি অবিলম্বে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। বাড়ীতে গিয়ে স্লিপটা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম।

ঐ স্লিপে মিঃ উইৎজল আমাকে প্রশ্ন করছেন—তাদের প্রশ্নের উত্তর সংবলিত কাগজটি আমি হ্যান্‌স্ ডো'র কাছে আগের দিন দিয়েছি কিনা। মিঃ ডো স্বীকার করেছেন, একটি কাগজ তাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাড়ী গিয়ে তিনি আর তা খুঁজে পান নি—পকেটে রাখবার সময় হয়তো তা পড়ে গিয়ে থাকবে। কাগজটা হয়তো পুলিশের হাতে পড়েছে কিংবা হয়তো কোনো রুশীয় লোক পথে হাঁটার সময় তা তুলে নিয়েছে। সম্ভবত সেই জন্যই যখন মিঃ উইৎজল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন শাদা পোশাকপরা অতো পুলিশের লোক সেখানে হাজির হয়েছিল।

১৯৪৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী সেই একই স্থানে মিঃ উইৎজলের সঙ্গে আবার দেখা করে একটা চিঠি দিলাম। সেই চিঠিতে আমি

জানিয়েছিলাম—সেদিন মিঃ ডো-র হাতে আমি আমার উত্তর লেখা কাগজটি দিয়েছি—তার অসতর্কতার জন্যই সেটি হারিয়েছে জেনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। চিঠির বিষয়বস্তুর কথা ভাবলে ক্ষতির পরিমাণ খুবই মারাত্মক বলতে হবে। আমি সাক্ষাৎকারের জন্য নতুন একটি স্থান নির্দিষ্ট করতে বললাম।

২০শে মার্চ মিঃ রাসমাস ও মিঃ উইৎজল আমার কাছে এসে একটি কাগজ দিলেন—এতে ছিল বার্লিন থেকে পাঠানো নিম্নলিখিত নির্দেশ:

১. উপজাতীয় অঞ্চলে একটি বিমান অবতরণের জন্য এখন বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অবতরণের জন্য কতখানি জমির দরকার তা জানিয়ে দেবেন মিঃ উইৎজল; অন্যান্য নির্দেশও তিনিই দেবেন।

২. উপজাতীয় অঞ্চলে কুড়িজনের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ব্যবস্থা হবে অর্ধ-ইয়োরোপীয় রীতিতে।

৩. যে নির্দেশ যাবে, তোমাদের লোকজনকে সেগুলো মেনে চলতে হবে।

৪. ভারতে বা উপজাতীয় অঞ্চলে তোমাদের তরফ থেকে যেন কোনো গোলযোগ সৃষ্টি না হয়।

৫. তোমাদের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় আমরা খুশি—কিন্তু খুব দ্রুত এই কাজ শেষ করতে হবে।

৬. এই জাতীয় সংগ্রামে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ বা মিথ্যা গুজব প্রচারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারেও তোমরা দয়া করে প্রস্তুত থাকো।

৭. (ক) বার্লিনের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। (খ) তোমাদের আগের প্রস্তাবানুযায়ী ভারতের পথে বেতারে কিংবা অন্যান্য উপায়ে ইপ্‌পির ফকিরের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা চাই। (গ) ইপ্‌পির ফকির এবং সওয়াল কিল্লার সঙ্গে বেতার সংযোগ যৌথ কার্যসূচীর জন্যই প্রয়োজন।

৮. ভারত থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইরানের সুড়ঙ্গ পথে যে

সরবরাহ যাচ্ছে—ইরানের সেই সুড়ঙ্গ পথগুলি ধ্বংস করার ব্যাপারে তোমরা কি ধরনের সাহায্য করতে পারো ?

৯. শত্রুপক্ষ থেকে যেসব আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার পূর্ণ বিবরণ দাও—এছাড়া জমি, বায়ু এবং যান্ত্রিক বাহিনী সম্পর্কেও তথ্য পাঠাও।

১০. ভারতীয় সেনাবাহিনীর এবং ভারতীয় জনসাধারণের মনোবল কিরূপ ? এই সম্পর্কে সংবাদ পাঠাও।

১১. বিদেশ থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে কিভাবে প্রচার কার্য চালানো যায় সেই সম্পর্কে প্রস্তাব পাঠাও।

১২. (ক) কম্যুনিস্টদের শক্তি ও তাদের কর্মপদ্ধতির তথ্য-বিবরণ চাই। (খ) ভারতে এবং উপজাতীয় অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব কিরূপ, সে সম্পর্কেও জানাও।

১৩. আমাদের লোকজন যাতে কাবুল থেকে উপজাতীয় অঞ্চলে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. আমাদের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার চলছে সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়েই জাপানীদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

১৫. গণঅভ্যুত্থানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করো।

১৬. আমাদের লোক ডুবো জাহাজে করে ভারতভূমিতে পদার্পণ করবে ; এই অবতরণের প্ল্যান তৈরী করতে হবে মিঃ উইংজলের সঙ্গে আলোচনা করে। অবতরণের কয়েকদিন আগে আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে অবতরণের দিন সাঙ্কেতিক ভাষায় তোমার কাছে পাঠানো হবে। কোথায় তুমি তাদের অভ্যর্থনা জানাবে সেই অবতরণের স্থানটিও তোমাকে জানানো হবে।

১৭. উপজাতীয় অঞ্চল সম্পর্কে যতকিছু প্রকল্প ও পরিকল্পনা তা সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখতে হবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য এমনভাবে সময়-বাঁধা থাকবে যে, অন্য যেসব উপজাতীয় কেন্দ্রের সঙ্গে বেতার সংযোগ রয়েছে তারা সঙ্কেত পাওয়া মাত্র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এই সময়ে তারা আমাকে একটি খুব বড় মানচিত্র দিলেন—আমার ধারণা, ওতে ছিল বার্লিন থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত একটা রেখাচিত্র, এমনকি ভারতের কোনো কোনো অংশও এতে দেখানো হয়েছিল। আকাশ-পথে আলোকচিত্র নিয়ে এই ম্যাপে রুশীয়, ইরানীয়, আফগান এবং উপজাতীয় অঞ্চলগুলো অঙ্কন করা হয়েছিল—ইয়োরোপীয় অংশগুলো যথারীতি সমীক্ষা করে ম্যাপে বসানো ছিল। রাশিয়ার শুধু দক্ষিণ অংশটুকু ম্যাপে দেখানো হয়েছিল। ম্যাপটি ছিল কয়েক টুকরোয় জোড়াতালি দেওয়া।*

ম্যাপটি পর্যবেক্ষণ করার পর আমার কাছে এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, জার্মানীর সেনানীমণ্ডলীর আসল উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার দক্ষিণাংশ বিধ্বস্ত করে উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে একেবারে ভারতের সীমান্তে চলে আসা এবং তারপর খুব সম্ভব আমাদের সাহায্য নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করা। কিন্তু যদি তারা আদৌ ভারত-সীমান্তে এসে পৌঁছুতে পারে, তবে ওরা কি ভারতীয়দের কাছে বন্ধু ও মুক্তিদাতারূপে আসবে, না আসবে ভারতের আক্রমণকারী রূপে? তাদের সঙ্গে আমার কাজকারবার এবং জার্মান হিসেবে তাদের আচরণের অতীত অভিজ্ঞতাগুলির কথা যখন আমার মনে আনতে চেষ্টা করলাম তখন এই প্রশ্নের উত্তরও আমার কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তাদের লক্ষ্য মাত্র **একটিই** হতে পারে আর তা হলো **ভারত আক্রমণ করে তা অধিকার করা।**

ওদের নির্দেশগুলি বেশ যত্নের সঙ্গেই আমি পড়ে দেখলাম। নির্দেশগুলি সহজ-সরল চরিত্রের ছিল না। এই নির্দেশগুলোর বাস্তব রূপায়ণ তো বটেই—এদের সম্ভাব্যতার প্রশ্নটি সম্পর্কেও যেসব কমরেড উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং পাঞ্জাবে ছিলেন তাদের সঙ্গে আলোচনার আগে আমার পক্ষে কোনো উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল। তাছাড়া, বেতার ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিচালনার মতো প্রযৌক্তিক কাজের জন্য এই বিদ্যায় বিশেষভাবে শিক্ষিত ও

---

* *Battle for the Caucasus* by Andrei Grechko, Progress Publishers, 1971, Pp. 25-26 দ্রষ্টব্য।

নির্ভরযোগ্য কর্মচারী নির্বাচন করতে হলে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনার দরকার—তাতেও তো সময়ের প্রয়োজন। তেমনি ডুবো জাহাজে করে লোক আনবার ব্যাপারটা অনুমোদন করার আগে অত্যন্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা ছকে নেওয়া দরকার, কেননা যারা নামবেন তারা ছাড়াও নাবিকদেরও মূল্যবান জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটাও প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই ধরনের কাজ যদি সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি ছাড়াই করা হয় তবে অনিবার্য পরিণতি হবে চরম ব্যর্থতা—ঠিক যেমন ঘটনা ঘটেছিল জাপানী ডুবো জাহাজে করে কতকগুলো লোককে নামানোর সময়। এইসব দেশপ্রেমিকদের গ্রেপ্তার করা হলো, নিপীড়ন করা হলো—শেষে গুলি করে হত্যাও করা হলো। এইসব দেশভক্তদের চরম আত্মত্যাগের কোনো সুফল ফললো না। প্যারাস্যুটের সাহায্যেই হোক বা ডুবো জাহাজেই হোক, জাপানীরা যতবার লোক নামাবার চেষ্টা করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরিণতিই ঘটেছে। এর কারণ খুবই স্পষ্ট। জাপান ও জার্মান—এই দুই অক্ষশক্তির মধ্যে কোনো উপযুক্ত সমন্বয়ের ব্যবস্থা ছিল না।

আমাদের জার্মান-বন্ধুরা যদি তাঁদের জাপানী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত, আমরা কখনই এই জাতীয় ঘটনা ঘটতে দিতাম না। আমরা জাপানী বন্ধুদের বলতাম—'যতদিন নিরাপদ অবতরণের ব্যবস্থা সবদিক থেকে সম্পূর্ণ না হয় ততদিন এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখো।' প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরণ করতে আমরা কখনই বলতাম না—যে স্থানে অবতরণ করা হবে সেখানকার পরিবেশের উপযুক্ত পর্যালোচনা না করে কিংবা কাছাকাছি যে-সব ভারতীয় বিপ্লবী রয়েছেন তাঁদের সাহায্য গ্রহণ না করে এই পরামর্শ দেওয়া হতো না। এই ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা কঠিন হতো না যদি আমাদের জার্মান বন্ধুরা জাপানীদের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করাতেন।

মিঃ রাসমাস এবং মিঃ উইৎজল সন্ধ্যায় আমার কাছে এলেন—যে সব নির্দেশ তারা দিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে আলোচনার জন্য। আমি বললাম, তাদের সব নির্দেশের সঙ্গেই আমি একমত, কেবল মাত্র

আট সংখ্যক আর পনেরো সংখ্যক নির্দেশ দুটি ছাড়া। এই বিষয় সম্পর্কে আমি বললাম ঃ

৮. বিদেশে আন্তর্ঘাতমূলক কাজের পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। আমার মনে হয় না, ইরানে আমাদের এমন কোনো যোগাযোগব্যবস্থা আছে যেখান থেকে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। উপজাতীয় অঞ্চলে এবং ভারতে আমাদের যেসব কমরেড রয়েছেন তাদের সঙ্গেও আলোচনা প্রয়োজন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোকদের মাধ্যমেও হয়তো কোনো সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

১৫. বিষয়টির স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'অভ্যুত্থানের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরী করা প্রয়োজন'—এ কথার তাৎপর্য কি? আরও একটু বিশদ বিশ্লেষণ চাই, কিন্তু তার আগে আমি যেভাবে সমস্যাটি বুঝেছি তার কথা বলি।

আপনাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনাদের কিছু লোক কাবুল থেকে উপজাতীয় অঞ্চলে যাবে অথবা কিছু লোক বার্লিন থেকে এসে সেখানে নামতে পারে। এটা সম্ভবত জার্মান সেনাবাহিনীর ভারতের সীমান্তে আসবার সহজ পথ তৈরী করে দেবারই একটা প্রস্তুতি; আর সেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে সেই অঞ্চলে অবস্থিত আমাদের সংগঠনের সাহায্যে। আপনারা নিশ্চয়ই অক্ষশক্তির অংশীদার জাপানকেও পরামর্শ দেবেন বার্মা-সীমান্তের দিক থেকে এগিয়ে এসে একটা চাপ সৃষ্টি করতে। এই সূত্রেই আপনারা চান আমরা এমন একটা সংঘর্ষ করার জন্য প্রস্তুত হই যার পরিণামে আপনারা দুই পক্ষই আপনাদের সামরিক লক্ষ্যে খুব সহজেই পৌঁছুতে পারবেন। তার অর্থ এই, আপনারা আশা করছেন, আমরা অন্তর্ঘাতমূলক কাজে প্রবৃত্ত হই এবং সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলি, যার ফলে সীমান্তে আপনাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঠানো আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

আপনাদের এবং জাপানেরও সম্পূর্ণ আধুনিক সমরোপকরণ রয়েছে। শিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী আপনাদের সম্পদ। সমরাস্ত্রও

আঁপনাদের অপরিমিত। অথচ আমরা নিরস্ত্র জনসাধারণ—আমাদের নির্ভর করতে হবে গণসংগ্রামের উপর—এর সঙ্গে বড় জোর কিছু গোপন অস্ত্রের ব্যবহার যুক্ত হতে পারে। এই জাতীয় জনতার অভ্যুত্থানকে উত্তুঙ্গে তুলতে হলে সময়ের প্রয়োজন হয়। এখন, আপনাদের দিক থেকে আক্রমণের কোনো নির্দিষ্ট সময় স্থির করা হয় নি—স্পষ্টই বোঝা যায়, এই আক্রমণ অনেক কিছু ঘটনার উপর নির্ভর করছে।

তাই প্রশ্ন—এই দুটি অভিযানকে মেলাবেন কি করে? এমনও হতে পারে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হবার আগেই আপনারা প্রস্তুতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন—সেইক্ষেত্রে আপনাদের তীব্রতম ব্রিটিশ প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে। আবার এমনও হতে পারে যে, আমরা গণ-সংগ্রামের উত্তাল ঢেউ তুললাম কিন্তু সেই সঞ্চারিত শক্তিকে সুপরিকল্পিত যোগাযোগের মাধ্যমে সদ্ব্যবহার করা গেল না—তখন সেই শক্তি ভিন্নমুখী হয়ে পৃথক পৃথক স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে,—তাহলে আমাদের শত্রু সেই সংঘর্ষকে বিধ্বস্ত করতে পারবে, এর ফলে ভারতীয় জনগণের জীবনে নেমে আসবে নৈরাশ্য এবং আশাভঙ্গ-জনিত অবসাদ!

মিঃ উইৎজল আমার সঙ্গে একমত হলেন। তিনি আমাকে একথাও জানালেন, যাতে অতীতের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই জন্যে বার্লিন-কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন আমাকে জাপানীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

২১শে মার্চ মিঃ উইৎজল আমাকে বললেন, কোন উপজাতীয় অঞ্চলে বিমান অবতরণ করতে পারবে তা তারা বার্লিনকে জানিয়ে দিয়েছেন। অবতরণের অনেক আগেই আজাদ হিন্দ রেডিও থেকে এই বিষয়ে সঙ্কেতলিপিতে বার্তা পাঠানো হবে—সেই বার্তা গ্রহণ করার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। রাত্রিতেই বিমানটি আসবে। মাল পরিবহনের জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা প্রস্তুত রাখতে হবে। মালগুলিও হবে বেশ ভারী। এই সঙ্গে যারা নামবেন তাদের জন্যও

ব্যবস্থা চাই। জ্বালানি তৈরী রাখা দরকার, কেননা বিমানটিকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে হবে।

২৫শে মার্চ মিঃ উইৎজলের সঙ্গে আমি আবার দেখা করলাম এবং তারপর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত একদিন পর একদিন। ঐ দিন তিনি মৌখিকভাবে বার্লিনের একটি বার্তা শোনালেন। এই বার্তাতে বলা হয়েছে, জাপানীরা হয়তো আসাম-বার্মা সীমান্তে আক্রমণ শুরু করতে পারে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থেকে আক্রমণ যদি বৃহৎ হয় তবে জাপানীদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে; আর আরাকানে ব্রিটিশদের মতো—আক্রমণটা যদি ছোট আকারের হয় তাহলে আমাদের কিছু করবার দরকার নেই।

আমার কাছে মনে হলো জাপানীদের পদক্ষেপ সম্পর্কে জার্মানদের মনে কিছু অনিশ্চয়তার ভাব রয়েছে।

১৯৪৩-এর ২রা এপ্রিল আমরা কাবুল ছেড়ে জালালাবাদে এলাম ৩রা এপ্রিল। ৪ঠা এপ্রিল আমাদের মালপত্র নিয়ে এলো আবদুল রউফ। ঐ দিনই ওকে আমরা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। ৫ই এপ্রিল খুব ভোরে গরদির দিকে আমরা রওনা হলাম টাঙ্গা করে—সেখানে হাজির হলাম সন্ধ্যায়। আমাদের এক বন্ধুর কাছে মালপত্র গচ্ছিত রাখলাম। ঐ বন্ধুর একটি খচ্চর ছিল। আমরা কুদাখেল-এ (মিরন জানের বাসস্থান) তাকে মালপত্র নিয়ে যেতে বললাম। সেখান থেকে যেতে হবে লালপুরা।

আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলাম সন্ধ্যায়—সেখানে মিরন জান উপস্থিত ছিল। আমাদের কাবুলে অবস্থানের সমস্ত বিবরণই তাকে জানালাম। সব শুনে সে খুশিই হলো কিন্তু জার্মানদের মনোভাবের অনিশ্চয়তা দেখে সে যেন নিরাশ হয়ে পড়লো—এই মনোভাবে 'হাঁ' কি 'না' স্পষ্ট করে কিছুই বুঝা যায় না। আমি তাকে বললাম—ঐ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। মনে হচ্ছে ওদের কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যাই হোক না কেন, শত্রুর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হবে—সেই

কারণেই সংগঠন গড়ে তোলার কাজকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা কর্তব্য।

বার্লিন থেকে যে নির্দেশ পাওয়া গেছে আমাদের কাজ তার ভিত্তিতেই চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি ওদের সঙ্গে একটা বেতার-সংযোগও স্থাপন করতে হবে। কিন্তু এই সব প্রস্তুতি শেষ পর্যন্ত ফলদায়ক হয়ে উঠবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় ছিল—কারণ অক্ষশক্তির পরিকল্পনার সফলতা সম্পর্কেই একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। বার্লিন থেকে যেসব নির্দেশ আসছিল তাতে তাঁর সমর্থন ছিল কিনা তা খুঁটিয়ে দেখার উপায় ছিল না। এদিকে রুশীয় রণাঙ্গনে যুদ্ধের পরিস্থিতি যেভাবে মোড় নিচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল জার্মানরা রুশীয়দের প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনেও অবস্থা ভালো ছিল না। এ অবস্থায় জাপানীদেরও বার্মা-সীমান্তে আক্রমণ চালাতে হলে দু'বার ভাবতে হবে। আমি মিরন জানকে বললাম, আমরা যদি আমাদের সমস্ত উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করতে পারতাম, যদি সমস্ত শক্তি একত্র সংহত করতে পারতাম, তবে সবগুলো নির্দেশই আমরা পালন করতে পারতাম কেবল ইরানে অন্তর্ঘাতমূলক কাজটি বাদ দিয়ে। মিরন জান আমার সঙ্গে একমত হলো।

আমরা কুদাখেল ছেড়ে এলাম ৯ই এপ্রিল, পরদিন সন্ধ্যায় পৌঁছুলাম সওয়াল কিল্লাতে। এখানে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম, বিশ্রামও নিলাম। স্থির করলাম, এবার ভারত-যাত্রা করতে হবে। এরই মধ্যে আমরা নিজেদের যানবাহনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।

২৭শে এপ্রিল আমি ও গোলাম উলরেহ্মান রওনা হলাম। বাটখেল্লায় পৌঁছুলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সেখানেই রাতটা কাটালাম। পরদিন ভোরে পথের ধারে একটা চায়ের দোকানে চমৎকারভাবে প্রাতরাশ সেরে নিলাম—তারপর যাত্রা করলাম চাকদারার দিকে।

রাওলপিণ্ডিতে ট্রেনে চেপে আমি দিল্লীতে পৌঁছুলাম ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায়। অনন্তরামকে দিয়ে স্বতন্ত্রকে আমার আগমন বার্তা জানিয়েছিলাম। সুতরাং তিনি ও অচ্ছর সিং চীনা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং আমার কাবুল-ভ্রমণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। বার্লিন থেকে আসা নির্দেশের একটা কপি স্বতন্ত্রকে দিয়ে বললাম—রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওটা বেশ ভালো করে পড়ে দেখতে।

স্বতন্ত্র-র সঙ্গে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তিনি ও চীনা—দু'জনেই আমাকে বললেন নৈতিতালে গিয়ে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে; কথা হলো, এই সময়ের মধ্যে স্বতন্ত্র সব রিপোর্ট তৈরী করে কাবুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন।

৪ঠা মে আমি নৈনিতালে যাত্রা করলাম। দিল্লীতে ফিরে এলাম ১৪ই মে। এই দশদিন সমস্ত ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দভাবে কাটিয়ে দিলাম—বাড়ীতে তৈরী ভালো রান্না খেয়ে, চুট্‌কি কথা বা খোশগল্পের মধ্য দিয়েই দিন কটা কেটে গেল। এতে আমার স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি ঘটলো।

কিন্তু আমি মায়ের সংবাদ জানবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম—দেহে ও মনে তিনি কেমন আছেন তা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। কারণ, বছরের পর বছর তাঁকে গুরুতর মানসিক পীড়ন ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। তাঁর যন্ত্রণার কোনো সীমা ছিল না। আমার ভাই হরিকিষণের ফাঁসি, তারপর আমার বাবার মৃত্যু এবং অন্য ভাইদের মধ্যে কারও কারাবাস, কারও অন্তরীণ হয়ে থাকা, আর্থিক বিপর্যয়, সংসার নির্বাহের সমস্যা, পুলিশের নিগ্রহ প্রভৃতি সবই তিনি আদর্শ স্থাপনের মতো সাহস ও সঙ্কল্পের সঙ্গে সহ্য করে এসেছেন—তিনি যে সমাজের মহিলা সেখানে এর কোনো তুলনা নেই। গত কয়েক বছর ধরে তিনি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, আমি যে কাজ করি তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমার স্ত্রী তাই প্রস্তাব করেছিলেন আমি যেন মাকে দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে বলি। মা দিল্লীতে

এলেন এবং আমার সঙ্গে প্রায় পনেরো দিন কাটালেন।

স্বতন্ত্র-রও ১৪ই মে দিল্লীতে ফিরে আসবার কথা ছিল। অনন্তরামের সঙ্গে আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী নৈনিতালে যাবার আগে আমার স্ত্রীও দিল্লীতে এসেছিলেন। গুপ্ত জীবনে একেবারে একা থাকাও বিপজ্জনক—সুতরাং আমি রওনা হবার আগে আমার স্ত্রীর দিল্লীতে এসে পড়াটা ভালোই হয়েছিল।

আমি দিল্লীতে গেলাম ১৪ই মে—সেই দিনই স্বতন্ত্র এলেন। তিনি ছিলেন তুর্কী মিলিটারি অ্যাকাডেমির গ্র্যাজুয়েট—সামরিক বিজ্ঞানও পড়েছিলেন। জার্মানদের কাছ থেকে যেসব নির্দেশ এসেছিল তা তিনি পড়লেন, মিঃ রাসমাস ও মিঃ উইৎজলের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে কথাবার্তা হয়েছিল আমার মুখে তার রিপোর্টও তিনি শুনলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা-ও তাকে বুঝিয়ে বললাম। আমার মতো তাঁরও মত এই ছিল যে, যুদ্ধের পরিস্থিতি (সামরিক ও রাজনৈতিক) ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ফ্যাসিবিরোধী শক্তির অনুকূলে। জাপানীরা জার্মানীর কথায় ভারত আক্রমণ করবে এ সম্পর্কে তিনিও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তারা যদি আক্রমণ করতে চাইতো, অনেক আগেই তা করতে পারতো। সম্ভবত তারা ভেবেছিল—এটা অনেকটা জুয়াখেলার মতোই হবে।

অন্তর্বর্তী রিপোর্টটা শেষ করে আমি ২৭শে মে সওয়াল কিল্লায় যাবার জন্য রওনা হলাম, ২৯শে মে সেখানে পৌঁছুলাম।

গিয়ে দেখলাম গোলাম মূর্তজা জ্বরে ভুগছে—তার ছিল পুরনো যক্ষ্মা রোগ। কিন্তু সঙ্কল্পের দৃঢ়তার জোরে সে তার শ্রমসাধ্য কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে রিপোর্টগুলি দিলাম আর সংক্ষেপে সমস্ত অবস্থাটি বুঝিয়ে বললাম। রিপোর্টগুলি নিয়ে উমর্ খান বা গোলাম উল্‌রেহ্‌মান-এর হাত দিয়ে অনন্তরামের কাছে পাঠাতে হবে, তাকে আমি এই পরামর্শ দিলাম।

৬ই জুন আমি সওয়াল কিল্লা ছাড়লাম খুব ভোরে—তামালগড় থেকে চাকদারা পর্যন্ত প্রথম বাসটি ধরবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে। যেখান

থেকে আমাকে অনন্তরামের তুলে নেবার কথা—সেইখানে উপস্থিত হলাম। সে ওখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম—আমার ইচ্ছে ছিল চম্বলপুরা স্টেশনে ট্রেন ধরে পরদিন সন্ধ্যায় দিল্লী পৌঁছুনো।

আমি তেজসিং আর চীনাকে বলে পাঠালাম আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তারা এলো ২২শে জুন—আমরা আবার সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করে দেখলাম। এরপর আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম গোলাম মূর্তজার কাছ থেকে সংবাদ পাবার জন্য আর বার্লিন থেকে আজাদ হিন্দ্ রেডিওতে খবর শুনবার জন্য।

২রা আগস্ট অনন্তরামের কাছ থেকে সংবাদ পেলাম যে, গোলাম মূর্তজা কাবুল থেকে ফিরে এসেছে এবং আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সওয়াল কিল্লাতে যখন গোলাম মূর্তজার সঙ্গে দেখা করলাম তখন সে বললো, সে আমাদের রিপোর্ট মিঃ উইৎজলের হাতেই দিয়েছিল। ব্যবস্থা অনুযায়ী সে একদিন অন্তর মিঃ উইৎজলের সঙ্গে দেখা করতে যেতো। ২৮শে জুন মিঃ উইৎজল তাকে বলেছিলেন, তিনি গোলাম মূর্তজাকে জাপানীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন কিন্তু ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার জন্য সেই সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় নি।

১১ই জুলাই মিঃ উইৎজল গোলাম মূর্তজাকে লাইকা সম্পর্কিত একটা ফিল্মের নেগেটিভ দিয়েছিলেন; এতে দুই কপি সঙ্কেত-বার্তা ছিল। তিনি গোলাম মূর্তজাকে বলেছিলেন—ফিরে গিয়ে এগুলো আমার কাছে পাঠাতে।

কাবুলে তার সক্ষাৎকারগুলোর পূর্ণ বিবরণ জানার জন্যে আমি ওকে কতকগুলো প্রশ্ন করলাম এবং তার কাছ থেকে নেগেটিভটাও নিয়ে নিলাম।

১০ই আগস্ট আমি সওয়াল কিল্লা থেকে রওনা হয়ে দিল্লী পৌঁছুলাম ১২ই আগস্ট সন্ধ্যায়। স্বতন্ত্রও দিল্লী চলে এলেন ১৫ই আগস্ট সকালে, সন্ধ্যায় এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।

এসেই প্রথম যে কথাটি তিনি বললেন তাহলো এই যে, তিনি ১৩ই

আগস্ট টোকিও রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রথম বেতার ভাষণ শুনেছেন। এটা স্পষ্ট যে তিনি এখন জাপানে আছেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমরাঙ্গনেরই কাছাকাছি। এর অর্থ—জার্মানীর কাছে সুভাষ-চন্দ্র বসু যে সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন—সেটা তিনি পান নি এবং এই কারণেই তিনি খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন—আমার এই অনুমান সত্য হয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো যেন কোনো এক জায়গায় চিড় ধরেছিল। বার্লিন থেকে আমরা যেসব নির্দেশ পেয়েছিলাম তাতে ওরা বারংবার জাপানীদের ভারত-সীমান্ত আক্রমণের উপরেই জোর দিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে তারা জাপানীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধনেও ব্যর্থ হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, জাপানীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন। তাই ঠিক হলো, আমি কাবুলে যাবো।

আয়োজন শেষ হলে পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী আমি কাবুলে রওনা হলাম ২৩শে আগস্ট। ২৪শে আগস্ট সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম সওয়াল কিল্লাতে। গোলাম মূর্তজার অসুখ তখনও চলছিল—তার জন্য বিশ্রাম ও চিকিৎসা, দুইয়েরই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আমি গোলাম উলরেহ্‌মানকে আমার সঙ্গে নিলাম। পথে মিরন জানের সঙ্গে দেখা করে—গিরদি ও জালালাবাদ দিয়ে আমরা কাবুলে পৌঁছুলাম ১৩ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমরা বিশ্রাম নিলাম। পরদিনই আমি মিঃ উইৎজলের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। মিঃ উইৎজল আমাকে গাড়ীতে তুলে মিঃ রাসমাসের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমি আমাদের রাজনৈতিক ও সামরিক রিপোর্ট তাদের হাতে দিলাম। মিঃ রাসমাস আমাকে বললেন—পরদিন তারা বার্লিন থেকে যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সংবাদ পাবেন আশা করছেন, এটা আমার কাছে উৎসাহজনক হতে পারে। আমি তাদের বললাম—জাপানীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে। খুব শীগ্‌গিরই এটা করিয়ে দিতে তারা সম্মত হলেন। আমি তাদের বললাম, আমার রিপোর্টের এক কপি যেন জাপানীদের দেওয়া হয়, মাজোত্তার (সুভাষচন্দ্র বসু) কাছে এটি আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। তিনি তো এখন জাপানেই আছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ উইৎজল আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ রাসমাসের বাড়ীতে। সেখানে আমার সঙ্গে রিপোর্টের সামরিক অংশ নিয়ে আলোচনা করলেন, কয়েকটি বিষয়ে ব্যাখ্যাও চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন, ভারতে সহযোগী মিত্রদের প্রস্তুতি আক্রমণাত্মক, না আত্মরক্ষামূলক? আমি তাকে বললাম, রিপোর্টেই বলা হয়েছে—এখন পর্যন্ত এই প্রস্তুতিকে আত্মরক্ষামূলক বলেই মনে হয়, যদিও আক্রমণের পরিকল্পনাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে—যেমন, আরাকানে জঙ্গল-যুদ্ধের শিক্ষাদান, 'উইনগেট চিনদিৎ' কার্যক্রম ইত্যাদি। এসব তো আক্রমণেরই ভূমিকা। এই বিষয়ে তিনি একমত হলেন।

মিঃ রাসমাস আবার বিকেলে এলেন রিপোর্টের রাজনৈতিক অংশটুকু নিয়ে আলোচনা করতে। বিশেষ করে তিনি জানতে চাইলেন বাঙলাদেশের খাদ্যের অবস্থা এবং ভারতের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পরিস্থিতি সম্পর্কে।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতকে সুভাষচন্দ্র বসু যে চাল দেবার প্রস্তাব করেছেন তা ভারতীয় জনমানসে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তিনি সে-সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, পথের সাধারণ মানুষ এ জাতীয় প্রস্তাব নিশ্চয়ই লুফে নেবে—কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষেরা বুঝতে পারবে, এ হলো সুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষ থেকে প্রচার মাত্র। কারণ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশরা এতে অনুমতি দেবে না, তাছাড়া যখন একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছে তখন চাল পাঠানো সম্ভবও নয়।

১৯৪৩-এর ১৪ই সেপ্টেম্বর যখন মিঃ উইৎজলের সঙ্গে আবার দেখা হলো—তিনি বললেন তার পরদিন তিনি আমাকে মিঃ রাসমাসের কাছে নিয়ে যাবেন, কেন না বার্লিন থেকে কিছু নির্দেশ এসেছে। কাজেই ১৫ই সেপ্টেম্বর আমি তার বাড়ীতে গেলাম।

প্রথমেই মিঃ উইৎজল আমাকে বললেন—আফগান সরকার তাদের গুপ্ত কাজের বিরুদ্ধে বার্লিনের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছেন, দাবী করেছেন তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হোক। বার্লিন সরকার তাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, যদি আফগান সরকার তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আফগান সরকার

তাই ব্রিটিশকে অনুরোধ জানিয়েছেন—তারাও ভারতের মধ্য দিয়ে নিরাপদে যাবার পথের ব্যবস্থা করে দিতে সম্মত হয়েছেন। সুতরাং তারা দু'জনেই খুব শীগ্‌গিরই কাবুল ছেড়ে যাচ্ছেন।

তারপর তারা আমাকে একগুচ্ছ নতুন নির্দেশ ও প্রশ্ন দিলেন। তারা বললেন—এইগুলো সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে এসেছে। নির্দেশ ও প্রশ্নগুলি এইরূপ :

১. বিমানের সাহায্যে উপজাতীয় অঞ্চলে লোক নামানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

২. কাবুল থেকে আমাদের লোককে উপজাতীয় অঞ্চলে পাঠাবার এখন আর কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

৩. ভারতভূমিতে অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে মিঃ উইংজলের সঙ্গে, তার কাবুল ত্যাগের পূর্বে, আলোচনা করো।

৪. তোমাদের সংগ্রান এবং আমাদের আক্রমণ একই সঙ্গে চালাতে হবে।

৫. আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পক্ষে কাবুল আর নিরাপদ নয়। তাহলেও এই ব্যবস্থাই চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে।

৬. জাপানীদের বিরুদ্ধে শত্রুর প্রচারের বিপরীতে দয়া করে পাল্টা প্রচার চালাও।

৭. ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে তোমাদের প্রচার খুব ফলদায়ক হয় নি। যতদূর সম্ভব একে বাড়িয়ে দাও।

৮. ব্রিটিশদের কোনো আক্রমণের পরিকল্পনা আছে কিনা জেনে নাও। যদি থাকে, তবে সেই পরিকল্পনা কি জানাও। এইটে খুবই

সম্পক ।ক যথাযথ২ ভালো ?

১০. সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানী পরিত্যাগ করার পর দেশে তার প্রভাব কতখানি ?

১১. প্যারাস্যুট বা ডুবো জাহাজে করে আমাদের যেসব লোক

নামানো হচ্ছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করো।

১২. ভারতীয় কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাও। মস্কোর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কি ?

১৩. ভারতে এই ইয়োরোপীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কিরূপ ?

১৪. কাবুলের রুশীয় দূতাবাসে কর্মচারীর সংখ্যা এত বাড়ানো হয়েছে কেন—জানো কি ?

১৫. আর একবার অনুরোধ জানাচ্ছি, সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো—স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং অন্যান্য যান্ত্রিক বাহিনী, অস্ত্রের উৎপাদন ও সেই অস্ত্রের সঞ্চয়, গোলা-বারুদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েরই সংবাদ চাই।*

কয়েকটি ছোটখাট বিষয়ে কথাবার্তা বলার পর আমরা ভারতে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। কেন না মিঃ উইৎজল কাবুল ত্যাগ করার আগে এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

আমি বললাম—"দেরী না করে অবিলম্বে এই সমস্যাটির ফয়সালা করতে হবে। কিন্তু গভীরভাবে এই প্রশ্নটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার আগে এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসু কি ভাবছেন তা আমাদের জানতে হবে। নানা কারণেই বাঙলার সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমরা তা আর গড়ে তুলতে পারি নি। তাছাড়া ব্যাপারটি আরো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওখানকার দুর্ভিক্ষ-জনিত পরিস্থিতির জন্য। রুশ-জার্মান যুদ্ধের জন্যও কিছু যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়েছে। আর একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দেশের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ হয় জেলে আছেন নয়তো আত্মগোপন করে আছেন। এই কারণেই প্রথমে প্রয়োজন, এদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের খুব যোগ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, ছিন্ন সূত্রগুলোকে আবার গেঁথে তুলে তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা—

* এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, এই সব নির্দেশ এসেছিল বার্লিন থেকেই। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো আলোচনাই হয় নি।

তারপর সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে একটা সুদৃঢ় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এইটিই বরং বেশী সম্ভব যে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে ইতিমধ্যেই এই সমস্যার একটা বাস্তব রূপ দিয়েছেন। এ-ও হতে পারে যে, কোনো কোনো ব্যক্তির কথা তিনি ভেবেছেন, যাঁদের তিনি অন্তরঙ্গভাবে জানেন। এই অবস্থায় ঠিক এই মুহূর্তে এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে আমি অক্ষম।"

মিঃ উইৎজল আমাকে বললেন—বার্লিনের নির্দেশ থেকে মনে হয়, এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিলম্বে এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা প্রয়োজন। এদিকে আমার অভিমতটিও বিবেচনার যোগ্য।

মিঃ উইৎজল ১৯৪৩-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর আমাকে মিঃ রাসমাসের বাড়ীতে মিঃ ইনোয়ে-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি ছিলেন জাপানী দূতাবাসের গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। তিনি আমাকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন। ভারতের সামরিক প্রস্তুতি আত্মরক্ষামূলক, না আক্রমণাত্মক—এইটি জানবার জন্যই তাকে বিশেষভাবে আগ্রহী মনে হলো। আমি তাকে বললাম—আগে আত্মরক্ষামূলক থাকলেও, সম্প্রতি তা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন: যদি আক্রমণ করে তাহলে প্রথম পর্যায়ে তাদের পরিকল্পনা কি ধরনের হতে পারে?

উত্তর: আপনি জানেন, ইঙ্গ-মার্কিন বিমান বাহিনী খুবই শক্তিশালী। এই বিমান বাহিনীর সাহায্যেই এখন পর্যন্ত ওরা সবকিছু অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে। আমাদের মনে হয়, ওরা বিমানে করে দক্ষিণ ব্রহ্ম এবং উত্তর মালয়ে সৈন্য নামাবে ব্রহ্মদেশে জাপানীদের সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য; তারপর সেখান থেকে ওরা রেঙ্গুনের দিকে অগ্রসর হবে।

প্রশ্ন: এই আক্রমণ কখন শুরু হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর: আমি এবিষয়ে এখন কিছু বলতে পারি না, সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি হবে না।

প্রশ্ন: সাধারণভাবে বলতে গেলে জাপানীদের সম্পর্কে ভারতীয়দের

ধারণা কি রকম ?

উত্তর : যেহেতু জাপান চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছিল সেইহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি চীনের প্রতিই সমর্থন জানিয়েছে এবং জাপানী আক্রমণের নিন্দা করেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস চীনের সঙ্গে তার সংহতি ঘোষণা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করেই নীরব থাকে নি—চীনকে সাহায্য করবার জন্য এক চিকিৎসকদল পাঠিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ঐ সময়ে এই মতেরই সমর্থক ছিলেন ; কিন্তু জাতীয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটায় এই মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তনের আরও একটি কারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির রূপান্তর। তাছাড়া সুভাষচন্দ্র বসু নিজে এখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে আছেন—তাই জাপান সম্পর্কে জনমত কিছুটা পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে নয়। যাই হোক, ঐখানে তাঁর একটানা উপস্থিতি এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁর সশস্ত্র আক্রমণের প্রয়াস জাপন বিরোধী গণ মনোভাবের প্রভূত পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশরা জাপান-বিরোধী প্রচারের জন্য মুসলিম লীগকে কাজে লাগিয়েছে। তারা প্রচারের মাধ্যমে এই যুক্তি দেখাচ্ছে যে, জাপানীরা বৌদ্ধ (সুতরাং হিন্দুদের কাছাকাছি), যদি তারা যুদ্ধে জয়ী হয়—তার অর্থ হবে হিন্দুদেরই জয়।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি জানতে চাইলাম, তার সরকারের কাছ থেকে আমার জন্য অন্য কোনো সংবাদ আছে কি না। তিনি বললেন, পরে এ বিষয়ে আলোচনা হবে। আমি জানতে চাইলাম, সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে কোনো বার্তা এসেছে কি না। তিনি জবাব দিলেন, কেবলমাত্র আগের দিনই তাকে জানানো হয়েছে যে, আমার সঙ্গে তিনি পরিচিত হতে যাচ্ছেন। এই সব কথাই তিনি ঐ দিন টোকিওকে জানিয়ে তাদের নির্দেশ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আমি তাকে জানালাম, কয়েকটি কারণে আমাকে শীগ্‌গিরই

কাবুল ছেড়ে যেতে হচ্ছে—ফিরতে বেশী দেরী হবে না।

২১শে সেপ্টেম্বর আমরা কাবুল ছাড়লাম—গিরদিতে ২২শে সন্ধ্যায় পৌঁছে পরদিন সন্ধ্যায় পৌঁছুলাম কুদাখেল। ওখান থেকে ২৫শে পৌঁছুলাম সওয়াল কিল্লাতে। ২৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল প্রায় চারটায় সওয়াল কিল্লা ছেড়ে আমি তামালগড় থেকে শেষ বাস ধরলাম। সঙ্গে ছিল গোলাম উলরেহ্মান। রাতটা বাটখেল্লায় কাটিয়ে পরদিন যেখানে অনন্তরামের সঙ্গে দেখা হবার কথা ছিল সেইখানে গেলাম। সে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সেখানে গোলাম উলরেহ্মানকে ফিরে যেতে বললাম; তারপর অনন্তরাম ও আমি রাওলপিণ্ডির দিকে যাত্রা করলাম দিল্লীগামী ট্রেন ধরবার জন্য। দিল্লীতে পৌঁছুলাম ১৯৪৩-এর ১লা অক্টোবর।

আমার দিল্লী যাওয়ার কথা স্বতন্ত্রকে আগেই জানানো হয়েছিল—তিনি এলেন ৪ঠা সকালে। আমি স্বতন্ত্রকে বললাম—বর্তমানে যেমন কাজের ধারা চলেছে তাতে আমার কাজে কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করছি। আমি চাই একজন নির্ভরযোগ্য কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি, যে আমার অনুপস্থিতিতে দিল্লীতে থাকবে—আমার বাড়ীঘর দেখবে, কিন্তু তার আসল কাজ হবে আমার কাজে সাহায্য করা। এখন আমার স্ত্রী, একটি শিশু ও একজন চৌকিদার দিল্লীর বাড়ীতে আছে। কাবুলে থাকার সময় আমার কখনও কখনও মনে হয় আপনার সঙ্গে জরুরী আলোচনার দরকার। এই রকম পরিস্থিতিতে হয় আমাকে একজন চর পাঠাতে হবে, নয়তো নির্ভরযোগ্য কোনো লোককে দিয়ে পেশোয়ারে চিঠি ডাকে দিতে হবে। যে কমরেড আমার বাড়ীতে থাকবে সে দূতকে বা চিঠিটাকে গ্রহণ করবে এবং আমার নির্দেশ মতো কাজ করবে।

তেজ সিং কথা দিলেন, সমস্যাটি নিয়ে তিনি ভেবে দেখবেন। আমি আমার চুয়াল্লিশ দিন কাবুলবাসের সম্পূর্ণ বিবরণ তার কাছে তুলে ধরলাম, জার্মান-বন্ধুদের কাছ থেকে যেসব নির্দেশ পেয়েছিলাম তা-ও জানালাম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার রিপোর্টটি

সব দিক থেকেই খুঁটিয়ে দেখতে এবং সেই সঙ্গে নির্দেশগুলিকেও—রাজনৈতিক সামরিক ও প্রযুক্তিগত সব কিছুকেই (যেমন বিমানের অবতরণ, পেট্রলের সঞ্চয়, বেতার ইত্যাদি) বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে।

তারপর আমরা ইয়োরোপীয় ফ্রন্টের আর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। আমার ধারণা এই ছিল যে, ইয়োরোপে অত্যন্ত কঠিন রুশীয় প্রতিরোধের পরিণামে এবং মধ্যপ্রাচ্যেও কিছুটা বাধার ফলে যুদ্ধের ভারসাম্য এখন স্পষ্টতই ফ্যাসি-বিরোধী জোটের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনেও দেখা দেবে। যাই ঘটুক না কেন, আমরা যথাশক্তি আমাদের কর্মসূচী অনুসরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকবো।

স্বতন্ত্র-র দৃষ্টিও যে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে স্বচ্ছ ছিল তা বোঝা গেল যখন তিনি বললেন—'যুদ্ধে যদি ব্রিটিশ তার মিত্রশক্তির সাহায্যে জয় লাভ করেও, তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিতরে ও বাইরে যে বিরোধিতা আত্মপ্রকাশ করবে তাকে তারা এঁটে উঠতে পারবে না।'

এক সপ্তাহ পরে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন; যাবার আগে বলে গেলেন, আমার রিপোর্টের ভিত্তিতে তিনি কাজ শুরু করে দেবেন এবং আমার কাজের বিবরণ কেন্দ্রীয় দফ্‌তরেও জানিয়ে দেবেন। আমাকে আরও বললেন, দলের কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে গিয়ে নিজের মুখে পার্টির নেতাদের কাছে একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরতে।

এই উদ্দেশ্যেই আমাকে এক সপ্তাহের জন্য যেতে হলো বোম্বে, তারপর আবার দিল্লীতে ফিরে এলাম ১৯৪৩-এর ২৫শে অক্টোবর। কিছুদিন পর আলিগড় জেলায় নারোয়া ব্যারেজে গেলাম এবং সেখান থেকে নৈনিতাল জেলার বানবাস্‌সা ব্যারেজে। আত্মগোপনের জীবনে নানারকম অনিয়মে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল—স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশাতেই এই ভ্রমণ। আমার জীবনের এ সময়টা, অর্থাৎ যখন আমি আমার হারানো স্বাস্থ্য, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ফিরে

পেয়েছিলাম—আমার স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এর সমস্ত কৃতিত্ব আমার স্ত্রীর। যদিও রাজনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবু তিনি যথার্থ ভারতীয় প্রেমনিষ্ঠ পত্নীরূপে আমাকে সাহায্য করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার ফলেই আমার নষ্ট স্বাস্থ্য আমি অনেকাংশে ফিরে পেয়েছিলাম।

দিল্লীতে ফিরে এসে ১৯৪৩-এর ২রা ডিসেম্বর আমি স্বতন্ত্রর সঙ্গে দেখা করলাম ; তাঁকে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন—বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমেই তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন কিন্তু এ পর্যন্ত সফল হতে পারেন নি। মনে হলো, আমি যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলেছিলাম তাঁরা সবাই ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি বললেন—যখন শান্তিময় গাঙ্গুলী লাহোরে এসেছিলেন আমাদের সহযোগিতার প্রত্যাশায় তখন তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানো আমাদের পক্ষে অবিবেচনার কাজ হয়েছে। ফলে বি. ভি-র সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত সূত্রই আমরা হারিয়েছি। আমি তাঁকে বললাম, যদি আমাকে তিনি একটি নির্ভরযোগ্য যোগসূত্রের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তবে আমি নিজেই কলকাতায় গিয়ে নতুন করে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারি।

তিনি জবাব দিলেন—'এই সমস্ত কাজের জন্য তুমি তোমার নিজের জীবন বিপন্ন করবে, এ আমি হতে দিতে পারি না। বর্তমানে তুমিই আমাদের কর্মসূচীর পরিচালক—আমাদের প্রধান কাজের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা শ্রেয়তর।'

আমি তাকে বললাম—তিনি বেশ ভালো করেই জানেন, প্যারাস্যুটেই হোক্ বা ডুবো জাহাজেই হোক জাপানীরা ভারতে লোক পাঠাচ্ছে। কিন্তু এ পর্যন্ত এই সব দেশপ্রেমিকের মধ্যে অধিকাংশই হয় নিহত হয়েছেন, নয়তো বন্দী হয়েছেন। যদি জাপানীরা আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়াই এই দুঃসাহসিক কাজ চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে তবে আমার আশঙ্কা আরও অনেক জীবন নষ্ট হয়ে যাবে—তাতে আমাদের কোনো উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হবে না। সুতরাং এই কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্য তাদের বলতেই হবে।

স্বতন্ত্র ভেবেছিলেন, আমি এখন উপজাতীয় অঞ্চলে অবশ্যই ফিরে যাবো—যেসব দায়িত্বশীল কমরেড তাদের নিজের নিজের অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে দেখা করবো, এমন কি ওয়াজিরিস্তানেও যাবো, যেখানে ইপ্‌পির ফকির তার কেন্দ্রীয় দফ্‌তর স্থাপন করেছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খুশল খান, মিৎ গজন খান, জরৎ গুল্‌ প্রমুখ কমরেডগণও আমন্ত্রিত হবেন।

আমি তাই উপজাতীয় অঞ্চলের উদ্দেশেই রওনা হলাম ১৯৪৩-এর ১২ই ডিসেম্বর এবং ১৫ই ডিসেম্বর সেখনে উপস্থিত হলাম। ২৮শে ডিসেম্বর একটি সভার ব্যবস্থা করা হলো—সেই সভায় স্থির হলো যেসব নির্দেশ পাওয়া গেছে সেগুলো কাজে পরিণত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে—সেইজন্য যথাযথ প্রস্তুতির দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

১৯৪৪-এর ৪ঠা জানুয়ারী গোলাম উলরেহ্‌মানের সঙ্গে সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে এলাম। তামালগড়ে এসে বাটখেল্লায় যাবার শেষ বাস ধরলাম—বাটখেল্লায় উপস্থিত হলাম রাত আটটায় এবং সেইখানেই রাতটা কাটালাম। তাঁরপরে রাওলপিণ্ডিতে ট্রেনে উঠে দিল্লী ফিরে এলাম ৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যায়। জার্মানদের কাছে প্রত্যেকটি বিষয় আমরা স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছিলাম বলে এখানে রিপোর্ট তৈরী করতে আমার অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। অবশ্য এই রিপোর্ট জাপানীদের কথা মনে রেখেও রচিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রিপোর্টটি লেখা শেষ হলো এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে।

১৯৪৭-এর ১৩ই এপ্রিল আমি যাত্রা করলাম কাবুলে। সওয়াল কিল্লায় এলাম ১৪ই এপ্রিল—আসতে বেশ রাত হয়ে গেল। এবারেও মূর্তজাকে অসুস্থ দেখলাম, তাই গোলাম উলরেহ্‌মানকে সঙ্গে নিতে হলো। কিন্তু এবারকার যাত্রা অত্যন্ত বিঘ্নসংকুল হয়ে উঠলো। তখন বর্ষাকাল—তুষার-ঝটিকার ঋতু। পথে ঠাণ্ডায় সর্দি লেগে গেল, কোনো রকমে কাবুলে পৌঁছুলাম ১৯৪৪-এর ২৭শে এপ্রিল।

পৌঁছুবার পর আমি আমাদের জার্মান-বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগের

চেষ্টা করলাম কিন্তু মাসের ত্রিশ তারিখের আগে তার দেখা পেলাম না। আমি তাকে আমার রিপোর্ট দিলাম ; ঠিক হলো ১লা মে আলোচনার জন্য বসা হবে। তিনি আমাকে একটি বার্তা দিয়ে বললেন সেটি নাকি বার্লিন এবং মাজোত্তার (সুভাষচন্দ্র) কাছ থেকে এসেছে।

বার্তাটি এই রকম :

১. ব্রহ্ম-আসাম সীমান্তে জাপানীদের বর্তমান ক্রিয়াকলাপকে ভারতের বিরুদ্ধে একটা বড় রকমের আক্রমণ মনে করা উচিত হবে না।

২. বড় রকমের আক্রমণ আগামী বর্ষার আগে শুরু হবে না।

৩. দক্ষিণ বাঙলার তীরভূমিতে এবং কলকাতায় জাপানী সৈন্য অবতরণ করবে—সেই সময়ে তোমাদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজগুলো যথাসম্ভব ভালোভাবে আরম্ভ করবে—ভারতে এবং উপজাতীয় অঞ্চলগুলোতে।

৪. বেশ যুক্তির সঙ্গেই আমরা একথা বলতে পারি যে, রুশীয়রা আমাদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা জানে ; তুমি যেসব রিপোর্ট আমাদের দিয়েছিলে তার কিছু কিছু তাদের হাতেও পৌঁছেছে। এটা খুবই সম্ভব যে রুশীয়দের হাত দিয়ে সেই রিপোর্ট ব্রিটিশদের হাতে চলে গেছে।

৫. সুতরাং জার্মানরা এবং সেই সঙ্গে মাজোত্তাও অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাবী জানাচ্ছেন, যে-ব্যক্তি আমাদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং খবর পাচার করেছে তার সম্পর্কে সন্ধান নেওয়া হোক।

৬. উত্তর ভারতে মুসলিম লীগের মনোভাব কি ?

৭. উপজাতীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি কিরূপ ?

৮. জাপানীদের ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে ভারতবাসীদের মতামত কি ?

৯. ভারতে রুশীয় প্রচার সম্পর্কে আমাদের লোকদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ?

১০. দক্ষিণ আফগানিস্তানে যে হাঙ্গামা হয়েছে সেই সম্পর্কে তোমার মত কি ?

এই সব প্রশ্নের আমি এইভাবে উত্তর দিলাম :

আপনারা ধরে নিয়েছেন আমাদের ভিতরের গুপ্ত সংবাদ বাইরে পাচার হয়েছে। আপনারা আপনাদের এই অনুমান সম্পর্কে একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা যদি না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দিতে পারেন ততক্ষণ আপনাদের চতুর্থ সংখ্যক প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেওয়া যেতে পারে না। আমি এটা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে, মিঃ রাসমাস যখন ভারত অতিক্রম করছিলেন তখন কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই 'গুপ্ত সংবাদ' ফাঁস হবার সংবাদ তাকে দিয়েছে। 'প্রথমত, আমাদের সংগঠনের মধ্যে রয়েছেন এমন কোনো রুশপ্রেমিক ব্যক্তি ভারতের মধ্য দিয়ে চলে যাবার সময় মিঃ রাসমাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, এ রকম কল্পনা করাটাই অর্থহীন। কারণ, আমাদের সংগঠনের কেউ জানতেন না যে তিনি ভারতের পথে যাচ্ছেন। আমি তখন ভারতেই ছিলাম, অথচ এ কথাটা আমিও জানতাম না।

'দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ বাধবার আগেই মিঃ রাসমাস বহু বছর ভারতে কাটিয়েছেন এ সংবাদ ব্রিটিশ সরকার রাখতেন। ভারতে তার কিছু পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন—এটাও স্বাভাবিক। তাই স্বভাবতই ব্রিটিশের গুপ্তচর বিভাগ, কারা তার পরিচিত ব্যক্তি এই সংবাদ জানবার জন্য তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই রেখেছিলেন। সুতরাং এইভাবে সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে নিশ্চয়ই বাদ দিতে হবে; কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ মিঃ রাসমাসকে বোকা বানিয়েছেন—এই সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না। আগের থেকে শেখানো পড়ানো কোনো ব্রিটিশ গুপ্তচর মিঃ রাসমাসের সঙ্গে দেখা করে তাকে এই বানানো গল্পটি বলেছে, এও হতে পারে। ব্রিটিশ সরকার জানতেন যে সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানদের সক্রিয় সাহায্যেই বার্লিনে গেছেন। তারা সন্দেহ করে থাকবেন যে, জার্মান সরকার হয়তো এখনও ভারতে সুভাষচন্দ্র বসুর অনুচর এবং ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। সুতরাং এই সাজানো গল্প বানানোর পিছনে ব্রিটিশ

গুপ্তচর বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মধ্যে অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করা।

'তৃতীয়ত, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—ব্যাপারটা ঘটেছিল গত ৯ই ফেব্রুয়ারী। সেইদিন আমি একটা প্যাকেট মিঃ হ্যানস্ ডো-র হাতে দিয়েছিলাম। সেই প্যাকেটে ছিল আমার জার্মান বন্ধুদের দেওয়া কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর, কতকগুলো গোপন সামরিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত বিবরণ, আমাদের কাজকর্মের পরিকল্পনা—এইসব। রুশীয় দূতাবাসের কাছেই একটি স্থানে আমি মিঃ হ্যানস্ ডো-র সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পরদিন, অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী যখন আমি মিঃ উইৎজলের সঙ্গে দেখা করলাম তিনি আমাকে একটি মর্মান্তিক সংবাদ জানালেন—প্যাকেটটি নাকি মিঃ হ্যানস্ ডো-র হাত থেকে কোথায় পড়ে গেছে। প্যাকেটটি নিশ্চয়ই ঐ স্থানের কাছাকাছি কোথাও হারিয়েছিল। যদি ডাস্টবিনে না গিয়ে থাকে তবে এটা কোথায় যেতে পারে তা বুঝতে কোনো গভীর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না। এরকম ঘটনা খুব স্বচ্ছন্দেই ঘটতে পারে যে, রুশীয় কিংবা রুশ-সমর্থক কেউ পথে ঐ প্যাকেটটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এবং সেটি রুশীয় দূতাবাসে পৌঁছে দিয়েছিলেন। অথবা প্যাকেটটি পড়েছিলো আফগান পুলিশের হাতে এবং সেখান থেকে চলে গেছে রুশীয়দের হাতে। এই সিদ্ধান্ত অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্য—ভিতর থেকে গুপ্ত সংবাদ ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, এই অনুমানের চেয়ে। পরবর্তীকালে আফগান সরকার মিঃ রাসমাস এবং মিঃ উইৎজলের কাবুল ত্যাগের জন্য যে দাবী জানিয়েছিলেন তার ব্যাখ্যা এইখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

'গুপ্তকথা ফাঁস হয়ে যাবার মতো একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা আমি মানি; কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা আমাদের দিক থেকে নয়। কোনো অকাট্য প্রমাণ ছাড়া এই জাতীয় গল্পকথা আমি মেনে নিতে রাজী নই। সুতরাং বদনামটা সম্পূর্ণভাবে মিঃ হ্যানস্ ডোরই প্রাপ্য তার অবহেলার জন্য।

'আমি আপনাদের সম্পূর্ণ অকপটেই জানাবো যে, আমি বা আমার

লোকজন সম্পর্কে আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে তাহলে এর পরে আর আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা যুক্তিসঙ্গত হবে না। আপনারা বার্লিন কর্তৃপক্ষকে এবং মাজোত্তাকে আমার অভিমত জানাতে পারেন ; কেননা, আমি কাউকে ভুল পথে চালিত করতে চাই না, নিজেও চালিত হতে চাই না। আপনারা আমার পক্ষে একটা অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। আমি আবার বলছি, যদি গুপ্তপথে তথ্য ফাঁস হয়ে থাকে তবে তা মিঃ হ্যানস্ ভোর অসতর্কতার জন্যই হয়েছে : আর এর ফল মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে আপনাদের কাছে যতটা, আমাদের কাছে তার চেয়েও বেশী। সমস্ত ব্যাপারটিই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কেননা গত সাড়ে তিন বছর ধরে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে হৃদ্যতাব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এই ঘটনা তাতে ভাঙ্গন ধরিয়েছে।

আমি আমাদের জার্মান-বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা করলাম ১৯৪৪-এর ১২ই মে। বার্লিন থেকে আমার জন্য দু'টো সংবাদ এসেছিল। একটি ছিল সেই গুপ্তপথে সংবাদ প্রকাশ হওয়া সম্পর্কে—তার উত্তর আমি আগেই বিস্তৃতভাবে দিয়েছি, নতুন আর কিছু বলার ছিল না। আমার এই জার্মান-বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, যখন এর পরে জাপানীদের সঙ্গে দেখা হবে তখন যেন তাদের কাছে আমাদের পরিকল্পনার কথা বলে না ফেলি। স্থির হলো, ১৬ই মে আমরা তিনজনে একসঙ্গে আলোচনায় বসবো। বোম্বাই গেল, আমি জাপানীদের সঙ্গে একা দেখা করি এটা জার্মান-বন্ধুদের ইচ্ছে নয়।

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, জার্মানরা আমাদের সম্পর্কে আর কোনো ঝুঁকি নিতে চান না, আমাদের বিষয়ে কোনো আগ্রহও তাদের নেই। আমাদেরও আর থাকা উচিত নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এখন সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত আছেন—তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন—এখন আমাদের আগ্রহ জাপানীদের সম্পর্কেই। কিন্তু জাপানীদের অবস্থা জার্মানীর তুলনায় মূলত পৃথক কিছু ছিল না। কারণ জার্মানী যদি যুদ্ধে পরাজিত হয় তাহলে আজ হোক

কাল হোক জাপানীদেরও সেই দশাই ঘটবে।

জাপানীদের আস্তানায় আমরা মিলিত হলাম ১৯শে মে। আমি মিঃ ইনোয়ে-র সঙ্গে পৃথকভাবে দেখা করলাম। এক ঘণ্টা তার সঙ্গে আলাপ হলো এই বিষয়গুলো নিয়ে :

প্রশ্ন : মিঃ রাসমাস যে কাবুল ছেড়ে গেলেন এ বিষয়ে আপনার মত কি? ১৯৪৩-এর অক্টোবরে আপনি কাবুল থেকে চলে গেলেন—তিনিও গেলেন তার কিছু পরেই। আমার সরকার এতে সন্দেহজনক কিছু আছে বলে মনে করেন।

উত্তর : আপনি হয়তো জানেন না, কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দলিল সহ একটা প্যাকেট আমি মিঃ হ্যান্‌স ডো-কে দিয়েছিলাম—সেটা তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল রুশীয় দূতাবাস ও আপনাদের দূতাবাসের কাছেই—গতবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার অনেক আগেই এটা হয়েছিল। ঐ ঘটনাই সম্ভবত তার প্রস্থানের মূলে।

প্রশ্ন : বর্ষার পরে যদি জাপানী আক্রমণ শুরু হয়—তবে ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে?

উত্তর : এই প্রশ্নের উত্তর আমার রিপোর্টেই দেওয়া আছে, পৃথক কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : গুপ্ততথ্য যে এভাবে ফাঁস হলো—এটার ব্যাখ্যা আপনি কিভাবে করবেন?

উত্তর : আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন? (সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন—না, না)। কোনো ছিদ্রপথে যদি তথ্য ফাঁস হয়েই থাকে তবে সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। ব্যাপারটা নিয়ে জার্মানরা বড় বেশী গোলমাল করছেন—কিন্তু আমি যে প্যাকেটটা মিঃ হ্যান্‌স্ ডো কে দিয়েছিলাম এবং সেটা যে হারিয়েছিল তা তারা বেশ ভালো করেই জানেন। প্যাকেটে খুবই গোপনীয় তথ্যে ভরা কতকগুলো কাগজপত্র ছিল। আমি এই ঘটনার কোনো দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নই, আর

আমার দলীয় লোকেরাও এতে জড়িত নয়। জার্মানরা এখন নিজেদের ভুলের জন্য দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনাদের সংগঠনে কি রুশ সমর্থক বা কম্যুনিস্ট কেউ নেই ?

উত্তর : আমি নিজেই কম্যুনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলাম ; সুভাষচন্দ্র বসু ভারত ছেড়ে যাবার আগে একথা জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি জার্মানদের সঙ্গে, ইতালীয়দের সঙ্গে কাজ করেছি। তখন আমি জানতাম সুভাষচন্দ্র বসু নিজেও কম্যুনিস্ট নন। তবু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই ছিল আমাদের সাধারণ স্বার্থ। এই কারণেই আমি তাঁকে সাফল্যের সঙ্গে ভারত থেকে কাবুলে এনেছিলাম। অবশিষ্ট কাহিনী আপনারা নিজেরাই জানেন। আমি এখন আপনাদের সঙ্গে কাজ করছি, জার্মানদের সঙ্গেও কাজ করছিলাম—তার কারণ আমি ও আমার সহকর্মী কমরেডরা গভীরভাবে অনুভব করি যে আমাদের প্রধান শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং আমাদের দেশকে তাদের শাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। সেই কারণেই সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, তাঁকে সাহায্য করেছি এবং অক্ষশক্তির সঙ্গেও সহযোগিতা করে চলেছি। প্রথম থেকেই জার্মান ও ইতালীয়রা আমার বিষয়ে এবং আমার সঙ্গে যেসব কমরেড কাজ করছেন তাদের বিষয়ে সব কথাই জানতেন। আমার সঙ্গে যারা কাজ করছেন তারা কি ধরনের লোক আমি তা বেশ ভালোভাবেই জানি। তাদের সম্পর্কে আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু এখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই পর্যায়ে এসে জার্মান-বন্ধুরা আমাদের সম্পর্কে অন্যভাবে ভাবছেন।

(জাপানী বন্ধু বললেন : 'আমি খুবই দুঃখিত যে, এই সব প্রশ্ন আপনাকে করে ফেলেছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে সন্দেহ করবার কোনো কারণ আমাদের নেই। সুভাষচন্দ্র বসুও আপনার সম্পর্কে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করেন না।' এর পর তিনি অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি তাকে বললাম—গত সাড়ে তিন বছর ধরে

আমরা পরস্পরকে জানি, একে অন্যকে সন্দেহ করবার কোনো কারণ খুঁজে পাই নি। কিন্তু তাদের যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবার কারণ থেকে থাকে তবে এই সম্পর্ক আর বজায় রাখা অর্থহীন।

তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—আটজন লোকের যে দলটি অবতরণ করেছে সেই সম্পর্কে আমরা আর কোনো সংবাদ রাখি কি না, তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে কি না। আমি জার্মানদের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছি তার উল্লেখ করলাম।)

প্রশ্ন : উপজাতীয় অঞ্চলে আপনাদের মাসিক ব্যয় কত ?

উত্তর : আমাদের মাসিক খরচ ৯০০০ টাকা থেকে ১১০০০ টাকা, কখনও কিছু বেশী, কখনও কিছু কম। (তিনি বললেন, কাবুলে তাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল—জার্মানদেরও একই অবস্থা ; এর কারণ রাজধানীর সঙ্গে তাদের উপযুক্ত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব। আফগান সরকার তাদের জন্য 'যতটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র মুদ্রা-বিনিময়ের ব্যবস্থা করেছেন, তার বেশী নয়। আমি এই অভিমতও দিলাম, যারা বিমান থেকে নামতে পেরেছে এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পেরেছে তারা যদি নতুন ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করে তাহলে আমরা ওদের বেতার-সংযোগ ব্যবস্থার সুযোগ নেব। সেই ক্ষেত্রে ঐদিক থেকে আরও সাহায্যের ব্যবস্থা করা সহজ হবে। তিনি আমার প্রস্তাব সানন্দে সমর্থন করলেন ; আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, সোজাসুজি বেতার-সংযোগ স্থাপনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি আমাকে বললেন, আমার আগমন সংবাদ তিনি ইতিমধ্যেই টোকিওকে জানিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো সংবাদ তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।)

স্বাধীনভাবে যোগাযোগ স্থাপনের প্রশ্নটির উপরে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিলাম, তাকে অনুরোধ করলাম যারা আগে নেমেছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এরপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

২০শে মে আমাদের নূতন জার্মান-বন্ধু মিঃ জাণ্ডমুল্লার সঙ্গে প্রথম দেখা করলাম। বার্লিন থেকে আমার জন্য একটি বার্তা এসেছে। তাতে আছে ঃ

১. আমরা এখন বিমান নামানো সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি—সুতরাং এই বিষয়ে আর কোনো পরিবর্তন আমরা করতে পারি না।

২. বিমানের জন্য দু'হাজার গ্যালন পেট্রোলের ব্যবস্থা রাখুন ; যদি না পারেন তবে আমাদের প্যারাস্যুটের সাহায্যেই নামতে হবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কেবল অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ ছাড়া অন্য কিছুই সঙ্গে নিতে পারি না। তাছাড়া দুজন বিমান চালকের নিরাপত্তা সম্পর্কে আপনাদের দায়িত্ব নিতে হবে ; কাবুলে বা অন্য কোথাও তারা যাতে নিরাপদে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৩. বিমানটি হবে আমেরিকার বিমানের মতো ; অবতরণের সময়ে যাতে কোনো শব্দ না হয়, সেই বিষয়ে সব রকম সাবধানতাই অবলম্বন করা হবে।

৪. উপরে উঠে আসার জন্য যা কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন সবই আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো।

৫. আমরা উপজাতীয় অঞ্চল থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হবো।

৬. মনে হচ্ছে আমরা ১৫ই জুনের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারবো। কিন্তু এই তারিখ যদি আপনাদের পক্ষে সুবিধেজনক না মনে হয়—তবে আপনাদের প্রস্তাব পাঠান। (এই বিষয়ে আমি জানিয়েছিলাম, ১০ই জুলাই-এর আগে এটা হতে পারে না।)

৭. বার্লিন, ভারত, ইতালীর মধ্যে যোগাযোগের সঙ্কেতবার্তা Rice-এর পরিবর্তে হবে—সঙ্কেতবার্তা **Flying Boat** এবং **Flower.**

১৯৪৪-এর ২৫শে মে আমি কাবুল ছেড়ে এলাম ; উপজাতীয় অঞ্চলের কেন্দ্রে পৌঁছুলাম ৩১শে মে ; ৯ই জুন হাজির হলাম দিল্লীতে।

আগে জানানো খবরের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দিল্লীতে এলেন ১০ই জুন।

আমার কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে তিনি বললেন, সংবাদ ফাঁস হবার ব্যাপার নিয়ে আমি জার্মানদের যে উত্তর দিয়েছি তা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। জার্মানদের মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন এই বলে যে, অপরাধটা তাদের, অথচ সেই অপরাধের দায়িত্ব তারা আমাদের উপর চাপাতে চাইছেন।

বিমান অবতরণের প্রসঙ্গটিও আমাদের আলোচনায় উঠলো। স্থির হলো, কতকগুলো সুবিধা-অসুবিধার জন্য '১০ই জুলাই' তারিখটিও স্থগিত রাখার জন্য বার্লিনকে বলতে হবে। নতুন কোনো দিন নির্দিষ্ট হলো না। বিমান অভ্যর্থনার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ হবে তখন এ বিষয়ে বার্লিনকে জানানো হবে। এই জানানোর ব্যাপারে দেরী করা চলবে না।

স্বতন্ত্র দিল্লী ছেড়ে চলে গেলেন ; কথা দিয়ে গেলেন ১৪ই জুন ফিরে আসবেন। এই সময়ের মধ্যে তাকে বেতার-বার্তার সাহায্যে অবতরণের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট দিনটি বাতিল করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪ই জুন ফিরে এসে তিনি জানালেন তারিখ কেটে দেওয়ার সংবাদটি নূতন সঙ্কেতবার্তার সাহায্যে পাঠানো হয়েছে। বার্লিনকে একথাও জানানো হয়েছে যে, ভারত থেকে এ পর্যন্ত যেসব প্রস্তাব গেছে সবগুলোকেই এখন বাতিল বলে মনে করতে হবে। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি স্বতন্ত্রকে বললাম—জার্মানীর অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন এবং তাদের গোয়েন্দা সংগঠনের কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ছে। সুতরাং আমার এখন কাবুলে ফিরে যাওয়া দরকার, হয়তো জাপানী বন্ধুরা আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগও ঘটে নি।

১৫ই জুলাই স্বতন্ত্র আমাকে রিপোর্টটি দিয়ে সমস্ত বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললেন। ১৮ই জুলাই দিল্লী থেকে রওনা হয়ে আমি রাওলপিণ্ডিতে পৌছুলাম ১৯শে জুলাই। গাড়ী নিয়ে অনন্তরাম আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঐ দিনই আমি হাজির হলাম সওয়াব কিল্লাতে। সেখানে সানোবর হুসেন ও মুর্তজার সঙ্গে বসে পরবর্তী কর্মসূচী তৈরী

করে নিলাম। তাদের কাছে আমি জানতে পারলাম যে, আঠারো তারিখ (আমি ওখানে যাবার একদিন আগে) থেকে আফগান স্বাধীনতা দিবসের উৎসব শুরু হয়ে গেছে—এই উৎসব চলবে ২৮শে জুলাই পর্যন্ত। এই উপলক্ষে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা একটু বেশী হয়েছে—তাছাড়া দলে দলে পেশোয়ারী লোকও যাচ্ছে এই উৎসবে, সুতরাং এই মাস শেষ হবার আগে কাবুলে হাজির হলে সেটা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

আমরা তাই ২৮শে জুলাই রওনা হয়ে কাবুলে পৌঁছুলাম ১৯৪৪-এর ৩রা আগস্ট। জার্মান বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম ৭ই আগস্ট—তাকে রিপোর্ট আর তিনটি ঠিকানাও দিলাম। একই স্থানে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের দিন ঠিক হলো ১০ই আগস্ট।

এর মধ্যে মর্তজা অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল, তাছাড়া মচকে গিয়ে উরুটাও ফুলে উঠেছিল। ফলে, দেখা-সাক্ষাতের সময় ঠিক রাখা, কমরেডের সেবা করা, রান্নার কাজ চালানো—আমার একার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠলো। আমার নিজের শরীরও ভালো যাচ্ছিল না।

যাই হোক, ১০ই আগস্ট আমাদের জার্মান-বন্ধুর সঙ্গে আমি দেখা করলাম। তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্নের একটি তালিকা দিলেন আর সেই সঙ্গে দিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে আসা এক বার্তা। সম্ভব হলে আমি ওখানে থাকা কালেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে বললেন।

উত্তরসহ সেই প্রশ্নের তালিকা তার হাতে তুলে দিলাম ১২ই আগস্ট। উত্তরগুলো এই রকম :

প্রশ্ন : সরকারের সঙ্গে আপসের প্রসঙ্গে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর কোন্ কোন্ অনুগামী রয়েছেন ?

উত্তর : যাঁরা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর প্রতি যাঁদের গভীর বিশ্বাস আছে তাঁরা তো আছেনই—তাছাড়া শিল্পপতিরাও তাঁকে অনেকাংশে প্রভাবিত করছেন। অবশ্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, ভুলাভাই দেশাই, বি. জি. খের, এবং সি. রাজা-

গোপালাচারি—এঁদের মতো ব্যক্তিরাই একটা আপসের ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন ; অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও'র প্রচার এবং সংবাদপত্র থেকেও আপনারা একথা জেনে থাকবেন।

প্রশ্ন : মন্ত্রীদের মধ্যে কে কে এখনও আমার প্রতি বিশ্বস্ত ?

উত্তর : বর্তমান নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার কোনো মন্ত্রীই আপনার প্রতি বিশ্বস্ত নন। তারা সবাই পুরনো রাজভক্তের দলে। তারা সম্পদ বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন, সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাচ্ছেন এবং ব্রিটিশ প্রভুদের যুদ্ধনীতিকেই সমর্থন করছেন।

প্রশ্ন : নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী কি মন্ত্রী, না পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ? তিনি কি এখনও আমার প্রতি বিশ্বস্ত ?

উত্তর : তিনি মন্ত্রী নন—নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার তিনি পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন, সুতরাং তিনি এখনও অপনার অনুরাগী কি না বলতে পারি না।

প্রশ্ন : আমার দল কি সমগ্রভাবে বাঙলায় নাজিমুদ্দিন সরকারকে সমর্থন করেছে, না এই প্রশ্নে দলে কোনো ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে ?

উত্তর : সামগ্রিকভাবে আপনার দল নাজিমুদ্দিন সরকারকে সমর্থন করে নি। এই ব্যাপ্যারে বিভেদ দেখা দিয়েছিল এবং নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী আরও পাঁচজন সভ্যসহ দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : কলকাতা পৌরসভার বিগত নির্বাচনের ফলাফল কি ? বর্তমান মেয়র কে ? পৌরসভায় কোন দলের শক্তি বেশী ?

উত্তর : আপনার দল উনিশটি আসন দখল করেছে। কোন্ দলের শক্তি বেশী বা বর্তমান মেয়র কে এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ সংবাদ আমি পাই নি। কিছু আসন কম্যুনিস্টরাও দখল করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আপনাকে দেওয়া হবে বেতার-সংযোগ চালু হবার পরে।

প্রশ্ন : কোন্ বিশিষ্ট পার্টি সভ্যের কাছে আমি আমার প্রতিনিধিদের পাঠাবো ?

উত্তর : আপনার প্রতিনিধিদের কোনো পার্টি সভ্যের কাছেই সোজা-সুজি পাঠাবেন না। যে ঠিকানা আপনাকে দেওয়া হয়েছে আপনার লোকদের সোজা সেই ঠিকানায় পাঠাবেন। চালু সঙ্কেত-শব্দই তারা উচ্চারণ করবেন।

প্রশ্ন : ফজলুল হক্ কি এখনও বাঙলায় জনপ্রিয়? তাঁকে আমার অভিনন্দন জানিও—আমার ভবিষ্যৎ সমর্থন সম্পর্কেও তাঁকে আশ্বস্ত ক'রো।

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি এখনও জনপ্রিয়। আপনার প্রতিও তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি আমার আগের রিপোর্টেই জানিয়েছি যে, তিনি উপযুক্ত সময়ে তাঁর প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিতে পারবেন। আপনার অভিনন্দন-বার্তা তাঁকে পাঠিয়ে দেবো।

প্রশ্ন : সরকার সম্পর্কে শিখদের, বিশেষত শিখ-বাহিনীর মনোভাব কিরূপ?

উত্তর : ঠিক এই মুহূর্তে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারছি না। এটা এর সঙ্গে জড়িত কোনো কমরেডের কাছে পাঠানো প্রয়োজন।

প্রশ্ন : অক্ষশক্তির বেতার প্রচার কি ভারতে শুনতে দেওয়া হয়?

উত্তর : হ্যাঁ, তবে কোনো প্রকাশ্য স্থানে নয়।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান আমাদের দলের সভ্যেরা বেশী পছন্দ করেন?

উত্তর : বার্লিন সরকারের, টোকিও-র এবং সিঙ্গাপুরের বেতার অনুষ্ঠান তাদের ভালো লাগে কিন্তু বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার রীতির দিক দিয়ে সিঙ্গাপুরের অনুষ্ঠানই সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে আমি এই বার্তাটি পেয়েছিলাম :

"তোমার আগের রিপোর্টে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমার রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং সামরিক ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণভাবেই ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় অর্থে পরিচালিত। কেবলমাত্র অস্ত্র এবং অন্যান্য

সমরোপকরণের জন্য আমি জাপানীদের উপর নির্ভরশীল। ভারতে জাপ-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। জাপানীদের শপথ সম্পর্কে যদি আমার দৃঢ় প্রত্যয় না থাকতো তবে আমি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতাম না। ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে—তারা তাদের কথা রাখবে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। এ কথাটি সব সময়ে মনে রেখো, আমরা একা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে চূর্ণ করতে পারি না। সেই কারণেই জার্মানী, ইতালী ও জাপানের সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে, নইলে অন্তহীন দাসত্বকেই বরণ করে নিতে হবে।

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা ভারতে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। সেখানেই ঘটবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমাধি। মিঃ গান্ধীর সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করো: তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে এই বলে আশ্বস্ত করো যে, আমি ভারতের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছি। আমাদের মাতৃভূমির সম্মান হানি হয় বা স্বার্থ বিপন্ন হয় এমন কিছুই আমি করবো না।

"ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তোমাদের যে প্রচার চলেছে তাতে আমি খুশি হতে পারি নি। জাপানীদের অনুকূলে তাদের প্রভাবিত করলেই আমার সংগ্রামে প্রভূত সাহায্য করা হবে।

"ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সংবাদ যতটুকু জানতে পেরেছি—তাতে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে আমাদের বিজয় অনিবার্য। ভারতীয় বিমান বাহিনীতে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ বিরোধী অফিসার আছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো—তাদের এমনভাবে প্রভাবিত করো যাতে তারা তাদের প্লেন সহ আমাদের দিকে চলে আসেন। স্কোয়াড্রন লীডার নিরঞ্জনপ্রসাদ এখন চট্টগ্রামের কক্সবাজারে আছেন, ভারতীয় ব্রিটিশ বাহিনীর আরও কয়েকজন অফিসার—কমাণ্ডার মুখার্জিসহ স্কোয়াড্রন লীডার আওয়াক খুব সম্ভবত পেশোয়ারে আছেন, এছাড়া কোহাটে আছেন স্কোয়াড্রন লীডার জঙ্গমা। এরা তীব্রভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী—এদের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

"আমার সঙ্গে সোজাসুজি বেতার-সংযোগ স্থাপনের নির্দেশ পরে যাবে। আমি যেসব এজেন্ট ভারতে পাঠিয়েছি তাদের সবাইকেই 'সঙ্কেত-শব্দ' জানানো হয় নি—যদিও সকলকেই পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তারা বিশ্বাসযোগ্য বলেও প্রমাণিত হয়েছে। এই সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল তোমাদের সংগঠনকে রক্ষা করবার জন্য: এজেন্টদের উপর পুলিশী জুলুমের ফলে যদি কখনও গোপন কথা ফাঁস হয়ে যায় সেই কথা ভেবে; পরবর্তী মাসগুলোতে আমরা বাঙলায় এজেন্ট পাঠাবো—বিশেষ করে সিলেট, শিলং, কুমিল্লা, আগরতলা ও ঢাকায়। কলকাতায় আমার ভাইপোর কাছে যে এজেন্টকে পাঠিয়েছি সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। তাকে সবরকমে সাহায্য করো—বিশেষ করে আমার সঙ্গে বেতার-সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে। কান্তিলালের কাছে যে এজেন্ট এবং তার সঙ্গেই অন্যান্যদের কাছে যেসব এজেন্ট পাঠিয়েছি—তারা সবাই বিশ্বাসী। সম্ভবত ভারতের বিভিন্ন স্থানে তারা এখন কর্তব্যরত। তারা সিং সম্পর্কে রিপোর্ট ঠিক নয়। সে ভালো আর সৎ, যদিও চালাক-চতুর নয়।"

আমাদের জার্মান-বন্ধু আমাকে বললেন, গত নভেম্বরে যখন মিঃ রাসমাস কাবুলে ছিলেন তখন একজন রুশীয় তার কাছে এসে তাদের (অর্থাৎ জার্মানদের) কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেই রুশীয় ব্যক্তিটি মিঃ রাসমাসকে বলেছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যে জার্মানদের বেতার সংযোগ (সঙ্কেতলিপি এবং স্পন্দন-সংখ্যাসহ) রয়েছে একথা রুশ সরকার জানেন। শুধু তাই নয়, বিপ্লবীরা জার্মানদের কাছে যে সমস্ত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তার কপিও তারা পেয়েছেন। মিঃ জাগুমুল্লা আরও বললেন—এই কারণেই বার্লিন ও ভারত এবং কাবুল ও ভারতের মধ্যে বেতার-সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মাঝে মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে তা চালানো হচ্ছিল মাত্র।

আমি বললাম—'এই নতুন রহস্যসূত্রের কথা আজ আমাদের জানানো হলো। আমাদের অনুসন্ধানের কাজে এই সূত্রটি সাহায্য

করবে। আমাকে ভাববার জন্য কিছু সময় দিন।'

তিনি আমাকে বললেন, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপনের জন্য বার্লিন চেষ্টা করছে—এ বিষয়ে তারা পরীক্ষাও শুরু করেছে; তারা সফল হলে এই সংযোগসূত্র প্রসারিত হবে আমাদের কাছে। স্পন্দন-সংখ্যা প্রভৃতি বার্লিন মারফৎ আমাদের কাছে আসবে। ব্রহ্ম ও ভারতের মধ্যে একই গোপন সঙ্কেতলিপি ব্যবহৃত হবে। বার্লিন ও ভারতের মধ্যে (আমার ভারতে পৌঁছুবার পর) সঙ্কেত-শব্দ হবে 'Orient and Importance', ভারত ও বসুর মধ্যে সঙ্কেত-শব্দ হবে "Orient and Manuscript."

পরে মিঃ ইনোয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর কতকগুলি প্রশ্নসংবলিত একটি কাগজ এবং সেই সঙ্গে তাঁর একটি বার্তাও দিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসাপত্র

১. গান্ধীজির মুক্তির রাজনৈতিক কারণ। মণিপুরের সাম্প্রতিক ঘটনার সঙ্গে মুক্তির কোনো সম্পর্ক আছে কি? ব্রিটেন ও জাপান সম্পর্কে গান্ধীজির মনোভাব; তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

২. অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি-সম্ভাবনা কতটুকু? কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে আপসের সম্ভাবনা আছে কি? ভারতের বা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষে আপসনীতির পোষক কারা? তাদের নাম; গান্ধীজির অনুগামীদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ আছেন যারা ইংরেজ-ভক্ত হয়েছেন; যারা 'বিপ্লবপন্থার' দিকে ঝুঁকেছেন তাদের নাম।

৩. দিল্লী ও লণ্ডনের বেতার প্রচার দেখে মনে হয়, মণিপুরের অভিযানে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর যোগদানের ব্যাপারটা ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ গোপন রাখছেন। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর এই অংশ গ্রহণের প্রসঙ্গ ভারতের জনসাধারণ জানে কি? কংগ্রেস ও বিপ্লবীদলের উপরে মণিপুর অভিযানের প্রভাব, সাধারণভাবে ভারতের জনগণের উপর এর প্রতিক্রিয়া, যারা এই অভিযানকে অভিনন্দিত করেছেন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দলের নাম জানাও।

৪. ব্রিটেনের প্রতি এবং জাপানের প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোভাব কি? যদি জাপানের প্রতি বিরূপ মনোভাব থেকে থাকে তবে তার কারণ কি? ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের জেলাগুলিতে তারা যে ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষের ভক্ত, তার কারণ কি?

৫. মণিপুর অভিযান থেকে বাঙালীমনে জাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ; যদি ঐ প্রদেশের দিকে আমরা অগ্রসর হই তবে আমরা তাদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে পারি কি?

৬. আমাদের দলের সভ্যদের মধ্যে যারা বাঙলা প্রদেশের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত তাদের নাম—বিশেষ করে যারা আমার প্রতি বিশ্বস্ত তাদের নাম; নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী: তিনি কি যথার্থই বাঙলা প্রদেশের মন্ত্রীর পদে আছেন? তিনি কি এখনও আমার প্রতি অনুগত?

৭. আমার দল কি বঙ্গীয় আইন পরিষদে নাজিমুদ্দিন-মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাভ করেছে? ঐ মন্ত্রিসভায় যোগদানের ফলে দলের মধ্যে কোনো ভাঙন সৃষ্টি হয়েছিল কি?

৮. কলকাতার পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফল ও বর্তমান মেয়রের নাম কি?

৯. বাঙলায় আমাদের দলের যেসব নেতৃস্থানীয় সভ্য এখনও কারা-প্রাচীরের বাইরে আছেন তাদের নাম; বিশেষত যাদের কাছে আমি আমার প্রতিনিধিদের পাঠাতে পারি তাদের নাম।

১০. বাঙলার 'গোপন এজেন্টদে'র যে তালিকা তুমি পাঠিয়েছিলে—পাঠাবার পরে সেই তালিকায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তো?

১১. ফজলুল হক্ কি এখনও জনপ্রিয়? বাঙলা যখন ব্রিটিশ সেনার কবল থেকে মুক্ত হবে তখন তাকে প্রধানমন্ত্রী তোজোর সঙ্গে আবার যোগদান করতে অনুরোধ করো। তুমি তাকে অনুরোধ জানিও, আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন বাঙলায় অভিযান করবে তখন তাদের সহযোগিতা করবার জন্য তিনি যেন তার দলীয় সভ্যদের নির্দেশ দেন।

১২. আমরা সাধারণ মানুষের মন জয় করতে চাই, বিশেষ করে

পূর্ববঙ্গের চাষী-সম্প্রদায়কে আমাদের অনুকূলে আনতে চাই--এ সম্পর্ক কোন যথাযোগ্য পদ্ধতি অথবা প্রচার-ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো—সেই ব্যাপারে তোমার প্রস্তাব পাঠাও।

১৩. অকালি দল ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার পরে শিখদের উপরে এই দলের প্রভাব কি ক্ষুণ্ণ হয় নি? ব্রিটিশ সরকারের প্রতি শিখজাতি ও শিখসেনার মনোভাব কি?

১৪. গত এক বছরে কম্যুনিস্ট পার্টির জোয়ার-ভাটার ইতিহাস।

১৫. আমার প্রভাবের বিকাশ ও ক্ষয়ের বিশ্লেষণ।

১৬. আমার অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কিছু ঘটেছে কি? আমাদের পরিবার ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের বর্তমান অবস্থা কি?

১৭. গত নভেম্বরে তোমার কাছ থেকে তারা সিং সম্পর্কে একটি সংবাদ পেয়েছিলাম। এ-সম্পর্কে আমার উত্তর তুমি পেয়েছ কি? সে কি প্রয়োজনীয় কাজ করছে?

১৮. আমাদের সম্পর্কে কিষাণ সভার মনোভাব কি? সহজানন্দ এবং যাজ্ঞিক কি আমাদের পার্টিকে সমর্থন করছেন? মণিপুরের অভিযান সম্পর্কে তাদের কিরকম ধারণা?

১৯. তোমরা কি এখনও অক্ষশক্তির বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শোনবার অনুমতি পাও? অক্ষশক্তির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বেতারকেন্দ্রের নামগুলি কি? অক্ষশক্তির বেতার প্রচারের প্রভাব, সেই প্রভাবকে আরও জোরালো করে তোলার উপায়; ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ইয়োরোপ বা পূর্ব-এশিয়া থেকে অন্য প্রচার-নীতির উদ্ভাবন।

২০. ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন প্রবল প্রচারকে প্রতিরোধ করার জন্য, বিশেষত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে জাপ-বিরোধী প্রচারের বিরুদ্ধে বাইরের থেকে কোনো পাল্টা প্রচার ব্যবস্থা কি চালানো যায় না?

২১. পূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, অস্থায়ী সরকার, স্বাধীন ভারত, কিংবা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে মনে হয় ভারতীয় সেনাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই; এ সম্পর্কে কিছু

কাজ করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কোনো প্রচার-ব্যবস্থা কি ইতিমধ্যে অবলম্বন করা হয়েছে?

২২. ভারতীয় জনসাধারণ এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের শত্রুপক্ষ যে জাপ-বিরোধী প্রচারকার্য চালাচ্ছে সেই প্রচারের মূল বক্তব্য কি?

২৩. আমাদের গুপ্ত সংস্থাগুলির কার্যধারার বর্তমান অবস্থা; যেসব গোষ্ঠী বা দল আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাদের নাম।

২৪. যারা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কি কোনো প্রতিষ্ঠিত সংস্থা বা স্কুল আছে?

২৫. বোম্বের বিস্ফোরণ-দুর্ঘটনার কারণ ও উৎস। অন্যত্র এই দুর্ঘটনার প্রতিধ্বনি।

২৬. ভারতের ১৯৪২-এর গোলযোগ সম্পর্কিত ইঙ্গ-ভারতীয় সরকারের বিবরণে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনের উল্লেখ নেই কেন? ঐসব গোলযোগের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং প্রধান গোষ্ঠীর নামগুলি জানাও।

২৭. গত ডিসেম্বর মাস থেকে আমি যেসব প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম তারা আছে পাঞ্জাবে, যুক্ত প্রদেশে এবং বাঙলায়, তবু আমি আরও পাঠাতে চাই। তাদের সঙ্গে দয়া করে যোগাযোগ রেখো।

২৮. ভারতে বিপ্লবী কার্যকলাপ বৃদ্ধির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি?

২৯. ভারতে বিপ্লব ঘটানো সম্পর্কে তোমার পরিকল্পনার একটি রূপরেখা আমাকে জানাও। তাতে জানাও কি পরিমাণ সাহায্য ও সমর্থন আমাদের কাছে প্রত্যাশিত।

দলের প্রতি শ্রীবসুর বাণী

"ভারতের বাইরে স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। জাপানীদের দিক থেকে অবশ্য সাহায্য ও

সমর্থন আসছে কিন্তু এতে তাদের তরফ থেকে অনুমাত্র আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আভাস নেই। আমরা ভারতবাসীরা ধর্মমত নির্বিশেষে এক সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি, মুসলমানেরাও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে (আজাদ হিন্দ ফৌজ) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে পরিণামে ব্রিটিশের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটবে। কিন্তু মনে হয় যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। স্বদেশবাসিগণকে মহত্তর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ও উদ্যত থাকতে হবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রতিদিনই শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং এই বাহিনীর নারীশাখারও অতি দ্রুত বিস্তৃতি ঘটছে। মণিপুর, আসাম ও বাঙলার মুক্তাঞ্চলগুলিতে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে—ভবিষ্যতের প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও শেষ হয়ে গেছে। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সম্মুখীন হবার পর পরিণামে যে আমরাই বিজয়ী হবো, আমাদের এই প্রত্যয়কে আরও সুদৃঢ় করতে পেরেছি।”

দলীয় সভ্যদের প্রতি শ্রীবসুর নির্দেশ

১. যদি গান্ধীজির সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আপসরফা হয় তবে তাঁর এবং তাঁর জাতীয় সরকারের বিরোধিতা করতে হবে।

২. আমাদের সামরিক প্রস্তুতির অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে বিপ্লবী আন্দোলনকেও সংগঠিত করতে হবে, এবং কাজে ও প্রত্যেক পদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন, সহসা কিছু করা চলবে না।

৩. কারাবরণ এড়িয়ে চলতে হবে।

৪. সমরোপকরণের কারখানাগুলিতে অন্তর্ঘাতমূলক কর্মসূচীর প্রস্তুতি প্রয়োজন; তবে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ না করাই ভালো।

৫. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও উপজাতীয় অঞ্চলগুলিতে বিপ্লবী আন্দোলন অব্যাহত রাখা দরকার।

৬. বিমান কেন্দ্রগুলিতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মাধ্যমে শত্রুর বিমান শক্তিকে বিপর্যস্ত করতে হবে; শত্রু-বিমান ধ্বংস এবং শত্রু-বিমানের কর্মচারীদের হত্যা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

৭. ভারতীয় বিমান বাহিনীতে কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ-বিরোধী উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন। তারা তাদের বিমান নিয়ে যাতে আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন—তার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। মনে হয়, কক্সবাজারের স্কোয়াড্রন লীডার নিরঞ্জনপ্রসাদ ব্রিটিশ-বিরোধী।

৮. বাঙলায় একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপন করে আমার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তোমার কাবুলে অবস্থান কালেই এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে।

৯. তোমার টেলিগ্রাফের সঙ্কেতলিপি পুনর্বিন্যস্ত করে কাবুলের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন—ভবিষ্যৎ সামরিক অভিযানে এটি বিশেষ ফলদায়ক হবে।

আসাম ও বাঙলার অধিবাসীদের (মণিপুর রাজ্যসহ)
উদ্দেশে শ্রীবসুর নির্দেশ

১. জাপানী সৈন্য এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীকে যেহেতু ভয় করবার কোনো কারণ নেই সেইহেতু আপনারা আপনাদের ঘর ছেড়ে পালাবেন না; তারা যদি ভারতীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে—তাদের সাহায্য করবেন, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

২. ব্রিটিশ সেনারা আপনাদের অঞ্চল ছেড়ে যাবার সময় পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করবে—একে বাধা দিতে হবে।

৩. পলায়নরত ব্রিটিশ বাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধের সাহায্যে প্রতিহত করতে হবে।

৪. শত্রুপক্ষের রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কেন্দ্র, গোলাবারুদ, সমরোপকরণের গুদাম এবং তৈলাগারগুলিকে বিধ্বস্ত করে দিতে হবে।

৫. ভারতের মুক্তাঞ্চলগুলিতে স্বাধীন ভারত সরকারের যে প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

ভারতের এজেন্টদের কাছে বাণী পৌঁছে দেবার জন্য
শ্রীবসুর অনুরোধ

"১৯৪৩-এর শেষের দিকে আমার এজেন্টদের আমি ভারতে

পাঠিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে, কেউ-বা বাঙলায় আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তারা বেশ নিরাপদেই বহনযোগ্য বেতারযন্ত্র সহ ভারতে পৌঁছেছিলেন। তাদের কাজ ছিল আমার সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই—যদিও প্রথম সংযোগ স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট দিন ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। আমি তাই বিশেষভাবে তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি, যখন তুমি এজেন্টদের সন্ধান পাবে তখন তাদের কাছে আমার এই নির্দেশগুলি পৌঁছে দিও :

১. আমাদের সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ শুরু হবে ১৯৪৪-এর ১লা আগস্ট এবং তার পর থেকে।

২. বার্মা কেন্দ্র থেকে সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে কম্পনাঙ্কের নিম্নরূপ পরিবর্তন করে নিতে হবে :

ক) ৭২৫০ কিলো সাইকল্‌স্‌-এর পরিবর্তে ৮২০০ কিলো সাইকল্‌স্‌।

খ) ৬২০০ কিলো সাইকল্‌স্‌-এর পরিবর্তে ৬৫০০ কিলো সাইকল্‌স্‌।

৩. তোমাদের গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ-তার (অ্যানটেনা) রেঙ্গুনের অভিমুখে সমান্তরাল রাখতে হবে। কিন্তু জাপানী যন্ত্র ব্যবহার করার সময় অ্যানটেনাকে রেঙ্গুনের অভিমুখের সঙ্গে 45° কোণে আনত রাখতে হবে। এই সময় ভূমি-তারটি থাকবে অ্যানটেনার বিপরীতমুখী।

৪. তোমাদের সংবাদ প্রেরণের কেন্দ্রগুলি রেঙ্গুনের যত কাছাকাছি স্থাপিত হয় ততই ভালো ; কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় যদি তা করতে না পারো, তবে কলকাতার কাছেই তার ব্যবস্থা রেখো।

পুনশ্চ : তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, এই নির্দেশ পাওয়ামাত্র তারা যেন আমাকে টেলিগ্রামে এর স্বীকৃতি জানায়—তার সঙ্গে থাকবে আমার প্রেরিত বাণী ও নির্দেশের প্রাপ্তিস্বীকার। তা হবে এই রকম :

i) আমার প্রশ্নাবলী

ii) দলের প্রতি আমার বাণী

iii) দলের সভ্যদের প্রতি আমার নির্দেশ

iv) আসাম ও বাঙলার অধিবাসীদের (মণিপুর রাজ্যসহ) উদ্দেশে আমার নির্দেশ।”

উপরোক্ত বাণী ও প্রশ্নমালা আমার হাতে দিয়ে মিঃ ইনোয়ে আমাকে বললেন, তিনি টোকিওকে জানিয়েছেন যে তিনি আমাকে তার আশ্রয়ে (তার নিজের গৃহে) রাখতে যাচ্ছেন—অবশ্য টোকিও থেকে অন্য কোনো নির্দেশ না আসা পর্যন্ত। তিনি আমাকে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বললেন। আমি বললাম—আমার কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা না করে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া বিষয়টিও দীর্ঘ—উত্তর দিতে অনেক সময় লাগবে।

তবু আমি মুখে মুখে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলাম, কথা দিলাম ভারত থেকে ফিরে বাকী প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব। তিনি আমার দেওয়া উত্তরগুলো লিখে নিলেন। একটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিয়েছিলাম—তা হলো এই যে ‘সঙ্কেতশব্দ’ ছাড়া লোক পাঠানো ঠিক হবে না এবং তাদের কাছে যে ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সেই ঠিকানাতেই তাদের আসার নির্দেশ দিতে হবে।

১৫ই আগস্ট মিঃ ইনোয়ে আমাকে বললেন—টোকিও থেকে একটা সংবাদ এসেছে, তাতে আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্দেশ পাঠানো হয়েছে একজন জাপানী মন্ত্রীর মারফৎ; তিনি মস্কো হয়ে কাবুলে আসছেন। আশা করা যায় যে, তিনি ৩১শে আগস্ট কাবুলে এসে পৌঁছুবেন; সুতরাং সেদিন পর্যন্ত আমাকে কাবুলে থাকতে হলো।

১৯৪৪-এর ১৬ই আগস্ট মিঃ ইনোয়ে আমার সঙ্গে পুনর্বার আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—“আমাদের মতে যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় নিশ্চিত।

“দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে আমাদের সুবিধেই হবে। যদি ইয়োরোপে যুদ্ধ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহলে আমাদের পক্ষে ভালোই হবে; যদি

তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাহলেও আমাদের ভাববার কিছু নেই।

"এক দিকে ব্রিটেন ও আমেরিকা, অন্যদিকে রাশিয়া—এই দুই পক্ষের মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হবে বলে আমরা আশা করছি। আমাদের পক্ষে সেটা বিশেষ সুবিধার কথা। ইয়োরোপের দেশগুলি রাশিয়ার প্রভাবাধীনে চলে যাবে। রাশিয়ার ভীতি ব্রিটেন ও আমেরিকাকে বাধ্য করবে তাদের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে ইয়োরোপে বহাল রাখতে। তার ফলে এশিয়ায় যুদ্ধ করবার মতো সৈন্যের ঘাট্‌তি পড়বে। অন্যদিকে রাশিয়া বেশী আগ্রহী হবে ইয়োরোপীয় দেশগুলির পুনর্গঠনের কাজে। তাই তার সমস্ত কর্মশক্তি ও মানবশক্তি ঐখানেই ব্যবহৃত হবে। এশিয়ার যুদ্ধে রাশিয়া নাক গলাবে এমন আশঙ্কা আমরা করি না।"

চীন সম্পর্কে তিনি বললেন :

"ওয়াঙ্‌ চিঙ্‌ ওয়াই আমাদের প্রয়োজনের দিক থেকে কিছু নন। তিনি তার স্বপক্ষে শক্তিগুলিকে, বিশেষ করে যুবশক্তিকে একত্র সংহত করতে পারেন নি—কিছু সামন্ততান্ত্রিক লোকজন তার সঙ্গে ছিল এইমাত্র।

"চিয়াঙ্‌ কাইশেককে আমরা যে স্বপক্ষে আনতে পারি নি, এটা আমাদের চরম ব্যর্থতা। এর থেকেই কম্যুনিস্টরা চীনা বাহিনীকে আমাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এখন তারা খুবই শক্তিমান—কম্যুনিস্টরাই এখন আমাদের ভয়ের প্রধান কারণ।

"আমাদের রণনীতির পরবর্তী পদক্ষেপ হবে চীনকে চরম ভাবে চূর্ণ করে দেওয়া, যাতে মিত্রশক্তি জাপানের নিকটবর্তী কোনো জমির ভিত্তি (বিমানঘাঁটি প্রভৃতি) খুঁজে না পায়। ইতিমধ্যেই আমরা অনেক পরিমাণে জয়লাভ করেছি। সমস্ত রেলপথই আমরা অধিকার করেছি; যে সমস্ত বিমানঘাঁটি থেকে আমেরিকানরা আমাদের শহরের উপরে বোমা বর্ষণ করতো—আজ সেই সব ঘাঁটি আমাদের দখলে। সাংহাই থেকে ব্যাঙ্কক এবং ব্যাঙ্কক থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত আমরা একটা রেলপথ নির্মাণ করছি। এরই মধ্যে অনেক-

খানি কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

"এ পর্যন্ত যেসব ভূমি বা অঞ্চল আমরা অধিকার করেছি ইতিমধ্যেই সে-সব সুরক্ষিত করা হয়েছে—এর মধ্যে আছে চীনের কিছু অংশ, মালয়, জাভা ও ব্রহ্ম। আমরা মনে করি মিত্রশক্তিকে পরাজিত করে শেষ পর্যন্ত আমরাই যুদ্ধে জয়ী হতে পারবো।"

মিঃ ইনোয়ে এইভাবে তাদের দীর্ঘ পরিকল্পনার রূপরেখাটি তুলে ধরলেন :

"রাশিয়া তার স্বপক্ষে সমস্ত ইয়োরোপকে জয় করে একটা বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হবে। আমরা সেই শক্তিকে ব্যর্থ করতে চাই এশিয়ার সমবৃহৎ দেশগুলোকে আমাদের পক্ষে এনে—যেমন জাপান, চীন, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারত। অবশ্য এতে ভেবে নেওয়া হচ্ছে যে, ভারত পাশ্চাত্য জাতির জোয়াল থেকে মুক্ত হয়েছে। ভারত যদি স্বাধীন না হয় এবং এশীয় জোটের সঙ্গে যোগদান না করে—তবে সমস্ত এশীয় জাতির কাছে সর্বক্ষণ একটা রুশভীতি থেকেই যাবে। এই কারণেই ভারতকে আমরা তার স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করতে আগ্রহী।

"এমনকি, রাশিয়ার পরিবর্তে জার্মানী যদি যুদ্ধে বিজয়ী হয় তাহলে জার্মানীর সঙ্গেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। সুতরাং যে কোনো অবস্থাতেই হোক আমাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যই সমস্ত এশীয় জাতির একটা সুসংহত জোট গঠন করা প্রয়োজন।"

তোজোর পদত্যাগ সম্পর্কে তিনি বললেন, তোজোকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তার কারণ :

ক) সামগ্রিকভাবে সমস্ত শক্তিকে সংহত করার কাজে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিশেষত নারী-শক্তিকে তিনি প্রস্তুত করতে পারেন নি।

খ) তাঁর আমলে সাইফানের পতন ঘটে।

গ) চীনের যুদ্ধে তাঁর ভ্রান্ত রণনীতি গ্রহণ। তবু আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে তিনি ফিরে আসবেন। বর্তমানে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন :

"এ আশঙ্কা আমরা করি না যে, রাশিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এমন কি রাশিয়া যদি কোনো দাবী জানায় তবে আমরা যথাসাধ্য তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করবো।

"আমাদের এক বিশাল নৌবাহিনী রয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার আগে এবিষয়ে পৃথিবীতে আমরা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিলাম, ইংলণ্ড ছিল প্রথম। কিন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইংলণ্ড এই শক্তির অনেকখানি হারিয়েছে, আমরা এ পর্যন্ত খুব সামান্য অংশই হারিয়েছি। আমাদের ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে যদিও আমেরিকা খুব ফলাও করে প্রচার চালাচ্ছে, তবু প্রকৃত সত্য এই যে, আমরা নৌযুদ্ধে নামি নি—শুধু আত্মরক্ষামূলক ভূমিকাই গ্রহণ করেছি, তাই আমাদের ক্ষতিও সামান্য। আমাদের আদি নৌবাহিনীর অধিকাংশই আজও অটুট আছে—ইতিমধ্যে এটি আরও বড় আকার ধারণ করেছে, আর আমেরিকা হচ্ছে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন।

"অবশ্য আমাদের দুর্বলতা ছিল বিমান বাহিনীতে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে বিমান নির্মাণের জন্য আমাদের কোনো বিমান কারখানা ছিল না। আমাদের শুধু ছিল যন্ত্রাংশ জোড়া লাগাবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। যুদ্ধের প্রথম বছরে উৎপাদনের হার ১০০ ধরলে দ্বিতীয় বছরে তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৫০০ ভাগ। বর্তমান এই উৎপাদন উঠেছে চরমশীর্ষে, অর্থাৎ মূল সংখ্যার তেরো গুণ। আমি আমাদের সংখ্যাগত শক্তি সঠিক জানি না, কিন্তু যদি আমরা আমাদের উৎপাদন-পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে পারি তবে এই বছর শেষে এ-ক্ষেত্রেও আমাদের ভয়ের কারণ কিছু থাকবে না। অন্যান্য উৎপাদন-পরিকল্পনাগুলিও যথা সময়ে রূপায়িত হচ্ছে—সুতরাং এই বছর শেষ হওয়ার আগে আমরা এমন অবস্থায় আসবো যে দীর্ঘকালের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবো। ১৯৪৪ সালটা আমাদের কাছে ছিল খুবই সঙ্কটজনক, কিন্তু মনে হচ্ছে এখন আমরা বহুলাংশে বিপদ কাটিয়ে উঠেছি।"

মিঃ ইনোয়ে জানতে চাইলেন—জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির আক্রমণের রণনীতিটা কি?

আমি উত্তর দিলাম: আমার মতে মিত্রশক্তি ইন্দো-বার্মা রণাঙ্গনে খুব বড় রকমের কোনো স্থলযুদ্ধে নামবে না; অবশ্য, আমার এই মত গঠিত হয়েছে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। এর পরিবর্তে তারা নামবে ভীষণ নৌযুদ্ধে: এই যুদ্ধে সাহায্য করবে তাদের বিমানশক্তি। এই জন্যই তারা তাদের নৌবহরকে শক্তিশালী করছে; কিন্তু ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে, কারণ, এই উদ্দেশ্যে আগে তাদের বিমান-বাহিনীর পরিপূর্ণ শক্তি সংগ্রহ করতেও পারা চাই। প্রথমেই তারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করতে চেষ্টা করবে—একই সঙ্গে তারা দক্ষিণ মৌলমিনে এবং উত্তর মালয়-এ নামবার চেষ্টা করবে, ব্যাঙ্ককে বিচ্ছিন্ন করাই তাদের উদ্দেশ্য। ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করার সময় তারা যে-কৌশল গ্রহণ করেছিল এখানেও তাই করবে। আন্দামান অধিকার করলে সমুদ্রপথে বার্মায় সরবরাহ পথ বন্ধ হবে, আর ব্যাঙ্কক অধিকার করলে স্থলপথে বার্মায় সরবরাহ পথ নষ্ট হয়ে যাবে।

তিনি ভাবলেন, আমার এই উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের সমরদপ্তরের রণনীতিকে সাহায্য করতে পারে; তাই তিনি অফিসের দিকে ছুটে গেলেন এ-সম্পর্কে তার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

পরে আমি মিঃ ইনোয়ে এবং আরও তিনজন জাপানী বন্ধুকে বলেছিলাম: "ইতালীও আমাদের মিত্র ছিল; কিন্তু এখন সে আত্মসমর্পণ করেছে এবং এটা খুবই সম্ভব যে, ইতালী আমাদের গুপ্ত তথ্য সবই ব্রিটিশ ও সোভিয়েতের কাছে তুলে দিয়েছে। বর্তমান অবস্থা দেখে বিচার করলে মনে হয় জার্মানীও মুখ-থুবড়ে পড়তে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে জার্মানীও সব সংবাদ ওদের কাছে সরবরাহ করবে। এটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক—বিশেষত আমাদের পক্ষে; কেননা সংগ্রামের পথে আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে। সুতরাং আমার প্রস্তাব এই, আমরা যে নূতন সম্পর্ক বা নূতন বেতার-সংযোগ ইত্যাদি গড়ে তুলছি, তার কথা বাইরে

কোথাও যেন প্রকাশ না করি।

তারা আমার প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। তারা মন্তব্য করলেন, প্রকৃতপক্ষে তারাও এই প্রস্তাব করতে চেয়েছিলেন, সঙ্কোচের জন্যই করতে পারছিলেন না। আমি বললাম, "বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের সঙ্কোচবোধের কোনো কারণ নেই—ভবিষ্যৎ বিপদ বা তিক্ততা এড়িয়ে যেতে হলে আমাদের সব কথা খোলাখুলি বলাই প্রয়োজন।"

কিছুক্ষণ পরে মিঃ জাগুমুল্লা এলেন। তিনি আমাকে জানালেন, বার্লিন থেকে আমার জন্য কোনো বিশেষ নির্দেশ তিনি পান নি। এখন সব নির্দেশ দেবে জাপান এবং সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি বললেন—আমি দিল্লীতে পৌঁছে বেতারের নতুন সঙ্কেত অনুযায়ী যেন বার্লিনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আবার আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, সেই গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও আমাদের তদন্ত করা দরকার। আমি কথা দিলাম—করবো।

আমি তার কাছে ইয়োরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—জার্মানীর জয় সুনিশ্চিত। যদিও অবস্থা এখন সঙ্কটজনক, তবু তারা রণাঙ্গনের সংখ্যা কমিয়ে আনতে পেরেছেন এবং সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে সৈন্য-সংগঠন তৈরী করে নিতে পেরেছেন, তাই অবস্থা এখন উন্নতির দিকেই যাচ্ছে। হিটলারের জীবননাশের চেষ্টার অর্থ এই নয় যে, জনগণের উপর তার প্রভাব কমেছে।

তিনি আমাকে অনুরোধ জানালেন, যদি সম্ভব হয় তবে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি যেন একবার কাবুলে যাই। তারপর তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তিনি চলে যেতেই আবার ঘরে এলেন সেই চারজন জাপানী। সদ্য মস্কো-প্রত্যাগত জাপানী মন্ত্রী টোস্ট প্রস্তাব করার আগেই একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, "ইয়োরোপীয় যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ছায়াচ্ছন্ন ; এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শীঘ্র হোক কিংবা বিলম্বে হোক, জার্মানীকে যুদ্ধে হারাতে হবে। কিন্তু তাতে যেন আমরা নিরুৎসাহ

না হই। আমরা ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির কবল থেকে এশিয়াকে মুক্ত করবো—এই শপথই গ্রহণ করেছি, সেই শপথ আমরা পালন করবো। আমাদের সমরনীতির কোনো পরিবর্তন হবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো এবং পরিণামে জয়লাভ করবো। এশিয়াকে মুক্ত করার শপথের মধ্যেই ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটা শুধু আমাদের নৈতিক কর্তব্য নয়—ভারতকে যে আমরা সাহায্য করবো তা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই প্রয়োজন। আমি তাই আশা করি এবং প্রত্যাশা করি যে এর বিনিময়ে ভারতের মুক্তি-পরিকল্পনায় আমরা ভারতীয়দের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবো।"

এর উত্তরে আমিও একটি বক্তৃতা দিলাম। তাতে আমি বললাম, "আমি নিজের থেকে কোনো শপথ বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে পারি না। আমি আশা করি, আপনাদের নেতৃবর্গের আগেই আমার নেতা এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। ভারত থেকে যত প্রকার সাহায্য সম্ভব তা দেওয়া আমার, নেতার এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও কর্তব্য। আমি আপনাকে এই বলে আশস্ত করতে পারি যে, আমরাই ভারতে একমাত্র ব্রিটিশ-বিরোধী অটল বিপ্লবীদল। আপনাদের সাহায্য করার কোনো বাধ্যবাধকতা আমাদের নেই, কিন্তু বিদেশীর দাসত্ব থেকে স্বদেশের মুক্তি সাধনের জন্য সেই সাহায্যদান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।"

চলে যাবার আগে মন্ত্রী-মহোদয় আমাকে বলেছিলেন—মিঃ ইনোয়ে একজন মহান ব্যক্তি, অতীতে তিনি বড় বড় কাজ সাফল্যের সঙ্গেই করেছেন। তিনিই রশিদ আলি গ্যালানিকে পারস্য থেকে তুরস্কে এবং সেখান থেকে জার্মানীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কওয়াসাকিও ছিলেন এমনিই এক দৃঢ়চেতা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি জেরুজালেমের গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তিকে পারস্য থেকে তুরস্কে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর কওয়াসাকি আমাকে দু'টো দলিল দিলেন। যথা:

ক) মিঃ বোসের বাণী, তারিখ ২৮শে জুন, ১৯৪৪।

খ) স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী সম্পর্কে সামরিক তথ্য সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী।

এছাড়া বেতার-সংযোগ, সঙ্কেতলিপি, সঙ্কেতশব্দ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি টাইপ করা নির্দেশপত্র, আর সঙ্কেতলিপি ও সঙ্কেতলিপি পাঠোদ্ধারের একটি বইও এতে ছিল।

কওয়াসাকি আমাকে বলেছিলেন যে, আমি যেন সমস্ত কাগজপত্র ভালো করে পড়ি—সঙ্কেতশব্দ বা লিপিও যেন বুঝে নিই—যদি ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তিনি পরদিন এসে বুঝিয়ে দেবেন। তিনি সিটোকে নিয়ে চলে গেলেন, আমি রয়ে গেলাম ইনোয়ের সঙ্গে।

আমার উদ্দেশে শ্রীবসুর বাণী এই রকম ঃ

রেঙ্গুন, ২৭শে জুন, ১৯৪৪

১. তুমি আমার বার্তার জন্য অপেক্ষা না করে বাড়ী চলে গিয়েছিলে—এতে আমি দুঃখিত।

২. আমার বেশ কিছু সংখ্যক এজেন্ট এখন ভারতে আছে। প্রকাশ হয়ে যাবে এই ভয়ে আমি তাদের কোনো সঙ্কেতশব্দ দিই নি। তুমি তাদের সন্ধান করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

৩. ভবিষ্যতে আমি আরও এজেন্ট পাঠাতে চেষ্টা করবো—তারা ভারতে আমার দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেইখানেই কাজ করবে।

৪. সম্প্রতি যেসব ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের ধরে আনা হয়েছে তাদের কাছ থেকে এবং রণাঙ্গনে যেসব দলিলপত্র আমরা দখল করেছি সেইগুলি দেখে বোঝা যায় যে, ভারতে জাপ-বিরোধী প্রচার অত্যন্ত প্রবল। আমার ধারণা, এই জাপ-বিরোধী প্রচারকে প্রতিহত করার জন্য তুমি তেমন কিছু করে উঠতে পারছো না।

৫. সম্প্রতি ধৃত যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্য বিভাগে প্রচারকার্য একেবারেই সফল হয় নি। পূর্ব এশিয়া থেকে আমাদের পরিচালিত বেতারকেন্দ্রের প্রবল প্রচার সত্ত্বেও—পূর্ব এশিয়ায় আমাদের ক্রিয়াকলাপ এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে সংবাদ ভারতীয় সৈন্য বিভাগের কর্মচারী

মহলে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। যেহেতু তুমি ভারতে থেকে আমাদের রেডিও অনুষ্ঠান শুনতে পাচ্ছ, সেইহেতু তোমার পক্ষেই সহজ হবে আমাদের সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া—জনসাধারণের মধ্যে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। আমাদের সংবাদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তুমি যথাসাধ্য করবে।

৬. আরও একটি প্রয়োজনীয় কাজ তোমাকে করতে হবে, সেটি ভারতীয় বিমানবাহিনীতে প্রচারের ব্যবস্থা। এ কাজ তোমার পক্ষে কিছুটা সহজ হবে, কেননা ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্মচারীদের সংখ্যা খুব বেশী নয়—তাছাড়া ঐ বিভাগে যারা আছেন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত ব্যক্তির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী।

৭. তোমার একান্ত কর্তব্য হচ্ছে ভারতে জাপ-বিরোধী প্রচারকে প্রতিহত করা। তুমি যদি ভারতে জাপানীদের অনুকূলে মনোভাব গড়ে তুলতে পারো তবে আজাদ হিন্দ ফৌজও ভারতের জনসাধারণের কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠবে।

৮. মণিপুর ও আসামে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী মোটামুটিভাবে ব্রিটিশের হয়ে কঠোর যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে গুর্খা সৈন্যও আছে। এটা দেখে মনে হয় জাতীয়তাবাদী প্রচার এদের যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারে নি।

৯. মণিপুর ও আসামের ভারতীয় সৈন্যদের সম্ভবত তোমার পক্ষে প্রভাবিত করার সময় পার হয়ে গেছে। কিন্তু পিছনে যে ভারতীয় বাহিনী আছে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা তুমি করতে পারো—যেমন শিলং, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে। খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই এই প্রচারের কাজ তুমি শুরু করে দাও।

১০. মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা করো—যাতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতার কাজ চালিয়ে যান, কোনো আপসরফার কাছে আত্মসমর্পণ না করেন, সে-সম্পর্কে তাঁকে প্রভাবিত করো।

১১. আমাদের সামরিক অভিযান সম্পর্কে যাতে ভারতে আরও

সহানুভূতির ভাব জেগে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে তুমি তোমার প্রচারের কাজে নিম্নরূপ যুক্তি প্রয়োগ করতে পারো :

ক) পূর্ব এশিয়ার সমগ্র স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয় অর্থে ও ভারতীয় সহায়-সম্পদে পরিচালিত হচ্ছে।

খ) আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত। এই সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা ভারতীয়, সৈন্যগণ ভারতীয়দের দ্বারা প্রশিক্ষিত—তারা রণাঙ্গনে ভারতীয় নেতাদের পরিচালনায় যুদ্ধ করছে।

গ) ভারতে আমাদের স্বদেশবাসীদের সাহায্যের পরিমাণ যত বাড়বে, জাপানী সাহায্যের প্রয়োজন তত কমবে। যদি ভারতীয়রা নিজেদের যুদ্ধ নিজেরাই চালাতে পারে, নিজেদের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে—জাপানের তাতে আনন্দের সীমা থাকবে না। আমরা—ভারতীয়রাই জাপানকে অনুরোধ করেছি আমাদের সামরিক সাহায্য দিতে—শুধু সেই কারণেই জাপানী সৈন্য এখন ভারতে যুদ্ধ করছে।

ঘ) বার্মা ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে জাপান তার অকৃত্রিমতার ও আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছে। জাপান তার একাত্মতার সাক্ষ্য রেখেছে ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী ভারত সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে।

ঙ) ভারতের কোনো অঞ্চল ব্রিটিশের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া-মাত্রই সেখানে 'আজাদ হিন্দ'-এর অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

চ) 'আজাদ হিন্দ্'-এর অস্থায়ী সরকার ইতিমধ্যেই তার নিজস্ব ডাকটিকিট প্রচলন করেছে। অস্থায়ী সরকারের টাকার নোট এখন মুদ্রিত হচ্ছে —অদূর ভবিষ্যতে মুক্তাঞ্চলগুলিতে তার প্রচলনের ব্যবস্থা হবে। ভারতে অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'স্টেট ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে।

১২. পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়গণ ভারতে দীর্ঘ সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। তাই তাদের সমগ্র সহায়-সম্বল একত্রিত করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সারা পূর্ব এশিয়া জুড়ে

ভারতীয়গণ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার অকাতরে দান করে যাচ্ছেন—দলে দলে ভারতীয় যুবকেরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করতে এগিয়ে আসছেন। এইভাবে মানুষ, অর্থ ও উপকরণ একত্রিত করার কাজ চলতেই থাকবে—যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়—যতদিন ভারত সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হয়।

১৩. এই মর্মেও তোমাকে প্রচার চালাতে হবে যে, আগামী একশ বছরের মধ্যে এই যুদ্ধই আমাদের স্বাধীনতা লাভের একমাত্র সুযোগ। তাছাড়া এই যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কখনও স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা আমাদের হাতে তুলে দেবে না। ব্রিটেনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ এবং সম্মানজনক বোঝাপড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা যদি স্বাধীনতা চাই তবে এখনই তা ছিনিয়ে আনার জন্য যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে।

১৪. ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের অভিনন্দিত করা উচিত। আমাদের শত্রুপক্ষ এখন দীর্ঘকাল ধরে ইয়োরোপে ব্যস্ত থাকবে এবং ভারতে নতুন করে সৈন্য পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং 'লৌহ উত্তপ্ত থাকতে থাকতেই আমাদের আঘাত করতে হবে।'

১৫. এশিয়ার পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে এতই অনুকূল যে, ইয়োরোপের যুদ্ধে জার্মানীর জয় কিংবা পরাজয় ছাড়াও আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে পারি। সুতরাং ইয়োরোপে কি হবে, না হবে—তাই নিয়ে মাথা ঘামানো আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

১৬. ব্যক্তিগতভাবে আমার অভিমত—ইয়োরোপে জার্মানীর পরাজয় হতে পারে না।

১৭. বাঙলা বা আসামের কোনো কেন্দ্র থেকে বেতারের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা তোমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই কাজটি তোমাকে অবিলম্বে করতে হবে—তা না হলে কাজের গুরুতর ক্ষতি হবে।

১৮. আমাদের সামরিক অভিযানকে সার্থক করে তোলার জন্য তোমার কাছ থেকে নিম্নরূপ সাহায্য চাই :

ক) বাঙলা ও আসামে শত্রুসৈন্য সম্পর্কিত সামরিক তথ্য।

খ) সম্মুখ সারির পিছনে, অর্থাৎ বাঙলা ও আসামে অন্তর্ঘাত-মূলক কর্মতৎপরতা। এর অর্থ—যোগাযোগ-সূত্র ছিন্ন করা, গোলা-বারুদ ও পেট্রলের ভাণ্ডারগুলি উড়িয়ে দেওয়া এবং যে উপায়ে সম্ভব —শত্রুর বিমানবাহিনীকে ধ্বংস করা।

গ) ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ধ্বংসমূলক প্রচার।

ঘ) আমাদের সামরিক অভিযানের ক্রম-অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করতে হবে।

১৯. যদি বেতারে আমাদের কাছে সংবাদ পাঠাতে ব্যর্থ হও তবে সংবাদসহ স্থলপথে লোক পাঠাবে।

২০. ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দলের লোক যাতে প্রবেশ করতে পারে তার ব্যবস্থা করো। এমন লোক—যারা উপযুক্ত সুযোগ এলেই আমাদের দিকে চলে আসবে।

২১. ব্রিটিশ পক্ষ এখন বর্বরোচিত উপায়ে জাপ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, ভারতীয়দের মধ্যে জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। এই প্রচারের বিরুদ্ধেও তোমাকে প্রত্যাঘাত করতে হবে। একটি উপায়ে তুমি তা করতে পারো—তুমি ভারতের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিও, বিগত বিশ্ব-যুদ্ধেও ব্রিটিশরা জার্মানদের বিরুদ্ধে নৃশংস প্রচার চালিয়েছিল—কিন্তু যুদ্ধের শেষে দেখা গিয়েছিল—সেই প্রচার সর্বৈব মিথ্যা।

২২. ১৯৪৪-এর মে মাসের শেষ সপ্তাহে দিল্লী বেতারকেন্দ্র থেকে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে, আমার দ্বারা প্রেরিত বারো জন লোক বেলুচিস্তান হয়ে ভারতে এসে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। আসাল নূর খান্ নামক জনৈক পাঠান এই দলটিকে পরিচালনা করে। তুমি কি খোঁজ নিয়ে জানতে পারবে—এই বারো জন লোক কি স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল অথবা ব্রিটিশরা হঠাৎ এদের গ্রেপ্তার করার পর জোর করে স্বীকারোক্তি

আদায় করে নেয়? বারো জন লোকের এই দলে সইফুর রেহ্‌মান নামে একজন ছিল, সে পেশোয়ারের আব্বাস খানের ভাই।

২৩. আব্বাস খানকে খবর দিয়ো—তার যে ভাই লিবিয়াতে ছিল সে এখন ইয়োরোপে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে আছে। আর এক ভাই—সইফুর রেহ্‌মানকে মার্চ মাসে আমি ডুবোজাহাজে ভারতে পাঠিয়েছিলাম—সে ছিল আসাল নূর খানের দলে।

২৪. আমাদের সামরিক অভিযানের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে যেয়ো—তোমাদের প্রচার এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজ তারই সঙ্গে তাল রেখে চালিও।

২৫. সীমান্তের কতকগুলি উপজাতিকে উত্তেজিত করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোনো বিশৃঙ্খলা তুমি কি সৃষ্টি করতে পারো না? এই জাতীয় হাঙ্গামা আমাদের অভিযানকে অপ্রত্যক্ষ-ভাবে হলেও সাহায্য করবে।

২৬. বাঙলার কমরেডদের জানিয়ে দিয়ো যে আমি শীগ্‌গিরই বাঙলায় এজেন্ট পাঠাচ্ছি—তবে সেখানে পৌঁছুতে তাদের কিছুটা সময় লাগবে।

২৭. মণিপুরের মহারাজার কোনো সংবাদ আছে কি? তিনি কি ব্রিটিশের অনুরাগী, না বিরোধী?

২৮. আরাকানে, মণিপুরে এবং আসামে শত্রু-সৈন্যের মোকাবিলা করে আমাদের শেষ জয়লাভ সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হয়েছি। দীর্ঘ এবং কঠোর সংগ্রাম আমাদের সামনে, একথা আমরা জানি। তবু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পরিণামে আমরা জয়লাভ করবোই।

মন্তব্য: ব্যক্তিগতভাবে কিংবা বেতার-সংযোগের মাধ্যমে আর. কে. (ভগৎরাম)-র সঙ্গে যোগাযোগ যদি অসম্ভব হয় তবে অন্য উপায়ে তার সন্ধান করে আমার এই নির্দেশগুলো তার হাতে পৌঁছে দেবেন।

সুভাষচন্দ্র বসু

পরদিন, অর্থাৎ ১৯৪৪-এর ৩রা সেপ্টেম্বর, ভোরে মিঃ ইনোয়ে

আমাকে কতকগুলো প্রশ্নসংবলিত একটি কাগজ দিলেন—প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাকে আগামী রিপোর্টের সময় দিতে হবে।

১. (ক) বিমান, ট্যাঙ্ক, সশস্ত্র গাড়ী ও মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশ জোড়া দেওয়া এবং মেরামতির ক্ষমতা কিরূপ ?

(খ) গোলা-গুলি-বারুদ, কামান, গ্রেনেড প্রভৃতির উৎপাদনের পরিমাণ।

(গ) ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ম উৎপাদনের পরিমাণ।

(ঘ) উক্ত দ্রব্যগুলির আমদানী ও রপ্তানীর অবস্থা।

২. (ক) যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য যে কারখানাগুলি আছে তাদের প্রতিষ্ঠার সময় ও তারিখ—মাঝে মাঝে তাদের সম্প্রসারণ কতটা হয়েছে ?

(খ) কারখানাগুলির আয়তন, যদি সম্ভব হয় তবে কাজের পর্যায়ক্রম অনুসারে কারখানা গৃহগুলির অবস্থা।

(গ) সমরোপকরণ নির্মাণের কারখানাগুলিতে কত লোক কাজ করছে ; তারা কত ঘণ্টা কাজ করে ?

(ঘ) উৎপাদনের উপকরণ নিয়ে আসা এবং উৎপন্ন দ্রব্য পাঠানো—এইরূপ যাতায়াতের বর্তমান ব্যবস্থা।

(ঙ) প্রধান বন্দরগুলিতে পরিবহনের অবস্থা।

৩. (ক) জাপান ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত-আক্রমণ ভারতের জনসাধারণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ?

(খ) ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মনোভাব ; তাদের কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন (আক্রমণের পর) ; বিশেষভাবে সি. পি. আই দলের ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাব, উদাহরণ স্বরূপ—জাতীয় সরকারের জন্য তাদের দাবী কি এখনও প্রবল, না স্তিমিত হয়ে এসেছে ?

(গ) জনগণের সমর্থন লাভের জন্য তাদের দাবী কি তারা ত্যাগ করেছে ?

(ঘ) সুভাষ বসু এবং স্বাধীন ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তারা সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে কিংবা করছে না ? যদি তাই হয় হবে

তাদের কর্মধারা কিরূপ ?

(ঙ) উপজাতিদের মধ্যে সোভিয়েত প্রভাব।

আমাকে এই সব প্রশ্নসংবলিত কাগজটি দিয়ে মিঃ ইনোয়ে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, বিকেলে ফিরে এলেন সিটো আর কওয়াসাকিকে নিয়ে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, মস্কোতে তাদের কূটনৈতিক সামরিক প্রতিনিধির সঙ্গে তার কথা হয়েছে—তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা কি হবে—তাই নিয়ে। তিনি বললেন, যদিও নিচিনা তাদের হাতছাড়া হয়েছে তবু তা পুনরুদ্ধার করতে দেরী হবে না। বর্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা উত্তর বর্মায় অভিযান শুরু করবেন—নতুন বার্মা রোডও তারা আক্রমণ করবেন। সমগ্র চীন জুড়েও একটি বড় রকমের অভিযান শুরু হবে।

সেইদিনই আমি আমার আস্তানায় ফিরে এলাম এবং কাবুল থেকে রওনা হলাম ৫ই সেপ্টেম্বর। ৮ই সেপ্টেম্বর জালালাবাদে এসে সেখানে আমরা চারদিন কাটালাম। সেখান থেকে যাত্রা করলাম ১৩ই সেপ্টেম্বর—২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৪৪) এসে পৌঁছুলাম দিল্লীতে।

স্বতন্ত্রকে সংবাদ পাঠিয়েছিলাম দিল্লীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে: তিনি এলেন এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে নিলাম। তিনি কথা দিলেন—একটি রাজনৈতিক ও সামরিক রিপোর্ট তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে দেবেন। তারপর তিনি দিল্লী থেকে রওনা হয়ে গেলেন।

১৯৪৫-এর ৬ই মার্চ। স্বতন্ত্র ফিরে এলেন তাঁর রিপোর্ট নিয়ে। সেই রিপোর্ট সঙ্গে করে আমি দিল্লী থেকে যাত্রা করলাম ১৯৪৫-এর ৮ই মার্চ। ১১ই মার্চ দুপুরে পৌঁছুলাম সওয়াল কিল্লাতে।

এইবার আমাকে বর্ষণের কবলে পড়তে হলো; পথের সমস্ত দূরত্বটাই আমাকে বৃষ্টির মধ্যে সিক্ত পরিচ্ছদে অতিক্রম করতে হয়েছিল। এর যা স্বাভাবিক ফল তাই আমাকে ভোগ করতে হলো—আমি জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লাম, তাই ১৭ই মার্চ পর্যন্ত আমাকে উপজাতীয় কেন্দ্রে থাকতে হলো। ১৭ই মার্চ আমি গোলাম উলরেহ্মানের সঙ্গে আবার রওনা হয়ে গেলাম এবং অস্ত

আর একটি কেন্দ্রে উপস্থিত হলাম ২১শে মার্চ। জালালাবাদ যাত্রা করলাম ২১শে মার্চ। ওখানে পৌঁছে জানতে পারলাম—আফগান প্রধানমন্ত্রী সারা শীতকালটা জালালাবাদেই আছেন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। তিনি পরদিন কাবুলে রওনা হবেন। স্বভাবতই একটা বেশ বড় রকমের সশস্ত্র প্রহরী দল নিয়েই তিনি ভ্রমণ করবেন, তার চারধারে গোয়েন্দা বিভাগের লোকও থাকবে। সুতরাং তিন দিন আমরা জালালাবাদে বসে রইলাম—রওনা হলাম ২৫শে মার্চ।

জালালাবাদে থাকতেই জানতে পেরেছিলাম, আফগান সরকার এক নতুন বিধান চালু করেছেন ভ্রমণের অনুমতিপত্র সম্পর্কে। যে-কোনো আফগানী প্রজারও এই অনুমতিপত্রের দরকার হবে। জালালাবাদ বা অন্য কোনো জেলা থেকে কেউ যদি কাবুলে যেতে চায় তবে তাকে নিজের পরিচয়জ্ঞাপক একটি সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখতে হবে। আর একটি সার্টিফিকেটও চাই, সে-যে আফগান সরকারের প্রজা তা প্রমাণের জন্য। জেলা-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই সার্টিফিকেটগুলো পাওয়া যাবে। এইগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে কাবুল থেকে বারো মাইল দূরবর্তী—বুদথকে। লরিতে কেউ গেলে তার পক্ষে অলক্ষিতে পার হয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন, পায়ে হেঁটে গেলে সেটা সম্ভব হতেও পারে। আমাদের সময় ছিল না, জালালাবাদ থেকে এই সব সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থও ছিল না। সুতরাং সার্টিফিকেট ছাড়াই আমরা রওনা হলাম—বুদ্ধি আর ভাগ্যের উপরই আমাদের ভরসা। যাই হোক্, আমরা কাবুলে পৌঁছে গেলাম ১৯৪৫-এর ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায়—পথে বাধা-বিপত্তিও কিছু ঘটলো না।

২৭শে মার্চ জার্মান গোয়েন্দা দপ্তরের প্রধান মিঃ জাগুমুল্লা হঠাৎ আমাকে দেখে ফেললেন বাজারের পথে। পরস্পর স্বাভাবিক কুশল বিনিময় হলো। ২৮শে মার্চ আবার তার সঙ্গে দেখা করে তার জন্যে আনা এক কপি রিপোর্ট তাকে দিলাম। তিনি আমাকে পরদিন রাত আটটায় ইনোয়ের বাড়ীতে যেতে বললেন।

আমি ইনোয়ের বাড়ীতে গেলাম—সেখানে তার জন্যে আনা রিপোর্টের কপি, তাছাড়া বেতার যোগাযোগ সম্পর্কে যে নির্দেশনামা তিনি আগের বার আমাকে দিয়েছিলেন তার কপিও তাকে দিলাম। সাধারণভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো। মনে হলো, আমাকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজে কথা বলার জন্যেই তিনি বেশী উৎসুক। তিনি বললেন—"বার্মায় আমাদের ব্যর্থতা বাস্তব ঘটনা, এর মধ্যে সমরনীতির কিছু নেই। এর কারণ আমাদের বিমান শক্তির দুর্বলতা। যুদ্ধ শুরু করার আগেই আমরা এই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন ছিলাম; কিন্তু আমরা প্রধানত নির্ভর করে থাকি আমাদের নৌশক্তি ও পদাতিক বাহিনীর উপর। আমরা জানি, আমাদের নৌবাহিনীও মিত্রশক্তির নৌবাহিনীর তুলনায় দুর্বল। এটা সত্য, বিমানবাহিনী আর নৌবাহিনী—উভয়ক্ষেত্রেই মিত্রশক্তি সমরোপকরণে অত্যন্ত শক্তিশালী, কিন্তু আমরা এটাও জানি, কিভাবে আমাদের দুর্বল নৌবাহিনী নিয়েই শত্রুর প্রবল নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। পদাতিক বাহিনীই আমাদের প্রধান শক্তি—অর্থাৎ, এই বাহিনীর আছে উৎসাহ, উচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং অটুট সঙ্কল্প। আমাদের শত্রুপক্ষ বার্মায় সহজে যুদ্ধ জয় করেছে বটে, তুমি দেখবে বার্মা-সিয়াম যুদ্ধ সর্বপেক্ষা রক্তক্ষয়ী হয়ে দাঁড়াবে। যদিও প্রশান্ত মহাসাগরে আমরা হেরে যাচ্ছি, এই পরাজয় আমাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর, তবু আসল যুদ্ধ হবে সেইখানে যেখান থেকে আমরা প্রথম আক্রমণ শুরু করেছিলাম—অর্থাৎ চীনে। আমরা জানি আকাশে শত্রুর অধিকতর আধিপত্য, আর সেই কারণেই জাপানের নগরগুলির উপর বোমাবর্ষিত হবে—আমাদের যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কারখানাগুলিও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। কিন্তু এই আশঙ্কার বিরুদ্ধে আমরা যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। এই ব্যবস্থা নিয়েছিল রাশিয়া যখন জার্মানরা রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; তারা যুদ্ধের কারখানাগুলি—যুদ্ধের অঞ্চল থেকে সরিয়ে অনেক দূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে নিয়ে গিয়েছিল—সেই কারণেই রাশিয়া আজ বিজয়ী।"

এইখানে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—রাশিয়া কিভাবে বিজয়ী হবে—জার্মানীতে এখনও তো যুদ্ধ চলছে। তিনি বললেন, "এখন এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আর দুই কি তিন সপ্তাহের মধ্যেই জার্মানী ভেঙ্গে পড়বে।"

তিনি বলতে লাগলেন—"আমাদের সমরোপকরণ তৈরীর কারখানাগুলিকে মাঞ্চুরিয়াতে সরিয়ে নিয়েছি, আমাদের শত্রুপক্ষ তাদের অবস্থানের সন্ধান জানে না। তাছাড়া মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করতে হলে তাদের চীনে বিমান-ঘাঁটি চাই, তা না হলে তারা মাঞ্চুরিয়ার উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারবে না। কিন্তু চীনে তাদের এমন দাঁড়াবার স্থান আমরা দেব না যেখান থেকে তারা বিমান আক্রমণ চালাতে পারে। এছাড়া চীনে আমাদের অবস্থান অনেক বেশী দৃঢ়। ওয়াঙ্‌ চিঙ্‌-ওয়েই যখন সরকারের প্রধান ছিলেন তখনকার তুলনায় এখন নানকিং সরকার আমাদের অনেক অনুকূল। আমি বলতে পারি, অধিকৃত চীনের অঞ্চলগুলিতে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী, শত্রুর বিরুদ্ধে এখন আমরা চীনা সৈন্যবাহিনীকেও কাজে লাগাতে পারি।"

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, রাশিয়ানদের কথা তিনি কি ভাবছেন; জার্মানী পরাজিত হবার পর তারা কি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? তিনি উত্তর দিলেন—"এমন কথা আমরা ভাবি না। ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হবার পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে মাত্র দুটো শক্তি আধিপত্য করবে—রাশিয়া আর আমেরিকা। আমাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার কোনো দাবী নেই—প্রশান্ত মহাসাগরেও তার কোনো স্বার্থ নেই। তবে রাশিয়া কেন তার একটি মানুষকেও বলি দেবে আমেরিকাকে সাহায্য করবার জন্য? কেননা, প্রশান্ত মহাসাগরে স্বার্থ রয়েছে আমেরিকার, ব্রিটেনের নয়। স্তালিন একজন বিরাট রাজনীতিবিদ্—তিনি ঠাণ্ডা মাথায় বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করে থাকেন; তিনি দেখবেন—সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে নেমে রাশিয়ার সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, যদিও ঐ জাতীয় অভিযান চালাবার পর্যাপ্ত শক্তি তাদের রয়েছে।

"যাইহোক, রাশিয়া যদি আমাদের আক্রমণ করে তবে তাদের যে কোনো অভিযান প্রতিহত করবার মতো যথেষ্ট লোকবল এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ আমরা সীমান্তে মজুত করে রেখেছি। আপনি জানেন আমাদের ৫৫ ডিভিশন সর্বোত্তম সেনাবাহিনী আছে, যাদের বলা হয় বিংশতিতম সেনাবাহিনী—সেই বাহিনী মোতায়েন রয়েছে সীমান্তে, আমরা একটি লোকও সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই নি। তাছাড়া, আমরা মনে করি, আমেরিকা আর ব্রিটেনের মৈত্রী বেশী দিন টিকবে না। ইয়োরোপে আমেরিকার কোনো লাভের আশা নেই—তারা শুধু ব্রিটেনকে সাহায্য করছে—এইমাত্র। কিন্তু একবার বার্মা ও মালয় মুক্ত হলে, যদিও এই মুক্তিটা খুব সহজ ব্যাপার নয়, যুদ্ধে ব্রিটিশের আর কোনো আগ্রহ থাকবে না। এটা ঘটলে তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করতে না-ও চাইতে পারে।

"চীন সম্পর্কে আমেরিকারই আগ্রহ অনেক বেশী। রুজভেল্ট চীনের ব্যাপারে যেভাবে আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং হস্তক্ষেপ করেছেন, তার থেকে এটা বুঝতে পারা যায়। ব্রিটেন আপাতত এরকম হতে দিচ্ছে কিন্তু যখন তার হাতে আর কোনো কাজ থাকবে না, তখন সে আমেরিকাকে এই নীতি আর চালাতে দেবে না এবং তখনই দু'য়ের মধ্যে ঘটবে বিচ্ছেদ। আর একটি কথাও ভেবে দেখা চলতে পারে—রাশিয়ার ভয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন কেউ তার সম্পূর্ণ শক্তি ইয়োরোপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সরিয়ে নিতে সক্ষম হবে না। এই কারণেই আমরা মনে করি, আমাদের যুদ্ধ করতে হবে শুধুমাত্র আমেরিকার বিরুদ্ধেই।"

তারপর তিনি আমাকে জানালেন—কাবুলে তাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। জার্মানদের পক্ষে দিনগুলি ছিল অন্ধকারময়, কিন্তু জাপানীদের পক্ষেও কোনো কিছু করা সম্ভব ছিল না। কোনো গোপন কাজ যাতে না করা হয় সেই জন্য আফগান সরকার বারংবার সতর্ক করে দিতেন। দূতাবাসের উপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল আর গোয়েন্দা বিভাগও তৎপর হয়ে উঠেছিল।

ঐদিন বিকেল চারটায় আমার কাছে এলেন জাগুমুল্লা। তিনি

সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে পাওয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের একটি তালিকা এনেছিলেন। (আমার উত্তরও সঙ্গে দেওয়া হলো):

প্রশ্ন : অজিত রায় কে? তাকে কি আমারা বিশ্বাস করতে পারি?

উত্তর : ওর সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এ বিষয়ে আমি কমরেডদের জিজ্ঞাসা করবো।

প্রশ্ন : পুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাস ও মিসেস আসফ আলিকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

উত্তর : পুরুষোত্তমদাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'বছর আগে; কিন্তু মিসেস আসফ আলি এখনও পলাতক।

প্রশ্ন : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যাপারটা কি হলো?

উত্তর : আমি ভারত ছেড়ে চলে আসবার পরে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে; তাই এ-সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

প্রশ্ন : সত্যরঞ্জন বক্সীকে কিভাবে গ্রেপ্তার করা হলো?

উত্তর : সত্যরঞ্জন বক্সী এবং আপনার আরও অনেক অনুগামীকে আপনার অন্তর্ধানের কিছু পরেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

প্রশ্ন : খান আবদুল গফ্‌ফর খানের সংবাদ কি?

উত্তর : আমার ভারত থেকে রওনা হওয়ার পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এরপর মিঃ জাগুমুল্লা বিদায় নিলেন।

১৫ই এপ্রিল আমি ইনোয়ের বাড়ীতে গেলাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং আমাকে যথারীতি অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন—টোকিও থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো নির্দেশ আসে নি। তিনটি বার্তা এসেছে। তাতে জানা যাচ্ছে—(ক) আর. কে-র (ভগৎরাম) কাবুলে আসার সংবাদ সুভাষচন্দ্র বসুকে জানানো হয়েছে; তাঁকে ভারতের অবস্থা এবং বেতার যোগাযোগের ব্যর্থতা সম্পর্কেও বলা হয়েছে। (খ) টোকিও বার্মা বেতার লাইনে খুব বেশী চাপ পড়েছে—ফলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। (গ) জরুরী সামরিক কাজ এবং লাইনের উপর অত্যধিক চাপ—এই

দুই কারণে আমাদের পাঠানো সংবাদের প্রাপ্তিস্বীকারও পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, রুশ-জাপান চুক্তি বাতিল করা সম্পর্কে তিনি কি ভাবছেন। তিনি জবাবে বললেন—কেবলমাত্র রাশিয়া ও জাপানের স্বার্থেই নয়, বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই রাশিয়া ও জাপান পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল। এখন যদি রাশিয়া জাপানকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তবে মনে করতে হবে—এই রকম একটা পরিস্থিতির জন্য তাদের যথেষ্ট শক্তি মজুত ছিল।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, রুজভেল্টের মৃত্যুর পরে ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন—এ বিষয়ে জাপানের প্রতিক্রিয়া কি? তিনি বললেন—আমেরিকার প্রতি জাপানের মনোভাবে কোনো পরিবর্তন ঘটবে না। আমেরিকার নীতি যদি একই থাকে তবে কে প্রেসিডেন্ট হলেন সেটা খুব বড় কথা নয়।

তিনি বললেন, "কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুতে চীনের রাজনীতিতে এক সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। রুজভেল্টই নিজের উপর অর্পিত বিশেষ ক্ষমতার বলে চিয়াং কাই-শেককে তার পদে রেখে সমর্থন করছিলেন, কিন্তু তার মৃত্যুর ফলে চীনের অবস্থা আর অনড় থাকবে না। আর একটি কথা—রুজভেল্ট ব্রিটেনকে প্রবল সমর্থন জানিয়ে আসছিল বলেই ব্রিটেন রুজভেল্টের চীনা নীতিকে বাধা দেয় নি; কিন্তু এখন ব্রিটেন খোলাখুলিভাবে কোনো একটি পক্ষ নেবে, আর তার ফলেই চুংকিং সরকারে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে এবং নতুন সরকার ইয়েনানের সঙ্গে কোনো একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। চীনে রাশিয়ার বিশেষ প্রভাব থাকাই সম্ভব—এমনকি সে কম্যুনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতিও জানাতে পারে।" তিনি যোগ করলেন যে, চীনে হয়তো গোলমাল দেখা দেবে। তিনি এও বললেন, রুজভেল্টের মৃত্যু মিত্রশক্তির ঐক্য ও সংহতির উপরে প্রচণ্ড আঘাত।

১৯৪৫-এর ২৩শে এপ্রিল ইনোয়ে আমাকে সুভাষচন্দ্র বসুর একটি বার্তা দিলেন। বার্তাটি এই রকম: "আগে আমি তোমাকে খুব

বড় রকমের অন্তর্ঘাতমূলক কাজে এগিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলাম; কিন্তু তুমি তা এখন আরম্ভ করতে পারো—তবে সুপরিকল্পিত এবং সুসংবদ্ধভাবে। বর্ষা শীগ্‌গিরই শুরু হচ্ছে, এই ঋতুতেই যদি তুমি এই কাজ আরম্ভ করতে পারো তবে তাতে আমাদের খুবই সাহায্য হবে। আমি এবং জাপানী উচ্চকর্তৃপক্ষ তোমার অতীতের কাজে খুশি হয়েছি—সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরেই তুমি অন্তর্ঘাতমূলক কাজ কেন্দ্রীভূত করো।

"যেমনভাবে আমরা এখানে করে থাকি, সেই পদ্ধতিতেই তোমাকে প্রচারের কাজও চালিয়ে যেতে হবে, অর্থাৎ মিত্রশক্তিদের মধ্যে মতবৈষম্যের উপর বার বার জোর দিয়ে যেতে হবে। ওদের মধ্যে মতভেদ প্রকট হয়ে উঠেছে, সানফ্রান্সিস্কো অধিবেশনেই তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। আমাদের এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে এসব ত্বরান্বিত হয় এবং যাতে ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দেয়।

"বর্ষায় রণাঙ্গনে আমাদের গতি শিথিল হয়ে আসবে। আমাদের শত্রুপক্ষ সহায়-সম্বল সঞ্চয়ের কাজে ব্যস্ত থাকবে, যাতে তারা বর্ষার পরে বড় রকমের আক্রমণ শুরু করতে পারে। যদি তুমি এমনভাবে নাশকতামূলক কাজ চালিয়ে যেতে পারো যে, এইসব সমরোপকরণ রণাঙ্গনে আর না পৌঁছায়, আমাদের তাতে মহৎ উপকার করা হবে।"

ইতিমধ্যে মিঃ জাগুমুল্লা এসে পড়লেন এবং মিঃ ইনোয়ে স্থান ত্যাগ করলেন।

মিঃ জাগুমুল্লা বললেন, আমার জন্য তিনি দুটো প্রশ্ন এনেছেন। প্রশ্ন দুটি এই:

১. স্টর্কহল্মের জার্মান রাষ্ট্রদূত, যিনি বিশেষ একটি কাজে নিযুক্ত, তিনি জানাচ্ছেন—মাদাম কল্লোনতাই শীগ্‌গিরই ভারতে যাবেন এটিক গোপন কাজ নিয়ে। আপনি কি তার এই প্রস্তাবিত ভ্রমণ সম্পর্কে কিছু জানেন?

২. আমানুল্লার (আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব রাজা) ভাই মহম্মদ আমীর খান এবং তার শ্বশুর আবদুল হাকিম খান, যিনি পেশোয়ারে

আফগানিস্তানের প্রতিনিধি—এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করে বার্মায় অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল ; এখন তাদের ভারতে আনা হচ্ছে। তুমি কি জানো, বর্তমানে তাদের কোন জেলে রাখা হয়েছে ?

আমার উত্তর :

১. আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

২. আমি জানি না, তবে সন্ধান করে দেখবো।

এর পরে মিঃ ইনোয়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। তিনি বললেন, "ইয়েরোপের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। টোকিও থেকে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, লাল ফৌজ বার্লিনে প্রবেশ করেছে এবং হিটলার এখনও সেখানে আছেন। তিনি সেখানে থেকে মৃত্যুবরণ করবেন কিন্তু বার্লিন ছাড়বেন না। তার মৃত্যুর পর জার্মানীরও ধ্বসে পড়া সুনিশ্চিত—এবং সেটা ঘটবে এক সপ্তাহের মধ্যেই, কারণ লাল ফৌজ তীব্রতম আক্রমণ চালিয়েছে—তাকে রোধ করার সম্ভাবনা নেই।"

তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন, যদিও তাদের পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চল হারাতে হয়েছে, তবুও পারিণামে তাদের বিজয়লাভ সুনিশ্চিত—তার কারণ তারা প্রধানত তাদের স্থলবাহিনীর উপরই নির্ভর করছেন। পরিশেষে তিনি আমাদের কমরেডদের অভিনন্দন জানালেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এই বলে যে, তিনি বেতারে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে ১৯৪৫-এর ২৪শে এপ্রিল সকালে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

২৭শে এপ্রিল বেলা ১টায় আমরা টাঙ্গায় চেপে রওনা হলাম। কাবুল থেকে আমরা লরির পরিবর্তে টাঙ্গাই বেছে নিলাম ; তার কারণ আমরা ভেবেছিলাম, টাঙ্গায় গেলে প্রথম ও দ্বিতীয় চৌকিতে প্রহরীরা আমাদের কাছে অনুমতিপত্র চাইবে না। এই দুটি চৌকি কাবুল থেকে প্রায় এক মাইল ও দু'মাইল দূরবর্তী—তারা ভাববে আমরা বুঝি কাছাকাছি কোনো গ্রামে যাচ্ছি।

এইভাবে আমরা কাবুল থেকে প্রায় বারো মাইল দূরবর্তী প্রধান চৌকিতে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমরা একটা লরির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম; তারপর লরি আসতেই আমরা ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে ভাড়া ঠিক করলাম—তাকে জানালাম যে আমাদের অনুমতিপত্র নেই। সে আমাদের মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে লরিতে উঠতে বললো।

সুতরাং আমরা হেঁটে যাওয়াই ঠিক করলাম।

প্রহরীদের নজর এড়াবার জন্য আমরা এমন ভাব দেখালাম যেন নমাজের আগে আমরা কাছের নদীতে হাত-পা ধোওয়ার জন্যে যাচ্ছি—ভ্রমণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

অবশ্য আমরা রওনা হওয়া মাত্র প্রহরীরা প্রশ্ন করলো, কোথায় আমরা যেতে চাই। আমাদের বলতে হলো, আমরা জালালাবাদে যাবো। তারা যখন অনুমতিপত্র চাইলো, আমরা বললাম, আমরা উপজাতীয় অঞ্চলের ব্যবসায়ী, দীর্ঘকাল ব্যবসা করে আসছি, আমরা জানতাম না উপজাতীয় কোনো লোকেরও অনুমতিপত্রের দরকার হতে পারে। আমরা অনুরোধ জানালাম, আমাদের যেন যেতে দেওয়া হয়। তারা বললো, আমি যেন তাদের অফিসারের কাছে গিয়ে আমার কাহিনীটি বলি।

ওদের অফিসারের কাছেই গিয়ে বললাম—উপজাতীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের ব্যবসার লেনদেন আছে, কাবুলে এসেছিলাম হিসেবপত্র মেটাবার জন্যে। অফিসারটি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন; তিনি আমাদের অকৃত্রিমতায় বিশ্বাস করলেন এবং আমাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মতোই ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, নিয়ম অনুযায়ী তিনি আমাদের আর অধিক দূর যেতে দিতে পারেন না; কিন্তু প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র আনবার জন্য তিনি আমাদের কাবুলে ফিরে যেতে দিতে পারেন। তিনি বললেন, "নিয়ম মানতে গেলে প্রহরীর সঙ্গে আপনাদের কাবুলে পাঠাতেই হবে। কিন্তু যেহেতু আপনারা ভদ্রলোক সেইহেতু আপনাদের ইচ্ছামতো ফিরে যেতে অনুমতি দিচ্ছি।"

এরপর আমাদের কাছে এই পথগুলো খোলা রইলো :

ক) ফিরে গিয়ে অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। কিন্তু এটি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এবং এতে পাঁচ-ছয় দিন লেগে যাবে। খ) ফিরে গিয়ে দু' তিনটি গাধা কিনে নেওয়া আর সেই সঙ্গে উপজাতীয় পোশাক—যাতে আসল উপজাতীয় লোক হিসেবে চলে যেতে পারি। এতেও চার-পাঁচ দিন সময় লাগবে। গ) উপজাতীয় পোশাকে রাত্রিতেই তল্লাসী চৌকি পার হয়ে বাকী পথ হেঁটে যাওয়া। ঘ) অফিসারকে উৎকোচ প্রদান। ঙ) প্রহরীদের ঘুষ দেওয়া। চ) আবার অফিসারের কাছে হাজির হয়ে তার সংবেদনশীল পাঠান-মানসিকতার কাছে আবেদন জানিয়ে অনুমতি আদায় করা।

আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে শেষ পথটিই নেব ঠিক করলাম। আমি সেই পাঠান অফিসারের দিকে এগিয়ে গেলাম; তাকে বললাম—অনুমতিপত্র আনবার জন্য ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা কিছু মনে করছি না, কিন্তু তাতে খরচ হবে প্রায় ১৫০টির মতো আফগানী মুদ্রা; অবশ্য এই খরচের ব্যাপারটাও আমাদের কাছে কিছু নয়। আসল কথা, আমরা পাঁচ-ছয় দিন সময় নষ্ট করতে পারি না।

আমি তাকে অনুরোধ করলাম, যখন তিনি নিজেও একজন পাঠান তখন পাঠান হিসেবে আমাদের উপরও আস্থা রাখুন।

সর্বক্ষণ আমি অত্যন্ত বিনম্র সুরেই কথা বলছিলাম, আমার আবেদন ছিল ওর পাঠান-মনোভাবের কাছে; সেই আবেদনে ফলও হলো, তিনি আমাদের ভ্রমণের অনুমতি দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমি প্রহরীদের কিছু বকশিস দেবার জন্য তার অনুমতি চাইলাম। প্রথমবার তিনি বলে উঠলেন—'না'; কিন্তু আমার দ্বিতীয় অনুরোধে তিনি সম্মত হয়ে গেলেন। এইভাবে আমরা সোজাসুজি চলে যাবার স্বাধীনতা পেলাম।

১৯৪৫-এর ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আমরা জালালাবাদে পৌঁছুলাম। খুব ক্লান্ত ছিলাম বলে সেইখানে কয়েকটা দিন থেকে গেলাম।

জালালাবাদ থেকে যাত্রা করলাম ১৯৪৫-এর ১লা মে; ৬ই মে পৌঁছুলাম উপজাতীয় কেন্দ্রে। ১৯৪৫-এর ১৭ই মে হাজির হলাম দিল্লীতে। ২০শে মে তেজ সিং স্বতন্ত্র এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে—আমি তাঁকে আগাগোড়া সব কাহিনী জানালাম।

তিনি বললেন, এখন জার্মানরা যুদ্ধে হেরে গেছে, জাপানের পক্ষে একলা দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এখন সুভাষচন্দ্র বসুর কি হবে? এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তনীয় ব্যাপার। তাঁর মতে, জাপানীদের আত্মসমর্পণের ঠিক আগেই বন্ধুজনসহ যুদ্ধের মধ্য থেকে সরে যাওয়াই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ।

তারপর আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও আলোচনা হলো। স্থির হলো, আমি আমার দিল্লীর বাড়ীতেই থাকবো—সেখান থেকে প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিত লক্ষ্য করে যাবো। এরই মধ্যে স্বতন্ত্র সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে যাবেন—এটা হবে নতুন যে ব্যবস্থা আমি শেষবারে জাপানীদের সঙ্গে স্থির করেছিলাম সেই অনুযায়ী। এরকম সোজাসুজি সংযোগ-স্থাপন যদি সম্ভব হয়, তবে স্বতন্ত্র তাঁকে বলবেন—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে। যখন জাপান আত্মসমর্পণ করবে তখন আবার আমি উপজাতীয় অঞ্চলে ফিরে যাবো। সেখান থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ চালাবার জন্য সমস্ত সহায় ও শক্তি একত্রিত করার কাজে যা-কিছু সম্ভব তা-ই করে যাবো।

*   *   *   *

যুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনৈতিক দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটলো; সমগ্র দেশে অভূতপূর্ব ব্যাপক আকারে জ্বলে উঠলো সাম্প্রদায়িকতার আগুন—এর ফলে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও হয়ে পড়লো স্তিমিত।

আমার পক্ষে তাই এখন ভারতে থাকা অর্থহীন। আমি যাত্রা করলাম উপজাতীয় অঞ্চলে, সেইখানেই আমার স্বাভাবিক ব্রিটিশ-বিরোধী কাজ চালিয়ে যাবার জন্য।

আমি যখন উপজাতীয় অঞ্চলে ছিলাম, আমাদের দেশ—ভারত ও

াকিস্তান—এই দুই ভাগে বিভক্ত হলো; এই অবস্থায় সেখানে কানো উল্লেখযোগ্য কাজ করা সম্ভব ছিল না। উপজাতীয় অঞ্চলে র্মরত বহু কমরেডই তাই চাইলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চাদের নিজেদের গৃহে ফিরে যেতে।

আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম ভারতে ফিরে আসার। আমার পরিবারের লোকেরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন আগেই ভারতে পৌঁছে গিয়েছিলেন—আমার অতি প্রিয় পিতৃ-পিতামহের আবাসে কেউ আর ছিল না। আমি বিষাদ ও হতাশার মধ্যে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ঐ অঞ্চল অতিক্রম করে চলে এলাম।

এ এক ক্লান্তিময় পথ-চলা, এ যাত্রা দীর্ঘ ও বিপদসংকুল। বোম্বে হয়ে পূর্ব পাঞ্জাবে যাওয়াই বোধহয় সব চেয়ে নিরাপদ পথ। করাচির পথ ধরে বোম্বে পৌঁছুতেই আমার প্রায় একমাস লেগে গেল।

অবশেষে বোম্বে এলাম ১৯৪৮-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী। বোম্বে থেকে আমার পরিবারের খোঁজে এলাম পাঞ্জাবে—বোম্বে থাকতেই আমি অবশ্য তাদের সংবাদ জানতে পেরেছিলাম।
